ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

ষষ্ঠ বর্ষ • বার্ষিক সংখ্যা • আশ্বিন ১৪২৩ • অক্টোবর ২০১৬

ডেঙ্গু মোকাবিলা

- সিঙ্গুর রায় ও শিক্ষা
- পশ্চিমবঙ্গের কন্যাশ্রী
- আল্লা বনাম গোপালা
- আলোকচিত্রে পুরুলিয়া
- ক্যানসার রোগীর অধিকার

- রোহিত ভেমুলার শেষ চিঠি
- কানহাইয়া কুমারের ভাষণ
- শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন
- পদ্মাপাড়ে ফুকুশিমা
- বাঙালীর হিমালয় বিপর্যয়

ভারতের বীরাঙ্গনা

মাদার টেরেসা

সোনি সোরি

নীলমণি সাঁওতাল

পি. ভি. সিন্ধু

দীপা কর্মকার

সাক্ষী মালিক

অরুনিমা সিংহ

অরুন্ধতী রায়

দীপা মালিক

আইরাম শর্মিলা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার ● গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

ষষ্ঠ বর্ষ ● বার্ষিক সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪২৩ ● অক্টোবর ২০১৬

সম্পাদকমণ্ডলী : গুণধর বাগদি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা রায়, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভময় দত্ত ও অরণি সেন

প্রধান সম্পাদক : অরণি সেন

পৃষ্ঠপোষণা : সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, ৩৮ ইউ সুলতান আলম রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩
অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, এস-১৮ বিদ্যাসাগর ভবন, ১০ রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
রূপক ঘোষ, পশ্চিমপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম-৭৩১২৩৫
সনৎ রায়চৌধুরী, ফুলপুকুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১
জয়া মিত্র, এ.এস.-৩/২৮/২ কল্যাণপুর হাউসিং বোর্ড, আসানসোল-৭১৩৩০৫
কমলেন্দু চক্রবর্তী, ২৩৩ পীরগাছা, বামুনমুড়া রোড, পোঃ বাদু, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৮
কমল চক্রবর্তী, ভালোপাহাড়, পোঃ লতা, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া-৭২৩১২৯
পীযূষ সরকার, আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, বাঁকুড়া-৭২২১৩৬
অনিতা মজুমদার, ২৫ডি.এল.রায় সরণী, মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙ-৭৩৪০০১
তৃপ্তি সান্ত্রা, এয়ারভিউ কমপ্লেক্স, মহেশমাটি, ইংরেজ বাজার, মালদা-৭৩২১০১
মৈনাক মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডুপুকুর, বর্ধমান-৭১৩১০১
দেবাশিষ দত্ত, ৮, রাজা গুরুদাস স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
পুণ্যব্রত গুণ, এইচ.. এ. ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯৭
সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮/৩, সমবায় পথ, পোঃ নবনগর, হুগলী-৭১২২৪৬
সুব্রত সাহা, পোস্ট অফিস মোড়, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার-৭৩৬১৪৬
সুমন গোস্বামী, কলেজ রোড, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২
জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪
সুদেব সাহা, মিলন পাড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪
পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেণ সেন সরণী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
শুভম ভট্টাচার্য্য, গীতাঞ্জলি মার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
সুমনা গুপ্ত, ৩৬/১, মধুপুর রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১
সুদেষ্ণা রায় চৌধুরী, ১৯/১/বি. এ. সি. রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০৩
সুনীল সোরেন, লাল কুঠি পাড়া, সিউড়ি, বীরভূম-৭৩১১০১
অরুণ সেন, সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, সরবেরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৩২৯
বিজন ভট্টাচার্য্য, রেলওয়ে নিউমার্কেট, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩২৯
ষড়ানন পাণ্ডা, এঁড়াল, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৪৪
বিবর্তন ভট্টাচার্য্য, গ্রাম - কাঁঠালপুলি, পোস্ট - চাকদহ, নদীয়া-৭৪১২২২
প্রবীর পাল, ১৯/২, ভোলানাথ নন্দী রোড, হাওড়া-৭১১১০৪
ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প, ৫, জি. টি. রোড, হাওড়া-৭১১২০২
ভবানী প্রসাদ সাহু, গ্রাম : ঘোলে, পো : চাউলপট্টি, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৫৫
জাতিশ্বর ভারতী, সুখসাগর এপার্টমেন্টস্, শিয়ালপাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, বিজলি চক, কালিবাড়ি, রায়পুর, ছত্তিশগড়-৪৯২০০১
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বি/এল ৭৬, ভি.এস.এস. নগর, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা-৭৫১০০৭
সমিত কুমার কর, ১০১১ শতলেজ বিজয়া শতাব্দী, সোনারি, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড-৮৩১০১১
সোমেন চক্রবর্তী, পি৫৩, সুরুচি অ্যাপার্টমেন্টস্, দ্বারকা, নিউ দিল্লী-১০০০৭৫
রাহুল মুখোপাধ্যায়, বি ৯৫ এস. এস., বার্মিংহাম হার্টল্যান্ডস্ হসপিটাল, বার্জসলে গ্রীন ইস্ট, ইউ. কে.
কৌশিক সেন, স্পোর্টিং ক্লাব ড্রাইভ, র‍্যালে, নর্থ ক্যারোলিনা, ইউ.এস.এ

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র : সাম্পান পাঠক, গৌতম মিস্ত্রি, গৌতম জোয়ারদার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অরণি সেন

পরিবেশনা : দীপা রায়, সমরেন রায়, প্রদীপন গাঙ্গুলী, অয়ন ঘোষ, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়

যোগাযোগ : **ssunnayan@gmail.com || www.ssu2011.com**

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সম্পাদকীয়

মেয়েরাই মান রাখলেন

কাশ্মীর উপত্যকা থেকে কুদানকুলাম, উনা থেকে ইম্ফল— রাষ্ট্র যেন উন্মত্ত সারমেয়। আজ অবধি সবচাইতে খারাপভাবে নাড়াচাড়ার ফলে কাশ্মীর সমস্যা নাগালের বাইরে। গড়ে উঠেছে লাগাতার জঙ্গী গণবিক্ষোভ। তার সাথে যুক্ত হয়েছে অভূতপূর্ব ভারত বিরোধিতা, বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থা। আর তাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আরও হিংসা। অগুন্তি পেলেট, বুলেট, গুম-খুন। কাশ্মীরী নারীর উপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে দেখানো হচ্ছে পৌরুষ। কুপওয়ারা

জেলার কুনান পোশপোরা গণধর্ষণ তার একটি নমুনা। ভারত মহাসাগরের উপকূলে কুদানকুলামে রুশ পরমাণু চুল্লী বসানোর প্রতিবাদে মৎস্যজীবী পরিবারগুলি ভিটে ও জীবিকা হারানো, পরিবেশ দূষণ, তেজষ্ক্রিয়তার শরীরী প্রভাবের আশঙ্কায় যে বৈচিত্র্যময় গণপ্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাকে দমন করতে বহু নারী ও শিশু সমেত প্রতিবাদীদের কারারুদ্ধ করা হয়। আজও তারা আইন-আদালত-থানার জোয়াল থেকে বেরোতে পারেননি। উনার দলিত অত্যাচারের ভাষ্য থেকে উঠে আসছে দলিত নারীদের অবর্ণনীয় কাহিনী। মণিপুরের রাস্তাঘাটে ধর্ষিতা কিশোরীদের লাশ পড়ে থাকাটি কোন নতুন ঘটনা নয়। এতো খণ্ডচিত্র। খোদ দেশের রাজধানী দিল্লী, দিল্লী ঘেষা উত্তরপ্রদেশে উদীয়মান নগরী নয়ডা থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা— সর্বত্র দিনে দুপুরেই মহিলারা আক্রান্ত। দুস্কৃতীরা বেপরোয়া, কারণ তারা জানে তাদের পিছনে রাজনৈতিক দাদারা আছেন। পুলিশ কিছু করবে না, আইন-আদালত অবধি যদিবা পৌঁছয়, সহজেই জামিন মিলবে। সারা ভারত আজ নারীর মর্যাদাহানিতে কলঙ্কিত, বলাৎকারে রক্তাক্ত। মাওবাদী রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যে অকুতোভয় নারী প্রত্যন্ত দক্ষিণ বাস্তারের অবহেলিত আদিবাসী গাঁয়ে শিক্ষা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের আলো ফোটাতে সচেষ্ট, তার স্কুল বন্ধ করে, তাকে কারারুদ্ধ করে, তার ছোট শরীরটিকে অত্যাচারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলেন পুলিশ কর্তারা।

দেশ জুড়ে এই আবহের মধ্যেই প্রবল দারিদ্র্য, সামন্তবাদ, পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন নির্যাতন, মৌলবাদী ফতোয়া, হেঁশেল-হারেমের হাজারো বাধা-বিপত্তির বাধা টপকে ভারতীয় নারী বিভিন্ন রূপে নতুন নতুন শক্তিতে উঠে আসছেন। মণিপুরের কুকি মেয়ে মেরি কম বক্সিং-এ একের পর এক মেডেল পেয়ে সাড়া জাগিয়েছেন। ওখানকারই ইরম শর্মিলা চানু জনবিরোধী 'আফসপা' প্রত্যাহারের দাবীতে ১৬ বছর টানা অনশন করলেন। ঝাড়খণ্ডের অ্যাথলিট অরুণিমা সিংহ যাকে দুষ্কৃতীরা চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ায় দুটি পা বাদ যায়, দু'পা ছাড়াই দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করেন। তৃপ্তি দেশাই, বন্দনা গুট্টেদের নেতৃত্বে নারীরা প্রবেশাধিকার অর্জন করেছেন এতদিন নিষিদ্ধ রাখা মন্দির-দরগায়। এরকম বহু ঘটনা ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিক রিও ওলিম্পিকের প্রস্তুতিতে ভারত সরকার ৪৮২ কোটি টাকা খরচ করেছেন। বড় টিমও পাঠিয়েছেন। কিন্তু ফলাফল শোচনীয়। ২০৭টি দেশ ও সংস্থার মধ্যে পদক-তালিকায় ভারতের স্থান ৬৭ তম। তারই মধ্যে হায়দ্রাবাদ কন্যা পি.ভি. সিন্ধু অত্যন্ত ভাল খেলে পাঁচটি ম্যাচ জিতে তারপর ফাইনালে লড়াই করে হেরে মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে রুপো জিতেছেন। হরিয়ানার রোহতকের বীরকন্যা সাক্ষী মালিক পিতৃতন্ত্র ও খাপ পঞ্চায়েতের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ৫৮ কেজির ফ্রিষ্টাইল কুস্তিতে ব্রোঞ্জ পেলেন। সেই হরিয়ানা যেখানে পুরুষের চাইতে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা অনেক কম। উত্তরপূর্বের চারিদিক ঘেরা পশ্চাদপর রাজ্য ত্রিপুরা। সেখানকার কন্যা দীপা কর্মকার পদক না পেলেও প্রদুনোভা ভল্ট দেখিয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে জিমনাষ্টিকসের ভল্ট ইভেন্টে চতুর্থ হলেন। প্যারা অলিম্পিকে অন্য তিনজন অ্যাথলিটের সাথে পদক আনলেন রাজস্থানের দীপা মালিক। শেষ পর্যন্ত মেয়েরাই মান রাখলেন।

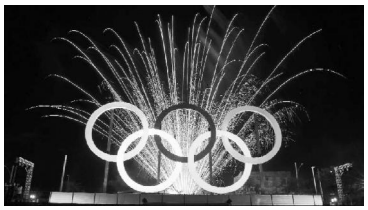

শ্রদ্ধার্ঘ্য

উপমহাদেশে মৌলবাদের হাতে হত মুক্তমনা নিজামুদ্দীন সামাদ, অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকি, জুলহাস মান্নান, নিখিল চন্দ্র জোয়ারদার, খুররম জাকি, ডাঃ মীর সানাউর রহমান, অধ্যাপক সাইফুজ্জামান, কাওয়ালি গায়ক আমজাদ সাবরি এবং অন্যান্যদের

শোকজ্ঞাপন

সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদ এবং অন্যান্য ঘাতকদের আঘাতে হতাহত সিরিয়া, ইরাক, প্যালেস্তাইন, তুরস্ক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, দক্ষিণ সুদান, নাইজিরিয়া, লিবিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নিরপরাধ মানুষ এবং ইকোয়েদর, জাপানের ভয়াবহ ভূমিকম্প; ভারত ও চীনের বন্যা; একাধিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সূচীপত্র

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ৫-৮
● ভগিনী নিবেদিতা ● রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ● যোগীন্দ্রনাথ সরকার ● হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ● নরেন্দ্রনাথ মিত্র ● শঙ্খ চৌধুরী ● চিত্তপ্রসাদ ● বিনয় ঘোষ ● কাননদেবী ● সমর সেন ● শাহ্ আবদুল করিম ● নবেন্দু ঘোষ ● রাজেন তরফদার

কবিতা ৮-৯
● সেতু ভাঙে, সেতু গড়ে— রেহান কৌশিক ● মিড ডে মিল— অপূর্ব কোলে ● রোদ্দুর— শ্রীজাত ● ধর্ম— হাফিজ সরকার

সাহিত্য ১০-১৩
● আল্লা বনাম গোপালা —যশপাল, অনুবাদ : দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়

ভাষ্য ১৪-১৭
● ওবামার কিউবা সফর ● ব্রেক্সিট— কারণ ও তারপর ● দক্ষিণ চীন সাগরে ঝড় ● এন. এস. জি. গ্রুপে অন্তর্ভুক্তির ব্যর্থতা ● সবাই মিলে জি. এস. টি. বিল পাশ ● মোহনবাগান - ইষ্টবেঙ্গলের মরণবাঁচন ● নামেই তো আসে যায় ● মাল্টি সুপার স্পেশালিটি

সাক্ষাৎকার ১৮-১৯
● বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অমল মুখোপাধ্যায়

স্মরণিকা ২০-২২
● মনোহর আইচ ● অমল দত্ত ● মহম্মদ শাহীদ ● হেনড্রিক জোহান ক্রুয়েফ ● মহম্মদ আলি ● উমবের্তো একো ● হারপার লি ● অ্যান্ড্রু গ্রোভ ● আব্বাস কিরোস্তোমি ● কে. জি. সুব্রহ্মনিয়াম ● সৈয়দ হায়দর রাজা

বিশেষ স্মরণিকা ২৩-২৫
● মহাশ্বেতা দেবী ● ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা ● ডাঃ সুব্রত মৈত্র

বিশেষ রচনা ২৬-২৭
● বাঙালীর হিমালয় বিপর্যয় — গ্যাব্রিয়েল লোপেজ

নির্বাচিত রচনা ২৮
● বর্তমান ভারতের ক্ষরা পরিস্থিতি ঃ মেড ইন ইণ্ডিয়া— অমিতা বাভিস্কার

প্রধান রচনা ২৯-৩১
● ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে অবশ্য পালনীয়—গৌতম মৃধা ● মশক বাহিত রোগ প্রতিরোধে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবশ্য করণীয়—স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ● কীভাবে হয় ডেঙ্গু? ● মশক বাহিনী ও জিকা কাহিনী—গৌতম মৃধা

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৩২-৫৫
● কিউবা এবং একটি নিঃশব্দ কৃষি বিপ্লব— রূপক কুমার পাল ● সিঙ্গুর রায় ও তার শিক্ষা — অরণী সেন ● সিঙ্গুর মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের রায় গণআন্দোলনের জয়, কোন দলের জয় নয় ● পৃথিবীর সব শিশুই নাস্তিক; আমরাও কেন না হব? — ভবানীপ্রসাদ সাহু ● বাগরাকোটা চা-বাগানের বারোমাস্যা ● মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধানে ● বৃহৎ পুঁজির বিস্তারের প্রেক্ষিতে বামপন্থার পতন ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ঃ একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ— বাপ্পাদিত্য রায় ● অর্থনীতির হাল হকিকৎ

ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য ৫৬-৫৭
● ফুটবলের তিন অঘটন— নিলয় সামন্ত

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ৫৮-৬৩
● পদ্মার পারে ফুকুসিমা হলে গঙ্গার পারের মানুষ বাঁচবে? — বিবর্তন ভট্টাচার্য ● এন্ডোসালফানে কতটা ক্ষতির শিকার এদেশের মানুষ..... —সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় ● রেজারেকশন— দীপাঞ্জন রায়

অর্ধেক আকাশ ৬৪-৬৮
কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি সফল সমীকরণ — সূচনা সেন ● 'বান্ধবী আছে আকাশের মতো নারী' — সুদক্ষিণা বসু

ছবিতে বাসন্তী — নীলাঞ্জন পতি ৬৯, ৭২

আলোকচিত্রে পুরুলিয়া — সাম্পান পাঠক ৭০, ৭১

শিক্ষা প্রসঙ্গে ৭৩-৮১
● রহিত ভেমুলার শেষ চিঠি ● কানহাইয়া কুমারের ভাষণের অংশ ● শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন— নির্ম্মলেন্দু নাথ ● মেডিক্যালে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা ও কিছু প্রশ্ন— সনাতন মুর্মু ● ডাক্তারি শিক্ষা নিয়ে মেয়েকে লেখা চারু মজুমদারের চিঠি

অগ্রগতির দলিল ৮২-৮৪
● বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদ — বিবর্তন ভট্টাচার্য্য ● এই আরোপিত অমানিশা কাটিয়ে উঠব বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যুক্তিবাদের সাহায্যে

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ৮৫-৮৬
● ডাল— স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় ● ৯৩ বছরেও সুস্থ ও সক্রিয়

স্বাস্থ্য নীতি ৮৭-৯১
● সকলের জন্য স্বাস্থ্য ● সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ও জীবনদায়ী ওষুধ

বিকল্প স্বাস্থ্য ৯২-৯৪
● সুন্দরবন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প

জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী ৯৫
● প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান (পি. এম. এস. এম. এ.)

জনশৌচালয় আন্দোলন— বেজওয়াদা উইলসনের আত্মকথা ৯৬

জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ৯৭-১১৪
● স্বাস্থ্যের অধিকার— শুভজিৎ ভট্টাচার্য ● গ্রামীণ চিকিৎসকদের না নিয়ে সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যাবে না— পুণ্যব্রত গুণ ● স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটি মানবাধিকার নিবন্ধ উনিশটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত— ক্লডিও স্কুফটান্ ● খসড়া সারসংকলন ঃ টিবি সার্কল ইণ্ডিয়া স্টাডি রিপোর্ট ঝাড়খণ্ডের নিম্ন-আয়-শ্রেণীর মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রভাব ● ক্যানসার রোগী ও তার অধিকার —উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক ১১৫
● কলম্বিয়ায় যুদ্ধবিরতি— অরণি সেন

চিত্র সমালোচনা ১১৬
● 'দি ম্যান হু নিউ ইনফিনিটি' ● 'শঙ্খচিল' ● 'দ্য হেড হান্টার' — রাজ্যশ্রী দাশগুপ্ত

পুস্তক পর্যালোচনা ১১৭-১১৮
● ডিসেনটিং ডায়গনোসিস : ডাঃ অরুণ গাদরে ও ডাঃ অভয় শুক্লা— প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ● এ ডক্টর এমঙ্গ দ্য সানথালস্ ঃ দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ ডঃ স্টিফেন বি. হানস্‌দাঁ": সম্পাদনা ঃ আইভি ইমোজেন হানস্‌দাঁ —প্রবীর চট্টোপাধ্যায়

রিপোর্ট ও চিঠিপত্র ১১৯-১২৬
● ২০১৬ সালের বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে নাগরিক-ভোটারদের কাছে সিআরপিপি-র আবেদন—সিআরপিপি, পঃ বাঃ চ্যাপ্টার ● কর্পোরেটোক্রেসি বনাম জন-প্রতিরোধ—'জল-জঙ্গল-জমিন' ● অসমের বন্যা পরিস্থিতি ● ডাঃ শৈবাল জানার মুক্তির দাবী ● বাস্তার রিপোর্ট

খবরাখবর ১২৭-১৪০

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ● পল কক্স ● কণ্ঠশিল্পী ওস্তাদ আবদুল রশিদ খাঁন ● মুবারক বেগম ● কবি ও.এন.ভি. কুরুপ ● নিদা ফাজলি ● আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত ● শাহীদ কাদরি ● নলিনীধর ভট্টাচার্য ● সাহিত্যিক সুজাত বুখারি ● ইমরে কার্তেস ● শৈলেন ঘোষ ● চলচ্চিত্রাভিনেতা বাড স্পেনসার ● সুলভা দেশপাণ্ডে ● কার্টুনিষ্ট সুধীর তাইলাং ● ছায়া শিল্পী সব্যসাচী সেন ● সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী ● চিকিৎসক দেবব্রত সেন ● অসমের ভ্রাম্যমান নাটকের পুরোধা অচ্যুৎ লাকার ● কুইজ বিশেষজ্ঞ নীল ও'ব্রায়েন ● ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদ ● মার্টিন ক্রো ● ফুটবলার সিজার মালদিনি ● রেসিং বাইক ড্রাইভার বিনু পালিওয়াল ● পর্ব্বতারোহী রাজীব ভট্টাচার্য্য ● গৌতম ঘোষ ● পরেশ নাথ ● সুভাষ পাল ● ক্রীড়া প্রশাসক জোয়াও হাভালাঞ্জ ● বিপ্লব জননী নীলমণি সাঁওতাল ● রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইসাক সুই ● অশোক ঘোষ ● দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ● হিমাদ্রী সেন রায় ● স্বপন মুখোপাধ্যায়।

''এখন এই রোগ মহামারীর কেন্দ্রে মানুষের এক পুরনো শত্রু, এই ছয় পেয়ে সিরিয়াল ঘাতকের মাত্র এক চামচ স্থির জল লাগে, আর লাগে যখন তখন মানুষের রক্তে ভুরিভোজ। এই বাস্তুতন্ত্রে তার কোন নির্দিষ্ট ভূমিকা নেই। সে ভালবাসে মানুষের রক্ত, মানুষের নিঃশ্বাস নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সংস্পর্শ, মানুষের ঘাম নিঃসরিত বিশেষ রাসায়নিকের গন্ধ এবং মনুষ্য শরীরের উত্তাপ। মানুষ তার গেরিলা যুদ্ধের চাঁদমারি, মানুষের রক্তে তার উদরপূর্তি। তার একটি কামড় জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে, তৈরী করতে পারে অনেক অনেক মারণঘাতী ব্যাধি। এই মশককূল ও তাদের ছড়ানো অসুখ যত মানুষ মেরেছে ইতিহাসের যাবতীয় যুদ্ধে মৃত মানুষের সংখ্যা অনেক কম।''

—সাংবাদিক দময়ন্তী দত্ত

* * *

''কি সি কো রিজার্ভেশন চায়ে তে কি সি কো আজাদি ভাই,
হামে কুছ্ নাহি চাহে হে ভাই বাস আপনি রাজাই।''

—হরিয়ানার জাঠ সংরক্ষণ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র জিন্দের অধিবাসী এবং মতাধিকার সহ জীবনদর্শন ও জীবনযাত্রার সমস্ত বিষয়ে স্বাধীনতার শ্লোগানে মুখর নয়া দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ২৩ বছর বয়সী এলিট প্যারা-কমাণ্ডো ক্যাপ্টেন পবনকুমার তিন তিনবার কাশ্মীরে জঙ্গী কবলমুক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। তার শেষ ফেসবুক পোষ্ট থেকে।

* * *

''আমার অ্যাসিড আক্রান্ত এই মুখই আজকের ক্ষতবিক্ষত যুদ্ধক্ষেত্র বাস্তারের প্রতিচ্ছবি।''

—দীর্ঘদিন বিনাবিচারে জেলবন্দী এবং পুলিশ কর্তৃক বারবার বেপরোয়া শারীরিক ও যৌন নিগ্রহের শিকার, সাম্প্রতিক অ্যাসিড আক্রান্তা, প্রাক্তন শিক্ষিকা, বর্তমান গৃহযুদ্ধে দীর্ণ বাস্তারের মুখ অসম সাহসিনী আদিবাসী মানবাধিকার কর্মী ও এ.এ.পি. নেত্রী সোনু সোরির ৮ মার্চ '১৬-র জে. এন. ই. বক্তৃতা থেকে।

* * *

''ইয়ে হ্যায় তুমহারি মাতা / তুম্ করো অন্তিম সংস্কার।''

—গুজরাটের দলিত আন্দোলন থেকে উঠে আসা শ্লোগান।

''আমরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকছি, থাকব। ভুয়ো সঙঘর্ষের বিরুদ্ধে মণিপুরের মায়েদের এই আন্দোলন ৩৬ বছর ধরে চলছে। আমরা লড়াই জারি রেখেছি কালাকানুন 'আফসপা'র বিরুদ্ধে, 'ইনার পারমিট' তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। আইরম শর্মিলা চানুর অনশন প্রত্যাহার ও অন্যান্য ঘোষণা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে। আমাদের আন্দোলন চলবে।''

—'মণিপুর কানবা ইমা লুপ'-র নেত্রী ইমা নাংবি।

প্রাপ্তি স্থান ঃ

বুক মার্ক ● একুশে ● পিপলস্ বুক সোসাইটি ● বইচিত্র ● ধ্যানবিন্দু ● পাতিরাম, পাভলভ ইনস্টিটিউট, র‍্যাডিকাল ইমপ্রেসন, কলেজস্ট্রীট ● এস. কে. বুকস্, উল্টোডাঙ্গা ● ইমা ও বেকার বুক স্টল, বি. বা. দি. বাগ ● প্রগ্রেসিভ বুক স্টল, রাসবিহারী ● বইকল্প, ঢাকুরিয়া ● ঘুম নেই, সরসুনা ● পশ্চিমবঙ্গ গণসাংস্কৃতিক পরিষদ, ক্রীক রো ● ফামা, বেলেঘাটা ● নাগরিক মঞ্চ, আনন্দপুর, কলকাতা ● দেবাঞ্জলি, মাথাভাঙ্গা ● গণ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা, কোচবিহার ● সুমন গোস্বামী, আলিপুর দুয়ার কোর্ট ● জাতিশ্বর ভারতী ● লার্নিং পয়েন্ট ● ওরিয়েন্টাল বুক স্টল, জলপাইগুড়ি ● দি বুকস্, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি ● ধানসিড়ি, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ ● অন্নপুর্ণা ● বুকল্যাণ্ডস, বালুরঘাট ● রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, গঙ্গারামপুর ● রূপান্তরের পথে, মালদা ● বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর ● কোরাস নাট্য গোষ্ঠী, কান্দী ● পত্রিকালয় ● ম্যাগাজিন কর্ণার, সিউড়ি ● সুবর্ণরেখা, শান্তিনিকেতন ● শ্যাম বুক স্টল, আসানসোল ● জয়া বুক স্টল, বি জোন, দুর্গাপুর ● খোয়াই ● সাহিত্য পরিষদ ● অপুর স্টল, বর্দ্ধমান ● প্রয়াস মল্লভূম, লোকপুর ● হংসরাজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ● দি বুক হাউস, কৃষ্ণনগর ● কপি সেন্টার, রাণাঘাট ● বিশুদার বুক স্টল, চাকদা স্টেশন ● বিজ্ঞানের দরবার, কাঁচরাপাড়া ● সনৎ রায় চৌধুরী, ফুলপুকুর, চুঁচুড়া ● রেলওয়ে স্টেশন বুক স্টল, শ্রীরামপুর ● বারাসাত ● খড়দহ ● সোনারপুর ● উলুবেড়িয়া ● সরস্বতী বুক স্টল, নৈহাটী ● বাণীবিতান, ডায়মণ্ডহারবার ● যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং ● শ্রমজীবী হাসপাতাল, বেলুড়, সরবেরিয়া, শ্রীরামপুর, কোপাই, উখরা ও রাণাঘাট ● ভালোপাহাড়, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া ● শ্যামল ভট্টাচার্য্য, অখাউড়া, আগরতলা ● রোশনি, জামসেদপুর ● লিটল ম্যাগাজিন মেলা ● আকাদেমী চত্বর, প্রতি মাসের চতুর্থ শনিবার।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভগিনী নিবেদিতা
(১৮৬৭ - ১৯১১)

মহীয়সী আইরিশ নারী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল যিনি সুদূর আয়ারল্যাণ্ড থেকে ভারতে এসে ভারতীয় হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন মঠমন্দিরের, সংগঠিত করেছিলেন নারী সন্ন্যাসীদের, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সমস্ত রকম সহায়তা করেছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে। ভারতীয় যুবদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন, আর্তের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রতিটি দুর্বিপাকে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সহ সৃষ্টিশীল মানুষদের কাছে ছিলেন প্রেরণা, লিখেছিলেন বহু উদ্দীপনাময় গ্রন্থ, স্থাপন করেছিলেন নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতি প্রসারে নিজেকে ধর্মীয় মঠ থেকে বিযুক্ত করেছিলেন সেই ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
(১৮৬৬ - ১৯৩৭)

বাংলার বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক যার লেখা ছোটদের অসাধারণ বইগুলি ১০০ বছরেরও উপর ধরে সকলের মনোরঞ্জন করে আসছে। আদিবাড়ি যশোর। জন্ম চব্বিশ পরগনার নেতরায়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার ছিলেন সহোদর। সরকার পরিবার ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ দেওঘর উচ্চবিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু তিনি প্রথাগত পড়াশুনা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিশু সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হন। তাঁর প্রথম শিশু সাহিত্য গ্রন্থ 'হাসি ও খেলা' ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি নিয়মিত লিখতে শুরু করেন 'সখা সখী', 'বালকবন্ধু', 'বালক', 'সন্দেশ' প্রমুখ পত্রিকায় এবং সম্পাদনা করেন 'মুকুল'। তিনি ছবির সাহায্যে অক্ষর চেনাতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর অসাধারণ ছড়াগুলির সাথে দুর্দান্ত সব ছবি ছোটদের কল্পনার জগতে আনন্দে বিভোর করে দিত। তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয় বই 'হাসিখুসি' ১৮৯৭-তে এবং বিখ্যাত 'খুকুমণির ছড়া' ১৮৯৯-তে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি ৩০টি ছোটদের ছড়ার ও গল্পের বই, ২১টি পৌরাণিক বই, ১৪টি স্কুলপাঠ্য বই এবং 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ রচনা করেন। তিনি 'সিটি বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। যেখান থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ন' প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সাল থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৃজনের কর্মকাণ্ড স্তব্ধ থাকেনি। তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে আমাদের প্রণতি জানাই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
(১৮৬৫ - ১৯৪৩)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও সম্পাদক। জন্ম বাঁকুড়ায়, ছাত্রাবস্থায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক কবিতা পড়ে দেশপ্রেমে আকৃষ্ট হন। বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ারস্ কলেজ, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন, রিপন স্কলারশিপ পান, এবং ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে'র সহ সম্পাদক ছিলেন। তিনি সিটি কলেজে ও পরে এলাহাবাদে অধ্যাপনা করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি শিশুদের পত্রিকা 'মুকুল' বের করতে শুরু করেন। তিনি 'প্রদীপ' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০১ ও ১৯০৭ সাল থেকে যথাক্রমে 'প্রবাসী' ও ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা বের করতে শুরু করেন। তাঁর সার্ধশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
(১৯১৬ - ১৯৭৫)

অমর কথা শিল্পী। তাঁর প্রখ্যাত ছোটগল্প 'রস'-র রস আস্বাদন করেননি এমন বাঙালী নেই। খুলনার মানুষ। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্গ হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি., তারপর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। তারপর দমদম অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ও পরে কলকাতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কাজ করেন। কর্মস্থলের এক বিপর্যয়ে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তিনি কর্ম হারান। চরম দারিদ্র্যে বড় পরিবার নিয়ে বস্তির এক চিলতে ঘরে বসেও তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সাহিত্য সাধনা চালিয়ে গেছেন। পরে সাংবাদিক হিসাবে 'কৃষক', 'স্বরাজ' ও 'সত্যযুগ'-এ কাজ করেন, শেষে থিতু হন 'আনন্দবাজার'-র সম্পাদকীয় বিভাগে। তাঁর প্রচুর লেখার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'দ্বীপপুঞ্জ', 'অসমতল', 'হলদে বাড়ি', 'দেহমন', 'রূপমঞ্জরী', 'উল্টোরথ', 'সুখ দুঃখের ঢেউ', 'যাত্রাপথ', 'চিলেকোঠা', 'সূর্যসাক্ষী' প্রমুখ। তাঁর গল্প নিয়ে সত্যজিৎ রায় 'মহানগর', শুভেন্দু রায় 'সওদাগর' (হিন্দি), বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 'ফেরা' সিনেমা তৈরী করেন। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

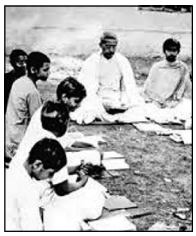

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৭ - ১৯৫৭)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ও অভিধানিক। জন্ম চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের জামাইকাঠি গ্রামে। এন্ট্রান্স ও এফ. এ. সফলভাবে পাশ করে বৃত্তি নিয়ে তিনি বি. এ. পাশ করেন। কলকাতার টাউনস্কুল শুরু হলে তিনি তার হেডপণ্ডিত নিযুক্ত হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে পাতিসরে ঠাকুরদের জমিদারির কাছারির কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। সেখানেও তাঁর সাহিত্য ও ভাষায় দখল ও গভীর অনুশীলনে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনের সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত করেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ৩০ বছর শিক্ষকতা করেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা অভিধান রচনার দায়িত্ব দেন। এটি ছিল তাঁর সেরা কাজ। বহু পুঁথি ঘেটে কঠোর পরিশ্রম করে রাত জেগে নিজের হাতে লিখে লিখে বাংলাভাষার পথিকৃত অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনা করেন। এটি প্রথমে পাঁচখণ্ডে ছিল, পরে দু'খণ্ডে গ্রন্থিত হয়। এখানে প্রতি শব্দের খুঁটিনাটি এবং যে ভাষা থেকে এসেছে তার বিস্তৃত টীকা যুক্ত ছিল। এছাড়াও সংস্কৃত ব্যাকরণ, পালিভাষা সংক্রান্ত, রবীন্দ্র জীবন বিষয়ক বেশ কিছু বই লেখেন। সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার, দেশিকোত্তম উপাধি লাভ করেন। তাঁর জন্মসাধশতবর্ষে আমাদের প্রণাম।

চিত্তপ্রসাদ

(১৯১৫ - ১৯৭৮)

অসম্ভব শক্তিশালী চিত্রশিল্পী এবং ভারতের সবচাইতে স্বীকৃত রাজনৈতিক শিল্পী। তাঁর অসাধারণ জলরঙ ও প্রিন্টমেকিং-র কাজ কথা বলত। এছাড়াও তিনি পেন ও কালির স্কেচ, লিনোকাট, উডকাট, কার্টুন, পোষ্টার, প্রচারপত্র প্রভৃতিতে তাঁর মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। নৈহাটীতে জন্ম। চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষা ও মাঠে নেমে পড়া। তাঁর আন্দোলন ও শিল্পীয় প্রতিবাদের অভিমুখ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের শোষণ নিপীড়ন। তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। বেঙ্গল স্কুল, তার সংজ্ঞা ও আধ্যাত্মবাদী চিন্তা তিনি পরিত্যাগ করেন, জাতপাত মানতেন না তাই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভট্টাচার্য্য পদবী কোনদিন ব্যবহার করেননি। মন্বন্তরের সময় গ্রামগঞ্জে ঘুরে ছবি এঁকে গেছেন ও বিভিন্ন সাময়িকে প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। সেইসব অসাধারণ চিত্র ও ওজনদার লেখা নিয়ে ১৯৪৩-এ বেরোয় 'হাংরি বেঙ্গল'। তিনি সংগ্রহশালা ও বিক্রির জন্য আঁকতেন না, আঁকতেন জন আন্দোলনের সহায়তার জন্য। তাই তাঁর বহু মূল্যবান কাজ হারিয়ে গেছে, পরে অনেকগুলি সংগৃহীত হয়েছে প্রাহা, দুবাই, মুম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহরের বহু বিখ্যাত সংগ্রহশালায়। ১৯৪৬ থেকে বম্বেতে থাকতে শুরু করেন, আই.পি.টি.এ.-কে শক্তিশালী করেন। পরে কমিউনিস্টদের বিভাজনে নিজেকে সরিয়ে নেন। আমৃত্যু বিশ্বশান্তি আন্দোলন এবং দুঃস্থ শিশুদের উন্নয়নে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধা।

শঙ্খ চৌধুরী

(১৯১৬ - ২০০৬)

দেশের অন্যতম সেরা ভাস্কর। জন্ম সাঁওতাল পরগনায়। শিক্ষা শান্তিনিকেতনে। রামকিঙ্করের প্রিয় ছাত্র। তাঁর স্থাপত্য রীতি প্রথমে কিউবিজমে পরে ইস্তভান বেথির শৈলীতে প্রভাবিত হয়। দিল্লী, বরোদা, বম্বে, এলাহাবাদ, শান্তিনিকেতন, তানজানিয়া সহ বহু শিল্প বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন। দেশ বিদেশে তাঁর অসংখ্য কাজ ছড়িয়ে আছে। 'অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন, বহু কমিশন ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন, দেশে-বিদেশে বহু প্রদর্শনী করেছেন। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা।

বিনয় ঘোষ

(১৯১৭ - ১৯৮৩)

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, সাংবাদিক, লেখক, ঐতিহাসিক, সাহিত্য সমালোচক ও গবেষক। যশোরের মানুষ। জন্ম কলকাতায়। আশুতোষ কলেজ থেকে বি. এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব নিয়ে এম. এ. পাশ করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়ার্ড', 'যুগান্তর', 'দৈনিক বসুমতী' এবং 'অরণি' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। তাঁর ছোটগল্প 'ডাস্টবিন' 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি মার্কসবাদে অনুপ্রাণিত হন। 'কালপেঁচা' নামে লিখতে শুরু করেন। তিনি প্রচলিত আকাদেমিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে একদম নীচ থেকে উপরে দেখা নিজস্ব শৈলী অবলম্বন করেন যার তিনটি স্তম্ভ ছিল— ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব। এই পর্যায়ে তাঁর কলম থেকে অসামান্য সব গ্রন্থ বেরোয়— পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ, বাংলার নবজাগৃতি, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, জনসভার সাহিত্য, কালপেঁচার নক্সা, নববাবুচরিত্র প্রমুখ। কলকাতার উপর তাঁর পাঁচটি বিখ্যাত কাজ— কলকাতার কালচার, টাউন কলকাতার চর্চ্চা, সুতানুটি সমাচার, কলকাতার ক্রমবিকাশ ও কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত। আইপিটিএ ১৯৪৩-এ তাঁর 'ল্যাবরটেরি' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। রবীন্দ্র পুরস্কার সহ বেশ কিছু পুরস্কার পান। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কাননদেবী
(১৯১৬ - ১৯৯২)

নির্বাক থেকে সবাক, বাংলা থেকে হিন্দী চলচ্চিত্রের অবিস্মরণীয় শিল্পী ও গায়িকা। হাওড়ায় জন্ম। সেন্ট অ্যাগনেস কনভেন্ট স্কুলে পড়াশুনা। পালিত পিতার মৃত্যুতে কাননবালা ও তাঁর মা অকূল পাথারে পড়েন। সেইসময় পরগৃহে তাঁদের কাজও করতে হয়। অপরূপ রূপসী কানন পারিবারিক সুহৃদ চলচ্চিত্রাভিনেতা তুলসি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশে মাত্র ১০ বছর বয়সে মদন থিয়েটারের অধীনে নির্বাক চলচ্চিত্র 'জয়দেব'-এ অভিনয় শুরু করেন (১৯২৬)। এই সংস্থার অধীনে আরও চারটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন যার শেষের দুটি পুরুষ চরিত্রে। এরপর থেকে তাঁর উত্থান শুরু। বিভিন্ন সংস্থার সাথে এবং পরে নিজে 'শ্রীমতী পিকচার্স' তৈরী করে ১৯৫৯ অবধি ৫৭টি বাংলা ও হিন্দী ফিল্মে অভিনয় করেন। যার মধ্যে 'বিদ্যাপতি', 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', 'মুক্তি', 'মেজদিদি', 'চন্দ্রশেখর', 'লগন', 'পরিচয়', 'জবাব' প্রভৃতি অগ্রগণ্য। দাপটের সাথে কাজ করেছেন কে. এল. সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, প্রমথেশ বড়ুয়া, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, অশোক কুমার প্রমুখের সাথে। একই সাথে গেয়েছেন অসংখ্য হিট গান। এই পর্যায়ে কাজ করেছেন রাইচাঁদ বড়াল, আল্লারাখা, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, অনাদি দস্তিদার প্রমুখের সাথে। কাননদেবী রবীন্দ্র সঙ্গীতেও সাফল্য অর্জন করেন। কানন দেবী 'মহিলা শিল্পী মহল' প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। দাদাসাহেব ফালকে, পদ্মশ্রী সহ পেয়েছেন বহু পুরস্কার। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা।

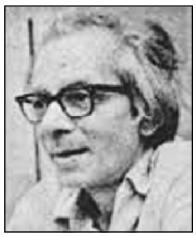

সমর সেন
(১৯১৬ - ১৯৮৭)

বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য ব্যক্তিত্ব দীনেশ চন্দ্র সেন-এর পৌত্র এবং শিক্ষাবিদ অরুণ সেনের পুত্র সমর সেন, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তদের পরবর্তীকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি হিসাবে পরিচিত। বাংলাসাহিত্যে বিপুল রবীন্দ্রপ্রভাবকে তিনিই প্রথম তাঁর কবিতায় বিযুক্ত করেন। ইংরেজী ও ফরাসী কাব্যের আধুনিকতাকে তিনি বাংলা কাব্যে নিয়ে আসেন। কবি হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করলেও তিনি অল্প বয়সে কবিতা লেখা ছেড়ে সাংবাদিকতা ও মার্কসীয় চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অনুবাদকের কাজ নিয়ে তিনি মস্কোতে পাঁচ বছর ছিলেন। পরে তিনি 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। তিনি নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছিলেন এবং এই নিয়ে অনেক প্রবন্ধ ও বই লেখেন। জরুরি অবস্থার সময় 'ফ্রন্টিয়ার' নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ক্ষুরধার ব্যঙ্গাত্মক রসিকতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। জীবনসায়াহ্নে লেখা আত্মজীবনীমূলক 'বাবুবৃত্তান্ত' তার একটি নজির। আদিবাড়ি ঢাকা। জন্ম ও কর্মস্থল কলকাতা। শিক্ষা শান্তিনিকেতন ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে। বাংলা সাহিত্যে যেমন সেন পরিবারের অনেক দান, সমর সেনের মূল কৃতিত্ব স্রোতের বিপরীতে গিয়েও যুক্তিনির্ভর সমাজবীক্ষার চর্চ্চা ও অনুশীলন। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

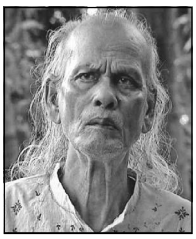

শাহ্ আবদুল করিম
(১৯১৬ - ২০০৯)

বিশিষ্ট বাউল ও লোকগানের শিল্পী। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জের উজানঢোল গ্রামে জন্ম। খুব দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা। কৃষিকাজ করে কোনরকমে দিন গুজরান করা। কিন্তু তার মধ্যেও চালিয়ে গেছেন একাগ্র সঙ্গীত সাধনা। বাউল আঙ্গিকে লোকগানের নানা মাধুর্যে উদাত্ত গলায় ছড়িয়ে দিয়েছেন উন্নত দার্শনিক চিন্তা ও চেতনা, মানুষের মধ্যেকার সাম্য ও সৌহার্দ্য, প্রকৃতি বন্দনা। তাঁর হাতের জাদুতে কথা বলত প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র একতারা। পরে তিনি শাহ্ ইব্রাহিম মাস্তান বকসের কাছে বাউল সাধনা করেন। ১৫০০-র বেশী গান লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন। তাঁর গানভাণ্ডারের ছয় খণ্ড বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা আকাদেমী তাঁর অনেক গান ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। একুশে পদক ও অনেক পদক পেয়েছেন। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধা।

রাজেন তরফদার
(১৯১৭ - ১৯৮৭)

বিশিষ্ট শিল্পী ও চলচ্চিত্রকার। রাজশাহীতে জন্ম। কলকাতার সরকারি আর্ট ও ক্র্যাফ্ট কলেজ থেকে স্নাতক হন। ভাল গ্রাফিক ডিজাইনার ছিলেন এবং একটি প্রথিতযশা বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতেন। পরে চলচ্চিত্র জগতে চলে আসেন। 'নাগপাশ', 'পালঙ্ক', 'আকাশছোঁয়া', 'জীবন কাহিনী', 'অগ্নিশিখা', 'গঙ্গা', 'অন্তরীক্ষ' তিনি পরিচালনা করেন। 'গণদেবতা', 'সংসার সীমান্তে' ও 'গঙ্গা'র চিত্রনাট্য লেখেন। 'আকালের সন্ধানে', 'আরোহন', 'খণ্ডহর', 'বসুন্ধরা'য় অভিনয় করেন। পেয়েছেন বেশ কিছু পুরস্কার। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

নবেন্দু ঘোষ
(১৯১৭ - ২০০৭)

লেখক, চিত্রনাটক লেখক ও পরিচালক। ঢাকায় জন্ম। অল্প বয়সে নৃত্যশিল্পী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে'র পটভূমিকায় 'ডাক দিয়ে যাই' লেখার জন্য ১৯৪৪ সালে তাঁর চাকরি চলে যায়। সেইসময় তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রগতিশীল লেখক হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর ২৬টি উপন্যাস এবং ১৪টি গল্প সংকলনের প্রতিপাদ্য ছিল তদানীন্তন রাজনৈতিক-সমাজ অর্থনীতিক উথাল পাথাল অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, যুদ্ধ, দেশভাগ ও উদ্বাস্তুর স্রোত। তারমধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ ও জীবনের প্রতি ভালোবাসা। পরে তিনি অন্য অনেকের মত বোম্বাই চলে যান এবং বিমল রায়ের সহকারী হিসাবে কাজ শুরু করেন। তিনি 'দো বিঘা জমিন', 'তিসরে কসম' ও 'লুকোচুরি'তে অভিনয় করেন। 'পরিণীতা', 'বিরাজ বৌ', 'দেবদাস', 'সুজাতা', 'বন্দিনী', 'অভিমান' প্রভৃতি ১৮টি চলচ্চিত্রের চিত্রনাটক লেখেন। 'পরিণীতা', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' সহ বেশ কিছু চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। বেশ কিছু পুরস্কার পান। 'একা নৌকার যাত্রী' তাঁর আত্মজীবনী। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠশিল্পী এম.এস. শুভলক্ষ্মী এবং অন্যান্যদের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উড়ালপুল দুর্ঘটনায় নিহতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

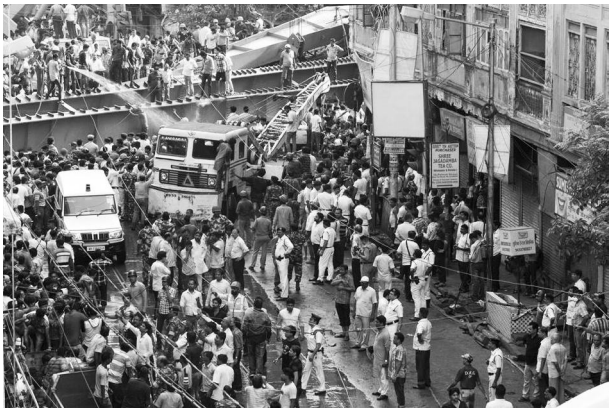

কবিতা

সেতু ভাঙে, সেতু গড়ে

রেহান কৌশিক

সেতু ভেঙে গেছে, আরও ভেঙে যাক, তোমার-আমার কী!
আমি তো সময়ে দুই হাত পেতে কমিশন নিয়েছি।

সেতু ভেঙে গেছে, আরও ভেঙে যাক, ফের টেণ্ডার দেব
প্রিয় বন্ধুকে বরাত পাইয়ে কমিশন বুঝে নেব...

মানুষ মরেছে, মানুষ মরুক, আবার তো জন্মাবে
আঠারো পেরোলে আমার লোকেরা পুনরায় ভোট পাবে।

সুতরাং জেনো, চিন্তার আর কোনও কিছু বাকি নেই
ই.ভি.এম. ভরে উপচাবে ভোট বুথে গিয়ে দাঁড়ালেই!

যারা মারা গেছে, তারা চলে যাক, জীবিতরা ভোট দিও
আমিই দেবতা, ঈশ্বর আমি চরণামৃত নিও...

জনগণ বোঝে — এ সময়কালে তাদের রক্ত — জল
এটাও জেনেছে আমার রক্ত বিদেশী অ্যালকোহল।

জনগণ কাঁদে জনগণ হাসে, কী যায় আসে আমার?
আমি ও ক্ষমতা, ক্ষমতা ও আমি মিলেমিশে একাকার...

হাঁক-ডাক সার এত মিডিয়ার, মূর্খ তো জনগণ
এভাবেই চলে দেশ ও দুনিয়া, রাজ্যের সুশাসন!

একটু পরেই চ্যানেল ভাসাব কুমিরের কান্নায়
শোক আসে আর শোক নিভে যায় শহর কলকাতায়!

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

মিড ডে মিল

অপূর্ব কোলে

আমি আর স্কুলে আসবুনি স্যার?
কী হয়েছে বাবা? কেন আসবি না?
তাড়িয়ে দিল ওরা।
কারা রে? কোন্ ক্লাস তোর?
ভাত দেয় যারা। আমাকে দিলুনি। আমি তো কেলাস নাইন।
আমাকে তুলে দিলে কেন স্যার। এইটে আমি তো সব বিষয়ে ফেল।
পাশ করিয়ে আমার পেটের ভাত কেড়ে নিলে স্যার!
আমার স্কুলে এসে আর কী লাভ?
মা বলেছে জরির কাজে লাগিয়ে দেবে। তারা দুপুরে পেটভাত দেয়।

আমি কথা বলতে পারিনি। পালিয়ে এসেছি।

কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি নবম শ্রেণিতে উঠলে
ছাত্রের পেট বড়ো থেকে ছোটো হয়, না ছোটো থেকে বড়ো ...

আপনি একটু ভাববেন স্যার।

রোদ্দুর

শ্রীজাত

শীতের সকালে আবার এসেছে 'দিল্লি চলো'-র ডাক
ক্ষমতার হাতে কেমন মানায়, গণতন্ত্রের শাঁখ?
ধরপাকড়েই জেগে ওঠে ফের দেশপ্রেমের স্মৃতি
সম্প্রদায়ের জমায়েত ঘিরে শাসকের সম্প্রীতি।
কী করেছে ওরা? দেশদ্রোহিতা। দেশ কাকে বলে, প্রিয়?
সমালোচনার অধিকার রাখে, যারা তার আত্মীয়।
তুমি তা মানো না, তোমার পায়েই প্রশাসন মাথা রাখে
সব নাটকেই দুগ্ধপোষ্য উপাচার্যেরা থাকে।
অভিসারে আসে পুলিশবাহিনী, ছুঁয়ে বলে 'ভালবাসি'
তুমি তোলো লাঠি, তার বিরুদ্ধে কানহাইয়া ধরে বাঁশি।
এখন বাঁশির সুরে মাতোয়ারা অমল-সুধার দল
দেশ ভেঙে গেলে কোথায় থাকবে নরেন্দ্র, আফজল?
স্লোগানেই গীতা, স্লোগানে কুরআন, মুঠোয় হৃদয় পোরা
তোমার শাসন তেজী হতে পারে, হার মানবে না ওরা।
ক্ষমতার নীল অলিন্দ, সেও ইতিহাস হয়ে যায়
রাজপথ নেবে রোদ্দুর আজ, দিল্লির কুয়াশায়...

ধর্ম

হাফিজ সরকার

ধর্ম তুমি কোথায় থাকো
চুল, ত্বক না গোঁফের তলে?
সত্যি তুমি থাকছো কোথায়
টাক, টিকি না দুই বগলে?

ধর্ম তোমার কোথায় নিবাস
বোরখায় না লাল সিঁদুরে?
ধর্ম কাকে দিচ্ছো মদত
মৌলবি না জাত হিঁদুরে?

ধর্ম তুমি থাকছ কোথায়
চুল দাড়ি না পৈতে গিঁটে?
কোথায় তোমার আসল ঘাটি
মক্কায় না তারার পিঠে?

ধর্ম তুমি কোথায় ঘোরো
বাবরিতে না রাম-দুয়ারে?
ভাসছো নাকি শুনতে পেলাম
রাজনীতি আর ক্রোধ জোয়ারে।

ধর্ম তুমি তৃপ্ত কিসে,
কুরবানি না বলিদানে?
কখন তুমি নাড়াও মাথা
আজান নাকি গীতার গানে?

ধর্ম নাকি আড্ডা মারো
ব্লাডব্যাঙ্ক আর হোটেলগুলোয়
আড্ডা নাকি মারছ শুনি
কবরখানায় শ্মশান চুলোয়;

ধর্ম তোমার ইচ্ছেটা কি
বিচ্ছেদ আর রক্তমাখা
স্রষ্টার সব সৃষ্টিকে কি
ধন্দ দিয়ে সরিয়ে রাখা?

মহাকবি হলধর নাগ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

আল্লা বনাম গোপালা —*যশপাল*

লেখকের জন্ম : ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৩ ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্ট, পাঞ্জাব, মৃত্যু : ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬

[মুন্সী প্রেমচন্দর পর সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে যশপাল অন্যতম ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। যার ফলস্বরূপ এক দীর্ঘ সময় তাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। ভগৎ সিংহ, রাজগুরু, বটুকেশ্বর দত্ত, চন্দ্রশেখর আজাদ-এর সহযোগী ছিলেন। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত হন। 'দিব্যা', 'দেশদ্রোহী', 'ঝুটা সচ্', 'মনুষ্য কে রূপ', 'দাদা কমরেড' প্রভৃতি উপন্যাস ও প্রচুর ছোট গল্প ও ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমে হিন্দী সহ ভারতীয় সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেন।

যশপাল এমন একজন সাহিত্যিক ছিলেন যিনি স্বপ্ন দেখতেন এক শোষণমুক্ত সমাজের। এবং তার জন্য সারাজীবন সংঘর্ষ করেছেন। সমাজকে, তার বিভিন্ন প্রেক্ষিতকে তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতেন। তারই ফলশ্রুতিতে তার রচনা প্রগতিবাদী সাহিত্যর প্রতিনিধি রচনা রূপে গণ্য হয়।

অনূদিত গল্পটি মূল রূপে হিন্দী ভাষায় 'খুদা ঔর খুদা কী লড়াই' নামে প্রকাশিত হয়। গল্পটির পটভূমি ছিল দেশভাগের যন্ত্রণা। গল্পটি রাজকমল প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত যশপালের 'প্রতিনিধি কাহানিয়া' নামক গ্রন্থে সংকলিত। গল্পটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য আমরা তাদের কাছে ঋণী।— সম্পাদকমণ্ডলী]

ভয়ানক অন্ধকার, কারফু জারি করা রাতের নিস্তব্ধতা। পঙ্গু গলির দুপাশের যত দোতলা-তিনতলা বাড়ি আছে তার কোনও জানলা বা দরজা দিয়ে আলোর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে না। আলো তো দূর বাড়িগুলোতে কোনও মানুষ আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। বাজারের পাশের এই গলিতে ইলেকট্রিক লাইনে কমিটি থেকে লাগানো ল্যাম্প চারদিন আগেই বাজারে আগুন লাগার জন্য খারাপ হয়ে পড়ে আছে। খাঁ খাঁ করা, খালি হয়ে যাওয়া বাড়িগুলো গলির অন্ধকারকে আরো যেন গভীর ও ভয়াবহ করে তুলেছে। গলির মুখে বড়রাস্তার ওপারে বসা সৈয়দমিঠ্ঠা বাজারেও যেন সুগভীর নিরবতা। ফাঁকা বাজারের একেবারে শেষ মাথায় এখনো অক্ষত একটা মাত্র বিজলি বাতির টিমটিম করে জ্বলতে থাকা আলো যেন গোটা তল্লাটের পরিবেশকে আরো থমথমে করে তুলেছে।

দেশভাগ ঘোষণার পর পরই লাহোর প্রদেশ বিশেষতঃ শহরাঞ্চলের দুই সম্প্রদায়ের মানুষ পারস্পরিক ঘৃণা আর অবিশ্বাসের কারণে হত্যা আর ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। যা থামাতে কারফু জারি করা হয়। আর কারফুর কারণে রাতের নির্জনতা পরিবেশকে আরো ভারী করে তুলেছে। এই নির্জনতার উপর আবার আগস্ট মাসের ঘন কালো মেঘ যেন এই শহরটাকে পর্দা দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে রেখেছে মনে হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে হাওয়াও চলাচল করতেও ভয় পাচ্ছে।

গঙ্গু গলির সব হিন্দু পরিবার আগস্টের ১৩ তারিখের সকাল হতে হতে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। রয়ে গেছে কেবল মুন্না তাঈ পিসি। গলিটা যেখানে বাজারের সাথে মিশেছে সেখানে ছোট ছোট দোকানদারি নিয়ে বসা মুসলমান নিয়ামত দর্জী, রশিদ কলইগর, নজ্জু পটুয়া এবং লতিফ নেচেবালা আগস্ট মাসের শুরু থেকেই ভয়ে দোকানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। কেবল গলির একেবারে শেষে বসা রংকর ফজ্জে মিত্রা আর তার জোয়ান বেটা নসরু আর কোনও উপায় না পেয়ে ওখানেই রয়ে গেছে। দোকানের সাথে লাগোয়া চার হাত লম্বা আর ছ হাত চওড়া একটা ঘরে আছে ওদের বাপ-বেটার গৃহস্থীও।

দোকানের ছাতে সার সার অনেক দড়ি খাটানো আছে। দড়িগুলো এখন সব খালি পড়ে আছে। যখন সুদিন ছিল তখন ফজ্জে আর নসরু সারাদিন পাগড়ি, শাড়ি, চুনরি, দোপাট্টা রং, মাড়, পালিস করে দড়িতে টাঙ্গিয়ে রাখত। শুকিয়ে গেলে সেগুলো তুলে ঘরের এক কোণে একটা পাল্লাহীন আলমারিতে এনে রাখত। ঐ আলমারির মধ্যেই রঙের কৌটো, ডেকচি আরও অন্যান্য পাত্র এখনো রাখা আছে। আর এক কোণে আছে বাপ-বেটার সম্পত্তি। অর্থাৎ ঐ লোটা, থালা-বাটি আর দু-চারটে পরনের কাপড়-চোপড় মাত্র। আর এক পাশে শোওয়ার জন্য একটা চাটাই পাতা থাকত। তবে শীতের দিন আর বর্ষার রাত ছাড়া তাদের ঘরের মধ্যে শোওয়ার বড় একটা দরকার পড়ত না। রাতে ঘরের বাইরে গলিতেই যাওয়া-আসার জন্য রাস্তা একটু ছেড়ে দিয়ে সেখানেই চাটাই পেতে শুয়ে পড়ত। বরং রং গোলার গামলা, মাড় দেওয়ার হাঁড়ি এগুলো ঘরের ভিতর রেখে দিত। শুয়ে শুয়ে নসরু বেশ মেজাজে গান ধরত।

মহল্লায় নসরু আর রমেশের মধ্যে হীর আর টপ্পো* গানের লড়াই খুব জমত। রমেশরা ফজ্জের দোকানের দুটো বাড়ি পরের একটা বাড়ির দোতলায় থাকত। রমেশ নিজের ঘরের জানলার ধারে বসে দুকানে হাত রেখে বেশ জোরে জোরে গাইত আর নসরু গলির মাঝে পাতা চাটাইয়ে বসে বসে রমেশের বাড়ির দিকে মুখ করে তার গানের জবাব দিত। কখনো বা দুজনে একসাথে রমেশের বাড়ির উঠোনে বসে একসাথে গলা মেলাত আর খুব হাসাহাসি করত। দুজনে ছিল দুজনের প্রিয় বন্ধু।

১৯৪৭-এর জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত সৈয়দ মিঠ্ঠায় হিন্দুদের প্রভাব ছিল। বাজারের ভিতর তিন-চারজন মুসলমান খুন হয়ে গিয়েছিল তারপর মুসলমানরা ঐ বাজারে আসা বন্ধ করে দেয়। ফলে গঙ্গু গলিতে মুসলমানদের ছোট ছোট দোকানগুলোতেও ঝাঁপ পড়ে যায়। ফজ্জে মিত্রা ভয়ে ভয়ে হলেও সাঁই-আল্লার ভরসায় ছেলেকে নিয়ে ঐ গলিতেই থেকে যায়। তার ভরসার আর একটা বড় কারণ ছিল ঐ গলির সাথে তার চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ের সম্পর্ক। গলির যত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে তাকে 'মামা' বলে ডাকত। পাড়ার বৌ-মেয়েরা তার কাছে মাথায় আঁচল ছাড়াই চলে আসত। কাপড়- চোপড় মনোমত

* প্রচলিত লোকসংগীত

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

রং বা পালিস না হলে তারা তার সাথে মন খুলে ঝগড়া করত। পাড়ার ছেলেরা ছেঁড়া ঘুঁড়ি জোড়ার জন্য যখন তখন ফজ্জের ঘরে ঢুকে রং-মাড় গোলা হাঁড়িতে আঙ্গুল ডুবিয়ে মাড় ইচ্ছে মত নিয়ে পালাত। ফজ্জে চোর চোর বলে চেঁচিয়ে একটা কাপড় শুকানোর বাঁশ খুলে নিয়ে তাদের তাড়া করত কিন্তু ফজ্জের বাঁশ নিতে নিতে ছেলেরা চোখের আড়ালে চলে যেত। গলির সকলের নাম এমন কি ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে তাদের শশুড়াল*দের নামও তার মুখস্থ ছিল। গলির সকলের সাথে তার ছিল আপনজনের সম্পর্ক। এর বাইরে তার আপনজন বলতে আর আছেই বা কে?

গঙ্গু গলিতে মুসলমানদের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়াকে হিন্দুরা নিজেদের জয় বলে ভাবল। তারই মাঝে ফজ্জে মিত্রগা আর নসরুর দোকান খুলে রাখা এবং সেখানে থেকে যাওয়াকে তারা তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে ধরে নিল। তারা তার দোকানে কাপড় রঙ করতে দেওয়া বন্ধ করে দিল। করমচাঁদ তো একদিন চোখ কুঁচকে বলেই দিল—কি মিত্রগা তোমার মতলবটা কী?

ফজ্জে হাত জোড় করে বলে—আপনারা রাজা, বাদশা, মালিক। আপনারা যা বলবেন, যা হুকুম দেবেন। চল্লিশ বছর এই গলির নুন খেয়েছি। নিজের বলতে আর তো কোনও জায়গা নেই। এখন যদি ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন তো চলে যাব। মালিক, ঝড় মাঝে মাঝেই ওঠে আবার থেমেও যায়। তাই নিয়ে মাথা গরম করা কি ভাল?

হরচরণ পনসরি তখন মিটমাট করতে এগিয়ে আসেন। বলে ছাড়, ছাড়। কি হবে কাউকে কষ্ট দিয়ে। তাছাড়া এরপর গলির বৌ-মেয়েদের জামা-কাপড় রঙ করতে হলে যাবে কার কাছে?

কিন্তু করমচাঁদের সাত বছরের ছোট ভাই ধরমচাঁদ আর রমেশের ছোট ভাই রাজেশ নিজেদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে পারল না। তারা লাঠি ঠুকে ঠুকে ফজ্জের ঘরের মধ্যে রাখা রঙ-মাড় ভর্তি হাঁড়িটাকে ভেঙ্গে দিল। এমন ঘটনা যদি দিন পনের আগে ঘটত তাহলে ছেলেরা নির্ঘাৎ বড়দের হাতে চড়-চাপড় খেত। কিন্তু সে-সময় কেউ তাদের কিছু বলল না।

নসরুর রক্ত এত ঠাণ্ডা নয়। ছেলেরা তার ঘড়া ভেঙ্গে দিলে তার রক্তও গরম হয়ে যায়। সে কাফের-হিন্দুদের হাতে এই অপমান সহ্য করতে পারছিল না। শহরের অন্যান্য প্রান্তে মুসলমানরা যা-যা করছে সেও ঐসব করতে চাইছিল। সেও তাদের মত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লড়াইকে ধর্মযুদ্ধ বলে মনে করতো, তাতে অংশ নেওয়ার জন্য সে ছটফট করতো। ভীত-সন্ত্রস্ত বাপের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার জিদের জন্যই সে কিছু করতে পারছিল না। বুড়ো বাপটাকে হিন্দুদের এই শক্ত ঘাঁটিতে একলা ফেলে রেখে কি করে যায় সে! কয়েকদিন আগেই সে বাপকে বার বার বুঝিয়েছিল এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য। এখন করমচাঁদের ধমকানি আর এইভাবে তাদের ঘড়া ভেঙ্গে দেওয়ায় নসরু রাগে গরগর করতে করতে বাপকে বলে উঠল—এই শুয়োর কাফেরদের মা কে... আর এখানে থাকা চলবে না। অন্য কোথাও যদি ঘর না মেলে তবে মসজিদ বা দরগার মেঝেতে পড়ে থাকব, সেও ভাল। তবু এখানে আর নয়।

ফজ্জে চাপা গলায় ছেলেকে বলে উঠল—চুপ কর শুয়োর, বড় মুল্লা হয়েছে যেন! এরকম টুকটাক ঘটনা সময়ে সময়ে ঘটেই থাকে। বোকার মত কথাবার্তা। এই দোকানদারি আমার বাপ শুরু করেছিল। এই ঘরেই তোর জন্ম হয়রে শুয়োর। তুই জন্মানোর সময় এই গলির মা-বউরাই তোর মাকে সামলেছিল। এই গলিতেই তোর মা শেষ বারের মত চোখ মেলে চেয়েছিল। এই গলির নুন খেয়েই তুই এতবড় হয়েছিস। এখন এসেছে মুল্লাগিরি করতে। চুপচাপ বসে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

হিন্দুদের হাতে অপমানিত হয়েও সে অপমান হজম করে ফজ্জে এখন উল্টে নসরুকেই ডাঁটছে দেখে জোয়ান ছেলের দু-চোখ জলে ভরে গেল। সে কান্না ভেজা গলায় বলে উঠল—আব্বা তুমি, তুমি মুসলমান নও।

শুনে আরো রেগে গিয়ে ফজ্জে মিত্রগা বলে—তোর মাকে শুয়োর... তুই খুব মুসলমান বনেছিস না! কোথাকার দীনদার গাজীরে তুই? তোর দাদা* মুসলমান ছিল না? তুই মুসলমানি পেলি কোথা থেকে? তুই নয়া মুসলমান হয়েছিস বুঝি? একদম চুপচাপ থাকবি।

* * *

আগস্ট, ১৯৪৭-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই সৈয়দ মিঠ্ঠা বাজারের স্থিতি বদলাতে লাগল। দু-দুবার মুসলমানদের জমায়েত থেকে হামলা হয় সেখানে। হিন্দুদের বেশ কিছু ঘর-বাড়ি দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাকি দোকানগুলোও সব বন্ধ হয়ে যায়। গঙ্গু গলির সব বাড়ির মালিক ছিল হিন্দুরা। লাহোর শহর থেকে তখন হাজার হাজার হিন্দু পরিবার এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এ খবর পেয়েও এই গলির হিন্দুরা ভয় না পেয়ে সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা বলত—আওরঙ্গজেব, নাদির শাহ পর্যন্ত ভয় পাওয়াতে পারেনি তো এই জিন্না আর তার মুসলিম লিগ আমাদের কি ভয় পাওয়াবে? আমরা না আমাদের ধর্ম ত্যাগ করব না এই মহল্লা ছাড়ব। কিন্তু সৈয়দ মিঠ্ঠায় আগুন-খুন-লুঠ প্রভৃতি ঘটনা পরপর ঘটতে থাকায় কিছু পরিবার সেখানকার পাট গোটাল। আর তারপরই বাকি পরিবারগুলোও যত তাড়াতাড়ি পারে সেখান থেকে পাততাড়ি গোটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রয়ে গেল কেবল মূলা তাঈ।

আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে মূলা তাঈয়ের স্বামী মারা যায়। ভগবান তাকে কোনও পুত্র সন্তান না দিলেও তাকে তিন কন্যা দিয়েছেন। তার স্বামী পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মূলা তাঈয়েরও দেওর জায়েদের সাথে বনত না। সবসময় তার ভয় ছিল যে আত্মীয়-জ্ঞাতিরা তাকে ঠকিয়ে

* শ্বশুরবাড়ির লোকেদের

* ঠাকুরদা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

না নেয়। সে গঙ্গুগলিতে বানানো বড় একটা বাড়িতে কয়েক ঘর ভাড়া বসিয়ে দিয়েছিল। নিজের সোনা-গহনা বিক্রি করে সেই টাকা মূলধন করে সে মহাজনি ব্যবসা শুরু করেছিল। অন্যদের সোনা-দানা বন্ধক রেখে সে লুকিয়ে লুকিয়ে সুদের টাকা ধার দিত। চোদ্দ বছর আগে ছোট মেয়েটারও বিয়ে হয়ে গেলে সে আরো এক ঘর বেশী ভাড়া বসিয়ে দেয়। ভাড়াটেদের সাথে তার কেবল ভাড়ার টাকার সম্পর্ক ছিল। ভাড়া দিতে কেউ দুদিন দেরি করলে তাকে বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দিত। প্রতিবেশীদের সাথেও তার তেমন কোনও সম্পর্ক ছিল না। ঠাকুরের পুজো পাটেই তার সারাদিন কেটে যেত।

গঙ্গু গলির অন্য হিন্দু পরিবার যখন একে একে সব মহল্লা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, মূলা তাঈ তখন আরো বেশী করে ধন-সম্পত্তি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইল। কাউকে সে নিজের বলে মনে করতো না। সংসারে এক ইষ্টদেবতা ছাড়া আর কাউকে সে আপনজন বলে ভাবত না। সকলকেই সে সন্দেহ করতো। প্রতিবেশীরা তার কৃপণতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলত—এই বুড়ি এত টাকা পয়সা নিয়ে করবেটা কি? আবার কেউ ভাবত বুড়ি বুঝি মন্দির-ধর্মশালা এরকম কিছু বানিয়ে নাম কামানোর চেষ্টায় আছে। সেই মহাসংকটকালে মহল্লা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তাদের কেউ বুড়ির বোঝা কাঁধে নিতে চাইল না, কেউ তাকে তাদের সাথে যাবার জন্য ডাকল না। খালি হয়ে যাওয়া গলিতে, ফাঁকা হয়ে যাওয়া বাড়িতে মূলা তাঈ কেবল ইষ্ট দেবতার ভরসায় রয়ে গেল আর রয়ে গেল তারই এক ভাড়াটিয়া গলির একেবারে শেষ মাথায় দোকান দেওয়া রংকর ফজ্জে মিত্রা তার বেটা নসরুকে নিয়ে।

গলির সব লোককে সপরিবারে বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে পালাতে দেখে ফজ্জে হা-হুতাশ করে বলতো—হে আল্লা এ কি বিপদ এল, সবাই চলে গেলে আমার চলবে কি করে? এতো ভূতের ডেরা হয়ে গেল। একা আমি এখানে থাকব কি করে?

অন্যদিকে কাফেরদের লোটা-কম্বল নিয়ে পালাতে দেখে নসরুর বেশ আমোদ হত। কতজন গেল সে আঙ্গুলে গুনে রাখত। আর দাঁত পিসতে পিসতে বলতো যেতে দাও জাহান্নামে ঐ হারামি কাফেরগুলোকে। পাকিস্তানে কাফেরদের কি প্রয়োজন!

১৩ই আগস্ট-এর ভোরে যখন সাধুরাম আর যমুনাদাসও সপরিবারে গলি ছেড়ে চলে গেল, তখন বড় উদাসভঙ্গিতে ফজ্জে মিত্রা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল—ব্যাস কেবল মূলা তাঈই বাকি রয়ে গেল।

নসরু মুখ ভেংচে ঘৃণার স্বরে বলে উঠল—ঐ ডাইনি আর যাবে কোথায়? নিজের সোনা-চাঁদি মাটিতে গর্ত করে পুঁতে তাতে সাপ হয়ে পাহাড়া দেবে। ওর মাকে... ও শালী যাবে কোথায়?

সেই দিন দুপুরে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায় উন্মাদ একদল মুসলমান হীরামণ্ডির দিক থেকে এসে সৈয়দ মিঠ্‌ঠা বাজারে এসে হামলা করল। হিন্দুরা নিজেদের দোকানে ভারী ভারী তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছিল। হামলাকারীরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'আল্লাহো আকবর', 'সলতনতে ইলাহি জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে একের পর এক দোকানের তালা ভেঙ্গে জিনিসপত্র লুঠ করতে লাগল। কেউ রেশম, মখমল, মলমলের থান নিয়ে দৌড়াতে লাগল। কেউ বাদাম, আটা, সুজি, কিসমিসের বস্তা কাঁধে নিয়ে সরে পড়ল। কেউ বা পিতল-কাঁসা-বাসনপত্র যা হাতের সামনে পেল লুঠ করতে লাগল। কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাজনের গদি লুঠ করতে। হৈ-হল্লা শুনে ফজ্জে মিত্রা আর নসরুও গলির মুখে এসে দাঁড়াল। নসরুর চোখ লোভে চকচক করে উঠল। বলল—আব্বা আমিও এক-আধ থান মলমলের গাঁঠরি না হয় আটা চিনির বস্তা নিয়ে আসি।

ফজ্জে ঘৃণা ভরে ধমক দেয় ছেলেকে, বলে—চুপ কর শুয়োর। নসরু তর্কের সুরে বলে ওঠে—কেন সবাই তো নিয়ে যাচ্ছে বলছে 'মালে গণিমত'।*

—ওরে শুয়োর, তালা ভেঙ্গে সিঁদ কেটে, চুরি-ডাকাতি করাকে জিহাদ বলে? 'মালে গণিমত! ব্যাটা শুওরের গু। থু থু বলে একরাশ ঘৃণা উগরে দিয়ে ফিরে নিজের দোকানের পৈঠায় গিয়ে বসল ফজ্জে মিত্রা।

নসরুর উন্মাদনা কিন্তু বাপের শাসনে কমল না। ভীড়ের মধ্যে ভীড়ে গিয়ে সে লুহারী মণ্ডির দিকে চলতে থাকল। যেতে যেতে খুন হয়ে যাওয়া তিন হিন্দুর লাস দেখে তার উন্মাদনা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এরকম সাংঘাতিক একটা কিছু করার জন্য তার হাত নিসপিস করতে লাগল।

গোটা লাহোর জুড়ে লুঠ, অগ্নিকাণ্ড, ধ্বংসকার্য এতটাই সেদিন বেড়ে গিয়েছিল যে শেষ বেলায় অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সেনাবাহিনী নামাতে হল। সেনা বোঝাই লরি সাঁই সাঁই করে বড় রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল। রাইফেলের গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ মহল্লাগুলোকে সচকিত করে তুলল। ভীড় দেখামাত্রই সেনাবাহিনী গুলি চালাতে লাগল। ফজ্জে নিজের দোকানের পৈঠায় বসে সব দেখতে লাগল। গলির মুখে একটা লোক কাপড়ে নিজেকে ঢেকে পিতলের একটা বড় ঘড়া নিয়ে ভাগছিল। হঠাৎ রাইফেল গর্জে উঠল। লোকটা দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল, আর উঠল না। তার হাত থেকে ঘড়াটা ছিটকে পড়ে একটা খন-খন করা ভূতুড়ে আওয়াজে বাজারটাকে সরব করে তুলল। ফজ্জের বুকটা ধক করে উঠল। তাইতো নসরু ফেরেনি তো, সে কোথায়?

বাজার আর গলির জায়গায় জায়গায় মিলিটারি দাঁড় করানো হয়েছে। তিনজন লোককে একসাথে কোথাও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কারফু জারি করে দেওয়া হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে সন্ধে সাতটা বাজার পর যখন কমিটির বিজলি বাতি জ্বলে উঠবে তার পর কাউকে সন্দেহজনক ভাবে রাস্তায় ঘুরতে দেখলেই গুলি করা হবে।

কারফু ঘোষণা হবার পরেও নসরু ফিরে না আসায় ফজ্জের উৎকণ্ঠা গলা পর্যন্ত এসে আটকে রইল। ছেলের চিন্তায় চোখে জল এসে গেল। জওয়ান বেটার এই হুজুগে পনায় তার খুব রাগ হতে লাগল। মুখে বার বার গালি এসে যাচ্ছিল। হতচ্ছাড়ার দিমাগ খারাপ হয়ে গেছে।

বিজলি বাতি জ্বলার আগে নসরু ঘরে ফিরে এলে ফজ্জে মিত্রার ধরে যেন প্রাণ ফিরে এল। ছেলেকে ধমক দিয়ে বলল—যা ঘরে গিয়ে বোস। খবরদার বাইরে যাবি না। নইলে সিপাইদের বন্দুকের গুলিতে পাগলা কুত্তার মত মরবি। তখন বেড়িয়ে যাবে তোর যত গাজীপানা।

* ধর্মযুদ্ধের প্রসাদ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

নসরু বেপরোয়া ঢঙে উত্তর দিল—আরে তোমার হলটা কী? এখন তো সেনাও আমাদের। সব মুসলমান ভাই। হিন্দু সিপাইরাতো সব পালিয়েছে। জান, লোকেরা পাঁচ-পাঁচ সের সোনা সাহুকারের ঘর থেকে নিয়ে গেল। নসরুর মন নিজ সম্প্রদায়ের বিজয়ে খুসিতে উড়ছিল। লুহারীমণ্ডি থেকে ফেরার সময় সে একটা খাঁটি ইস্পাতের ধারাল ছুরি সাথে নিয়ে এসেছে। পাছে সেটা দেখে বাপ ভয় পায় তাই ছুরিটা সে ঘরের চালের নীচে গুঁজে রেখেছে।

ফজ্জে আর নসরু সন্ধে সাতটার কারফুর বিউগিল বাজতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ফজ্জের আর রাতের রুটি বানাতে ইচ্ছে করছিল না। নসরুও সে ব্যাপারে কোনও হেলদোল দেখাল না। সারাদিন বড় মানসিক ধকল গেছে। ঘরের মধ্যে চাটাই পেতে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। গলির মধ্যে অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠছে ঘরের মধ্যে তো আরও বেশী। হাওয়া চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। সন্ধের পর আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে কিন্তু তাতে বৃষ্টি হবে না। এদিকে সারাদিন ধরে রোদে পোড়া তাপ আকাশে ফিরে যাবার পথ না পেয়ে গরম আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। সমস্ত শহরটা এতটাই নিস্তব্ধ যেন মনে হচ্ছে বুঝি বাতাসও শ্বাস নিতে ভয় পাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকা ফজ্জে আর নসরু ঘেমে চান করে যাচ্ছে। যতটা পারা যায় শরীরটাকে উন্মুক্ত করেও সুবিধা হচ্ছে না। প্যাচ প্যাচে ঘামে চাটাই পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে। একে কারফু তার ওপর এই গরম। খেজুর পাতার একটা হাত পাখা নিয়ে বাপ বেটায় হাত বদল করে হাওয়া করছিল। এই অবস্থায় একমাত্র আরাম হত ঘুমিয়ে পড়তে পারলে। কিন্তু দুজনের কারোর চোখেই ঘুমের কোনও চিহ্নই নেই। অবশেষে বিরক্ত হয়ে নসরু উঠে গিয়ে একটু হাওয়ার আশায় গলিতে দোকানের পৈঠার উপর গিয়ে বসল।

ঠিক তখনি গলির মধ্যে কিছুটা সামনে হাল্কা একটা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল নসরু। আওয়াজের উৎস লক্ষ করে ভাল করে তাকিয়ে দেখে যে ঐ নির্জন গলিতে অন্ধকারে মূলা তাঈ সাদা ধুতি-চাদরে গা ঢেকে পা টিপে টিপে বাজারের রাস্তার দিকে চলেছে। নসরু ঘরের ভিতর শোওয়া বাপের উদ্দেশ্যে চাপা স্বরে বলে—ঐ দেখ মূলা তাঈ লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছে।

ফজ্জে মিত্রঞা খেজুর পাতার পাখাটা এহাত থেকে ওহাতে নিয়ে শুয়ে শুয়েই বলে—হবে, একলা থাকতে বেচারি ভয় পাচ্ছে, তাই শেষ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এখন আল্লাই একমাত্র ভরসা।

ধীরে ধীরে মূলা তাঈ গলি থেকে বাজারের রাস্তায় গিয়ে পড়ে। নসরু একদৃষ্টিতে বুড়িকে দেখছিল এবার বলে ওঠে—কাফের বুড়ি মালকড়ি নিয়ে ভাগছে যে! বলতে বলতে উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়ায়।

ঘর থেকেই ফজ্জে উত্তর দেয়—যাকগে, আল্লাই ওকে দেখবে তোর তাতে কী?

বাপের কথা শেষ হবার আগেই নসরু চালার ভিতর থেকে ছুরিটা বার করে লাফ দিয়ে গলিতে পড়ে বুড়িকে ধরার জন্য বাজারের দিকে দৌড় লাগায়।

ফজ্জে লাফানোর শব্দে সচকিত হয়ে বাইরে বেড়িয়ে এসে ছেলেকে ঐভাবে দৌড়াতে দেখে ঘাবড়ে যায়। রাগে, দুঃখে ছেলেকে গালি দিতে দিতে দৌড়াতে থাকে তাকে আটকানোর জন্য।

নসরু পৌঁছে যায় বুড়ির কাছে। ছুরি উঁচিয়ে বুড়িকে ভয় দেখিয়ে তার ঝোলাটা কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু বুড়িও শেষ শক্তি দিয়ে ঝোলাটা নিজের কাছে রাখতে চায়।

ফজ্জে মিত্রঞা বুড়ো হাড়ে শিথিল পায়ে ছেলের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে নসরু মূলা তাঈয়ের পেটে ছুরিটা পুরো ঢুকিয়ে দিয়ে ঝোলাটা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে ফিরে আসতে থাকে। বিজলিবাতির খাম্বার নীচে পড়ে ছটফট করতে করতে মূলা তাঈ স্থির হয়ে যায়।

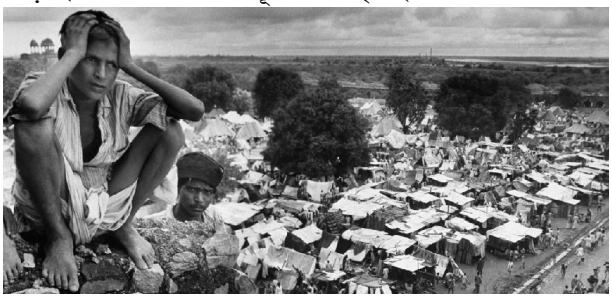

প্রবল রাগে কাঁপতে থাকলেও ফজ্জে ছেলের বিপদাশঙ্কায় তাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে ঘরের দিকে নিয়ে যায়।

নিজের সাফল্যে উল্লসিত নসরু চিৎকার করে বলে ওঠে—কাফের বুড়ি এখানকার মালকড়ি নিয়ে ভাগছিলি। এবার...। খুব দ্রুত সে ঝোলার বাঁধন খুলতে থাকে।

খুব তাড়াতাড়ি যা ঘটে গেল তার উত্তেজনায় ফজ্জের দম বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল। সে দুহাতে মাথা চেপে হাঁটু মুড়ে বসে মুখ হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল। সে সময় তার না ছিল কথা বলার শক্তি না ছিল ঝোলার বাঁধন খোলা থেকে ছেলেকে নিরস্ত করার ক্ষমতা। ক্ষমতা থাকলে সে ছেলের হাত থেকে ঝোলা কেড়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিত।

নসরু ঝোলার বাঁধন খুলে কাপড়ের আবরণটা সরাতেই 'ইয়া-স্মা' বলে চিৎকার করে উঠল। ঝোলার ভিতর একটা ছোট্ট কাঠের সিংহাসনের উপর পাথরের এক ছোট্ট গোপাল মূর্তি। আর কিচ্ছু নেই। হতাশ হয়ে নসরু বলে উঠল—কাফের বুড়িটা কেবল তার এই পাথরের খোদাকে নিয়ে ভাগছিল! তারপর নিজের উদ্দেশ্যে নাকি মৃত মূলা তাঈয়ের উদ্দেশ্যে কে জানে হাঃ হাঃ করে বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠল।

ফজ্জে মিত্রঞা এতক্ষণে তার শক্তি কিছুটা ফিরে পেয়েছে। প্রবল ঘৃণায় সে বলে উঠল—সর্বনাশ হোক তোর। বেচারি মূলা তাঈ আমাদের মকান মালিক তাকে তুই খুন করে দিলি। কি করতো সে? তার এই পাথরের খোদা দিয়ে তোর খোদার মাথা ভাঙ্গতো। মস্ত গাজী হয়ে গেলি তুই। এবারের মত নিজের খোদাকে তুই বাঁচিয়ে নিলি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ থুঃ বলে একদলা থুতু সে নসরুর দিকে ছুঁড়ে দেয়।

পাথরের বাল গোপাল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে স্মিত হাসিতে চেয়ে থাকে বাপ-বেটার দিকে।

অনুবাদ : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ভাষ্য

● ওবামার কিউবা সফর

১৯৭৩ সালে ফিদেল কাস্ত্রো একবার বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কালো প্রেসিডেন্ট এসে এবং ভ্যাটিকানে লাতিন আমেরিকান পোপ এসে কিউবার সাথে কথা বলবেন। কি অদ্ভুত মিল! ভ্যাটিকানে আর্জেন্টিনীয় পোপ ফ্রান্সিস অধিষ্ঠিত হয়ে আগেই কিউবা সফর করে গেছেন। তার আগে ১৯৯৮-এ পোপ জন পল-২। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অ্যাফ্রো-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নোবেলবিজয়ী জনপ্রিয় বরাক ওবামা তার দ্বিতীয় ও শেষ দফার শেষ লগ্নে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর বহু প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেললেন। কলম্বিন কুলিজের ৮৮ বছর পর কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিউবায় এলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় ফ্লোরিডা উপকূলে ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র কিউবা যা স্প্যানিশ উচ্চারণে কুবা। যা ছিল আড়াই শতাব্দী ধরে মার্কিন পরিকল্পিত আখ ও তামাক চাষের কেন্দ্র। যেখানকার মার্কিন ক্রীড়নক খামার মালিকদের চাবুকের ডগায় অ্যাফ্রো-হিসপ্যানিক ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের ঘাম রক্তের বিনিময়ে উৎপাদিত আখের থেকে মার্কিনিরা চিনি ও চিনিজাত উপাদেয় খাবারের স্বাদ নিতেন, উৎকৃষ্ট কিউবান তামাকের নেশায় সময় কাটাতেন। সেখানেই কিনা গুটি কতক বিদ্রোহী ক্ষমতা কায়েম করে বসল। কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ১৯৫৩-এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার পর আবার ৮০ জন বিপ্লবী ১৯৫৬-তে গ্রানমা পালতোলা নৌকায় কিউবার উপকূলে অবতরণ করেন। এবারও সামরিক আক্রমণে ৬৮ জন প্রাণ হারালে ফিদেল, চে ও রাউলরা আটজন দক্ষিণ-পূর্বের জঙ্গল-পাহাড় ঘেরা সিয়েরা মেস্ত্রায় আশ্রয় নিলেন। তারপর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে তারা ১৯৫৯-তে নয় হাজার বিপ্লবী সেনা নিয়ে হাভানা দখল করে নিলেন। তারপর থেকে অনেক ঝড় ঝাপটা এলেও কিউবা বুক চিতিয়ে লড়ে গেল। ১৯৬২-তে সোভিয়েত মিসাইল রাখা নিয়ে 'বে অফ পিগ' ঘটনায় আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ প্রায় বেধে যাচ্ছিল। মার্কিনিদের চটিয়ে কিউবা ১৯৭৬ থেকে সমাজতান্ত্রিক সংবিধান লাগু করল। ক্রুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে ভাতে মারার জন্য অর্থনৈতিক এম্বারগো জারি করল। তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট, ১৯৯১-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সহায়তা বন্ধ হওয়ার পরও কিউবা বেঁচে রইল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জৈব চাষে বিশ্ব সেরা হয়ে রইল। অবশেষে মার্কিনিদের চিন্তার পরিবর্তন। এর সাথে মার্কিনের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, মার্কিন বৃহৎ পুঁজির কিউবার বাজার, অগ্রণী স্বাস্থ্য ও কৃষি প্রযুক্তি দখল, অনন্য পর্যটন শিল্পে প্রবেশের চাপও আছে। কিউবাও ধীরে ধীরে প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে। ওবামার সফর অবশ্যই সদার্থক পদক্ষেপ, কিন্তু এখনও মার্কিনিরা অর্থনৈতিক এম্বারগো, কিউবানদের কাছে ব্লকেড, তুলে নেন নি। তাইতো নবতিপর কাস্ত্রো দেশবাসীদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের কুম্ভীরাশ্রুতে গলে যাবেন না।

● ব্রেক্সিট— কারণ ও তারপর

দুটি বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত রিক্ত ইউরোপ একসাথে পথ চলার খোঁজ করছিল। অনেকগুলি ঐতিহাসিক চুক্তি ও প্রক্রিয়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। তাতে জাত্যাভিমানী অথচ অর্থনৈতিকভাবে ধুঁকতে থাকা ইংল্যাণ্ড যুক্ত হয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থা ভাল করে নিয়েছিল। ই. ইউ. সারা পৃথিবীতে এক দৃষ্টান্তমূলক কনফেডারেশন হিসাবে কাজ করছিল এবং আবিশ্ব ইউরোর মূল্য ছিল সর্বাধিক। স্বভাবতই সাবেক সোভিয়েত ব্লকের রক্তাল্পতায় ভোগা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি, গৃহযুদ্ধে দীর্ণ বলকান রাজ্যগুলি, দক্ষিণ ইউরোপের অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন হয়ে যাওয়া দেশগুলি, মায় তুরস্ক সবার ছিল ই ইউ-র দিকে কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ। কিন্তু বিশ্বপুঁজির নেতৃত্বকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই আরও সবল ঐক্যবদ্ধ ইউরোপকে ভালো চোখে দেখেনি। তার দিক থেকে যেমন প্ররোচনা ছিল, ব্রিটেনেরও ছিল ঐতিহাসিকভাবে মার্কিনসখ্যতা এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর সাথে দ্বন্দ্ব। ফুলে ফেঁপে ওঠা জার্মান অর্থনীতি এবং ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্, মোনাকো, লাক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্কদের সচ্ছল অর্থনীতিজাত গুরুত্ব পাওয়া ব্রিটেনের শ্লাঘায় আঘাত দেয়। আর দেশের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান প্রতি-উপনিবেশ, অভিভাসন এবং অন্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বৃদ্ধি ব্রিটিশ জাত্যাভিমানী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারকে জোরালো করে। গণভোটে ৫২ শতাংশ ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দেন। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ব্রেক্সিটের বিপক্ষে ছিলেন ও পদত্যাগ করেন। স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড কমন ইউরোপের পক্ষে সায় দেয়। ব্রেক্সিটের পর পাউণ্ডের দাম কমে যায়। ব্রিটেন জুড়ে নানারকম আক্ষেপ ও বিভ্রান্তি ছড়ায়। অন্যদিকে পৃথকভাবে দেশ ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সাথে চুক্তির সুযোগ বাড়ে। ভারতের পক্ষেও কিছুটা দর কষাকষির সুযোগ এসে যায়।

● দক্ষিণ চীন সাগরে ঝড়

তেল, গ্যাস, অন্যান্য খনিজ এবং মাছ ও অন্যান্য প্রাণীজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ চীন সাগরে জলসীমা ও দ্বীপপুঞ্জগুলির দখলদারি নিয়ে ব্রুণেই, ইন্দোনেশিয়া, কাম্বোডিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও ফিলিপিনসের নিজেদের মধ্যে এবং চীনের সাথে বাকীদের দ্বন্দ্ব ও

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

মতপার্থক্য দীর্ঘদিনের। প্রবল সামরিক বলে জাপান একসময় এখানে কর্তৃত্ব করেছে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গত দু-তিন দশক ধরে চীন। ছোট দেশগুলি চীনের সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদী আচরণের জন্য অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে। সমস্যাটি আর কেবল স্পারটে, পারাসেল ও নাতুনা দ্বীপ, গালফ অফ টনকিং কিংবা নাইন ড্যাশ লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগটি নিয়ে উক্ত দেশগুলিকে নিয়ে চীনবিরোধী রণজোট গড়ে তুলতে চাইছে এবং নিজেদের নৌবহর চালিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে 'ফ্রিডম অফ নেভিগেশন' অপারেশন চালাচ্ছে। চীন রাশিয়াকে নিয়ে চালাচ্ছে যৌথ মহড়া, তৈরী করছে নৌঘাঁটি। সিঙ্গাপুর নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে। জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া আন্তর্জাতিক জলক্ষেত্রর মর্যাদা চাইছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক রায় চীনের বিরুদ্ধে যাওয়ায় চীন তা অস্বীকার করছে ও বাহুবল বাড়াচ্ছে। ফলে দক্ষিণ চীন সমুদ্রের এই গুরুত্বপূর্ণ নৌবাণিজ্য পথে ঝড় বাড়বে না কমে যাবে আমরা নিশ্চিত নই।

● এন. এস. জি. গ্রুপে অন্তর্ভুক্তির ব্যর্থতা

মূলত ভারতের পোখরান পারমাণবিক বিস্ফোরণের (১৯৭৪) পর 'নিউক্লিয়ার সাপ্লায়র্স গ্রুপ' (এন. এস. জি)-র সৃষ্টি। এন. এস. জি.-র মূল উদ্দেশ্য ছিল যে সমস্ত দেশ 'নিউক্লিয়ার নন প্রলিফারেশন ট্রিটি (এন. পি. টি.)' স্বাক্ষর করেছে তারা যেন 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি (ই. এ. ই. এ.)' এবং 'জ্যাঙ্গার কমিটি'-র বিধি মেনে চলে, তাদের কর্মসূচী যেন অস্ত্র তৈরির দিকে না এগোয় এবং নিউক্লিয়ার জ্বালানী ও প্রযুক্তি রপ্তানীর ক্ষেত্রে কঠোর বিধি নিষেধ মানা হয়। ফলে সেই থেকে পরমাণু জ্বালানী সরবরাহের বিধিনিষেধ থেকে বেরিয়ে আসতে ভারত কূটনৈতিক দৈত্য চালিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইউ. কে., রাশিয়া, জাপান, মেক্সিকো, সাময়িকভাবে সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহযোগিতা আদায় করে। অন্যদিকে মার্কিন, রাশিয়া, ফ্রান্সেরও প্রয়োজন ছিল তাদের ব্যবহৃত পরমাণু চুল্লীগুলি, পুরনো পরমাণু প্রযুক্তি, পরমাণু বর্জ্যগুলি লাভজনক মূল্যে ভারতের মাটিতে পাচার করে দেওয়া। মার্কিন প্ররোচনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এন. এস. জি.'তে প্রবেশের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠেন। তার অতিরিক্ত বিদেশযাত্রা আরও বেড়ে চলে। শেষমেষ ৪৮ জন 'এন. এস. জি.' সদস্যের মধ্যে চীন ও পাকিস্তানের তীব্র বিরোধিতায় এবং নিউজিল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের অসহযোগিতায় ভারত 'এন. এস. জি.' তে ২০১৬ বর্ষেও প্রবেশ করতে পারে না। তবে মার্কিন অনুমোদনে 'মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম (এম. টি. সি. আর)' গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

● সবাই মিলে জি. এস. টি. বিল পাশ

পুরো নাম 'গুডস্ অ্যাণ্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স' এবং বহু চর্চিত বিলটির নাম ছিল 'দ্য কনস্টিটিউশন (ওয়ান হানড্রেড অ্যাণ্ড টুয়েন্টি সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ড) বিল ২০১৪'। প্রথম চালু করে ফ্রান্স (করের হার ১৯.৬%)। এখন জার্মানী (১৯%), অস্ট্রেলিয়া (১০%), সিঙ্গাপুর (৭%), জাপান (৫%), কানাডা (৫%) প্রভৃতি ১৫০-টি দেশে চালু রয়েছে। এই নীতির ফলে পণ্য ও পরিষেবা যেখানে কেনা হচ্ছে ঐ এক জায়গাতেই কর নেওয়া হবে। ফলে হবে বাজার ও পণ্যের অবাধ গতি এবং তৈরি হবে 'কমন ন্যাশনাল মার্কেট'। পুঁজিপতি, শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ীরা সবসময় যেটি চেয়ে এসেছেন পুঁজির মসৃণ গতি ও বৃদ্ধির জন্য। এককালীন এই শুল্কের জন্য কেন্দ্রের নেওয়া উৎপাদন শুল্ক, পরিষেবা কর, আমদানি শুল্ক, সেস, সারচার্জ ইত্যাদি এবং রাজ্যের সংগৃহীত যুক্তমূল্য কর (ভ্যাট), কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর, ক্রয় কর, বিলাস কর, বিনোদন কর, প্রবেশ কর, বিজ্ঞাপন কর, সেস, সারচার্জ প্রভৃতি উঠে যাবে। দাবী করা হচ্ছে এর ফলে শুল্ক কাঠামোর সরলীকরণ হবে এবং পণ্যের মূল্য হ্রাস পাবে। কিন্তু জি. এস. টি.-র হার এখনও স্থির করা হয়নি, কেন্দ্র প্রতিবছর ইচ্ছেমত বাড়াবে কিনা জানা নেই, জানা নেই এরপর সেস, সারচার্জ বসাবে কিনা। আবার রাজ্য ও পুরসভাগুলি অন্য কায়দায় শুল্ক চাপিয়ে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেবে কিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা রাজ্য অথবা সম্মিলিতভাবে শুল্কগ্রহণ করা হবে স্থির হয়নি। পেট্রোপণ্য, মদ প্রভৃতি এর আওতার বাইরে রাখা আছে। যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোয় রাজ্যগুলির আয়ের উৎস ও ক্ষমতা কমে যাবে কিনা এবং অতিরিক্ত কেন্দ্রমুখী হতে হবে কি না এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বলা যাচ্ছে যে সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া অবধি বিবাদমান রাজনৈতিক দলগুলি, বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতি বড় সংসদীয় দলগুলির নেতৃত্বে, বৃহৎ পুঁজির চাপে যেভাবে হৈ হৈ করে বিলটি সংসদের দুই কক্ষে পাশ করালো তা চোখে পড়ার মত।

● মোহনবাগান - ইষ্টবেঙ্গলের মরণবাঁচন

ক্রনি ক্যাপিটালিজম যেভাবে মুকেশ আম্বানিদের হাত ধরে দৈত্যের মত ভারতীয় রাষ্ট্র ও ভারতীয় জনসাধারণের ঘাড়ে চেপে বসেছে তা কেজি বেসিনের অতিবৃহৎ পেট্রো ঘোটালা থেকে সামান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কিংবা অতিপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর মূল্য হাতের বাইরে চলে যাওয়া অবধি প্রতিপদে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। পুঁজির নিয়মই হচ্ছে সে কোন সীমানা মানতে চায় না আর সবসময় বাড়তে চায়। আর ভারতীয় বৃহৎ ক্রনিদের হস্তগত বৃহৎ পুঁজি তো আরও আগ্রাসী, সমাজ ও জীবনের প্রতিটি স্তরে ঢুকে পড়েছে। অন্যান্য সব কিছু দখলদারির পর মুকেশের স্ত্রী নীতা এবার ভারতের জনপ্রিয় খেলাগুলিকে নিয়ে পড়লেন। দখল চাইলেন একে নিয়ে সম্ভাবনাময় ব্যবসা ও তার থেকে বিপুল আয়ের ব্যবস্থাপনাটি। ভারতীয় ক্রীড়ার উন্নতির ইচ্ছা প্রকাশ করে ইতিমধ্যে ফাটকাপুঁজির হস্তগত ক্রিকেটের উপমহাদেশ সহ বিশ্বের বিরাট বাজারটিতে পা রাখলেন। ক্রিকেট ধ্বংসকারী ফূর্তি, বিনোদন, ফাটকা আর জুয়ার দুর্দান্ত সমাহার আইপিএলের টি-২০ টুর্নামেন্টে সবচেয়ে দামী টিম নামালেন। এরপর

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

এগোতে থাকলেন ফুটবল সহ অন্যান্য জনপ্রিয় খেলাগুলিকে দখল করতে, থুড়ি, একাধারে ধ্বংস করতে ও একচেটিয়া ব্যবসা করতে। ফুটবলের ক্ষেত্রে তার সহযোগী হলেন ভারতের সবচাইতে ধনী ও সম্ভবত সবচাইতে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক প্রফুল্ল প্যাটেল এবং তার তাবে থাকা এ. আই. এফ. এফ. ও আই. এম. জি. আর. জোট। ভারতের বৃহত্তম ও জনপ্রিয় আই লীগের পাল্টা টাকা ছড়ানো বলিউডমার্কা তামাশায় মাতা বিদেশী বুড়ো প্লেয়ার নিয়ে আই. এস. এল. দু'বছর চালিয়েও যখন দেখলেন মানুষ আসল ফুটবল অর্থাৎ দেশী বিদেশী বড় টুর্নামেন্ট, ক্লাব ফুটবল এবং আই লীগ দেখে যাচ্ছেন তখন আই লিগ তুলে দিতে এবং মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের মত নামী ও ঐতিহ্যবাহী ক্লাবগুলিকে ধ্বংস করার চূড়ান্ত ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করে ফেললেন। এমনিতেই সরকারি অবহেলা, পরিকল্পনার ও পরিকাঠামোর অভাবে ভারতীয় ফুটবল পেছিয়েই চলেছে। এবার নীতা আম্বানি ও প্রফুল্ল প্যাটেলদের হাত ধরে তার মৃত্যুপ্রতীক্ষা।

● নামেই তো আসে যায়

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজধানীর একটি সরকারি অনুষ্ঠানে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের চিফ মিনিষ্টার হিসাবে বক্তৃতা দেওয়ার ডাক পেয়েছিলেন শেষের দিকে। নামের কারণে কিনা তার অমৃত ভাষণ শেষ লগ্নে। তার খুব গোঁসা হয়। আর যেমন ভাবা তেমন কাজ। কলকাতায় ফিরেই তিনি মন্ত্রীসভা ডেকে পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা বা বঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তার এখন সুসময়। যাতে হাত দিচ্ছেন সোনা। পশ্চিমবঙ্গের শহর-গ্রাম এখন বিরোধীশূন্য। সবাই ভয়ে ভক্তিতে বা সুবিধা আদায়ে নতজানু। মায় প্যাঁচে পড়া মোদীভাই পর্যন্ত। তাই তার অমৃতভাষণও এখন বাণী। নাম পরিবর্তন নিয়ে কেউ তাই আর মুখ খুলতে চাইছেন না। দীপা কর্মকারের চাইতে ভালো প্রোদুনোভা ভল্ট দিতে পারা বিদ্বজনরা শুধু বলছেন 'সাধু সাধু'। কয়েকজন অন্য মতাবলম্বী কেবল গেরিলা কায়দায় কিছু প্রশ্ন ভাসিয়ে দিয়েছেন। (১) আচ্ছা আগে বক্তৃতা দিতে পারলেই কি কাজ হবে? তাহলে আগে থেকেও অসম, অরুণাচল, বিহার, ছত্তিশগড়রা এত অনুন্নত কেন? কেনই বা পিছনে থেকে তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশ পরিকাঠামোয় এগিয়ে? কিভাবেই বা মাঝে থেকে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরল ও পাঞ্জাব তুলনামূলকভাবে এগিয়ে? (২) অনেক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের পর পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। বাঙালী জাতির অনেক ইতিহাস-ঐতিহ্য-অনুরাগ-আবেগ-সংগ্রাম নাম সৃষ্টির সাথে জড়িত। বিশেষ করে দেশভাগ-দাঙ্গা-যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষর ব্যথা। এভাবে হুট করে নাম বদলানো যায় নাকি? (৩) যেখানে কংগ্রেস আমল থেকে শুরু হওয়া এবং বাম আমলে সমাধান না হওয়া কৃষি ও শিল্পের সঙ্কট তৃণমূল আমলে অন্তিম পর্যায়ে, অর্থনীতি সম্পূর্ণ বেহাল, আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য, বিরাট ঋণের বোঝা, অভিভাসন ও উদ্বাস্তুর চাপ, কোন চাকরি নেই, বেকারত্ব সীমাহীন, স্বাস্থ্য সঙ্কটে, আইন শৃঙ্খলা অস্তমিত, মৌলবাদী ঘাতক বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, মহিলাদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান অপরাধ, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, সামান্য দিন মজুরি, উচ্চশিক্ষা ও চাকরির জন্য অন্য রাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে তখন এটি কি আদৌ কোন ইস্যু? (৪) আর এভাবে কি কোন আলোচনা ছাড়া, বিশেষজ্ঞ-ভাষাবিদ-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মতামত না নিয়ে হুট করে একটি রাজ্যের নাম পাল্টানো যায়? কেউ কেউ গণভোটের কথা বলছেন। (৫) কারো কারো মতে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আগামী দুর্গাপুজোর আগে জনগণকে ব্যস্ত ও মাতিয়ে রাখার কোন ইস্যু নেই। বন্যা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, তোলাবাজি, ডেঙ্গু মহামারিতে মানুষ জেরবার। তাই তার জনপ্রিয়তাবাদের ঝোলা থেকে এই বিতর্কের সচেতন উপস্থাপন। (৬) আবার কারো মতে বক্তব্য ভালো হলে মানুষ পরে হলেও শুনবে? আর পরের সভা থেকে যদি কেন্দ্র পেছন থেকে অথবা অন্য কোন উন্নয়ন সূচক ধরে ডাকে— তখন কি হবে?

এরপর নামকরণ নিয়েও বিতণ্ডা। নানামুনির নানা মত। মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ বাংলা বা বঙ্গ। বাংলার সাথে বাংলাদেশ গুলিয়ে যাবার সুযোগ থাকছে। এসব দেখে একদল বলছেন পশ্চিমবঙ্গটিই যদি ইংরেজীতে লেখা হয় তাহলেই তো অনেকখানি এগোনো যাবে। নামে কি বা আসে যায়? আরে নামেই তো আসে যায়।

● মাল্টি সুপার স্পেশালিটি

স্পেশালিটি হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি ও ওবস্, পেডিয়াট্রিকস্, আই, ইএনটি, প্যাথলজি, রেডিওলজি, সোনোলজি, ডেন্টাল সার্জারি, কার্ডিওলজি, অরথোপেডিকস্, ডারমাটলজি, সাইকিয়াট্রি প্রভৃতি বিভাগগুলি থাকার কথা। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে থাকার কথা নিউরো-মেডিসিন, নেফ্রোলজি, রেসপিরেটরি মেডিসিন, এণ্ডোক্রিনোলজি, রিওম্যাটোলজি, ওনকোলজি, নিউক্লিয়ার

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

মেডিসিন, ব্রেইন সার্জারি, কার্ডিও থোরাসিক সার্জারি, প্লাসটিক সার্জারি, ইউরো সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, হিস্টোপ্যাথলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফরেনসিক মেডিসিন প্রভৃতি বিভাগ। মাল্টি সুপার শব্দটির প্রয়োগ বোধগম্য নয়। দিল্লী, নয়ডা, গুরগাঁও, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, রাঁচী বৃহত্তর গোবলয়ে চোখ খোলা রাখলেই দেখা যায় অসংখ্য সুপার স্পেশালিটি নামাঙ্কিত ছোট-মাঝারী নার্সিংহোম ও ক্লিনিক। আমাদের রাজ্যে মাননীয়া মুখ্য ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ২০১১ তে বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর জেলায় জেলায় ঘোষণা করে এসেছিলেন একাধিক মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করে দেবেন যেখানে গ্রামের মানুষের সমস্ত ধরনের চিকিৎসা হবে নিখরচে, আর যেতে হবে না শহরে। যেমন কথা তেমনি কাজ। স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্য জরুরি বিষয়গুলি ফেলে আদিবাসী উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন প্রভৃতি তহবিল উপুড় করে প্রায় প্রতিটি মহকুমায় দ্রুত তৈরি হতে লাগল বিশালাকৃতি নীল সাদা বহুতল। একেকটিতে খরচ পড়ল ৬০০ কোটির কিছু কম বেশি। এর সাথে যুক্ত হল দামী দামী যন্ত্রপাতি আসবাব। চিকিৎসা অভাবী মানুষজন প্রচণ্ড আশান্বিত হলেন। দু'হাতে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে ভরিয়ে দিলেন দিদির ভোট বাক্স। কিছু বিশেষজ্ঞ শুধু মিনমিন করে বলেছিলেন এই অর্থ, সময় ও উদ্যোগ সুপরিকল্পিতভাবে ঢালা হোক প্রচলিত উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র-প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র-গ্রামীণ হাসপাতাল-মহকুমা হাসপাতাল-জেলা হাসপাতাল-মেডিকেল কলেজ নিয়ে বিস্তৃত স্বাস্থ্য কাঠামোর আমূল সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজে। ২০১৬-র নির্বাচন চুকে গেছে। সরকারি মেডিকেল কলেজ, ব্যস্ত জেলা হাসপাতাল শূন্য করেও এই 'মাল্টি সুপার স্পেশালিটি'দের ঠিকমত চালু করা গেল না। এখন লোকবলের দোষ হল। চটপট সিদ্ধান্ত হল কর্পোরেটদের হাতে ক্রমান্বয়ে তুলে দেওয়ার। এবার দেখা যাক আপনার আমার রক্ত-ঘাম জল করা টাকায় তৈরি এই হাসপাতালগুলিতে কর্পোরেটরা কেমন নিঃখরচায় গ্রামীণ মানুষের সেবা করেন।

নয়াদিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আরএসএস-বিজেপির অসহিষ্ণুতার রাজনীতিকে পরিত্যাগ করলো

গত ৯ সেপ্টেম্বর '১৬-র **জেএনইউ-র ছাত্র নির্বাচন** এক অন্য আবহ ও অন্য মাত্রা পেয়েছিল। সারা দেশ তাকিয়ে ছিল এর ফলাফলের দিকে। গত বছর জেএনইউ ছাত্র সংসদের সভাপতি **কানহাইয়া কুমারের** উদীপ্ত আজাদী বক্তৃতার জেরে মোদি সরকার তাকে জেলবন্দী করেন। তারপর থেকে জেএনইউ ক্যাম্পাস ও রাজধানীর রাজপথ ছিল প্রগতিশীল, বামপন্থী ও বিপ্লবী ছাত্রদের যুথবদ্ধ আন্দোলনে উত্তাল। অন্যদিকে সঙ্ঘ পরিবার, মোদি সরকার ও নিজেদের বসানো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসক ও এবিভিপি-র মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় বলপূর্বক দখল নতুবা বন্ধের পরিকল্পনা নিয়েছিল। যার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও শিক্ষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক কণ্ঠ সরব ছিল, লাগাতার আন্দোলন চলছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা নির্বাচন কমিশনার ঈশিতা মান্নার পরিচালনায় এবারের ছাত্র নির্বাচন ছিল খুব উত্তেজনাপূর্ণ। **এবিভিপি** ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দলিত ছাত্র সংগঠন **বাপসপা** ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছিল। সক্রিয় ছিল **এন.এস.ইউ.আই**। **আম আদমি পার্টি** ও **স্বরাজ অভিযানের** ছাত্র শাখা এবং র‍্যাডিকাল **ডিএসএফ** অংশ নিয়েছিল। এবিভিপিকে আটকাতে এবার নজিরবিহীনভাবে ক্ষমতাসীন **এ.আই.এস.এ.** ও অন্য প্রধান বাম ছাত্র সংগঠন **এস.এফ.আই** জোট বেঁধেছিল। তাদের সমর্থন করেছিল **এআইএসএফ**। রেকর্ড ৫৯% ছাত্রছাত্রী এবার ভোট দিয়েছিল। প্রবল আজাদী শ্লোগান আর ডাফলি বাদ্যের তালের মধ্যে ফলাফলে দেখা গেল চারটি কেন্দ্রীয় প্যানেলেই বিপুলভাবে জয়ী হলেন **বাম জোট**। এ.আই.এস.এ.-র মোহিত পাণ্ডে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ছাত্র প্রতিনিধিদের মোট ২৪টি আসনের মধ্যে ২২টিই পেল বাম জোট। এবিভিপি পেল একটি আসন।

অন্যদিকে একই সময়ে অনুষ্ঠিত **দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়** ছাত্র সংসদ নির্বাচনে 'এবিভিপি' তার ধারাবাহিক জয় বজায় রাখল। যদিও চারটি সেন্ট্রাল প্যানেল আসনের একটি ছিনিয়ে নিল এন.এস.ইউ.আই। লক্ষণীয় প্রায় ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রী 'নোটা'য় ভোট দিল। ভোট বাড়ালেও বামপন্থীরা সুবিধা করতে পারলেন না।

জলের জন্য যুদ্ধ

বিশেষজ্ঞরা অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে জলের জন্য। বিশ্বযুদ্ধ না হলেও মানুষের নিজেদের অবহেলায় এবং নির্দিষ্টভাবে জনবিরোধী ব্যবসায়ী মানসিকতার অতি শক্তিশালী বৃহৎ পুঁজির বহুজাতিক সংস্থা ও তাদের পুতুল সরকারগুলি কর্তৃক যথেচ্ছ ভূস্তরের জল উত্তোলনের ফলে সবত্র জলের জন্য হাহাকার, বিশ্ব জুড়ে দেশে-দেশে, রাজ্যে-রাজ্যে, গ্রামে-গ্রামে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, মানুষে-মানুষে সংঘাত। এর আগেও অনেকবার কাবেরীর জল নিয়ে কর্নাটক-তামিলনাড়ুর বিবাদ, একটি বাঁধের উচ্চতা নিয়ে তামিলনাড়ু-কেরলের ঝগড়া, ডিভিসির জল ও ফারাক্কা নিয়ে বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের রেষারেষি কিংবা ফারাক্কা, তিস্তা ও টিপাইমুখ নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ দ্বন্দ্ব আমরা চাক্ষুষ করেছি। কিন্তু কেন্দ্রের ইপিএফে সুদ হ্রাসের ঘোষণার প্রতিবাদে বস্ত্র শ্রমিকদের অভূতপূর্ব জঙ্গী বিক্ষোভের পর আপাত শান্ত ব্যঙ্গালরু, মাইশুরু সহ কর্ণাটক এবার কাবেরীর জল বিতর্ক নিয়ে দেখাল অভাবনীয় উগ্র জাত্যাভিমানী তাণ্ডব। বহুমূল্যবান সম্পত্তি ধ্বংস হল, বহু মানুষ হতাহত হলেন। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পেরই ক্ষতি হল ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশী।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সাক্ষাৎকার

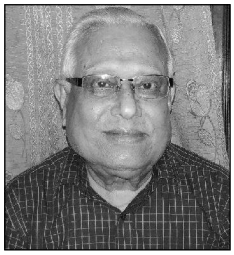

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

অমল মুখোপাধ্যায়

[আমরা উপস্থিত হয়েছি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অমল মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে। আজকের ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা অনিলায়নের পথ ধরে যখন চূড়ান্ত অধোগামী, যখন শিক্ষাবিদদের এক বড় অংশ নিজেদের এই অমনিশা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন কিংবা দল বদ্‌লে মোসাহেবী করে আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন, তখন সুনন্দ সান্যালের পর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা কৃতী ছাত্র, অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যক্ষ, অমলবাবু, সহমর্মিতা, দায়বদ্ধতা ও সাহসিকতার সাথে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংস্কারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। —সম্পাদকমণ্ডলী]

প্রশ্ন ঃ প্রথমে আপনার ছেলেবেলা, ছাত্রাবস্থা ও কর্মজীবন নিয়ে জানতে চাই।

উত্তর ঃ বাল্যে খুবই দুরন্ত ছিলাম। অক্ষর পরিচয়ের আগে থাকতেই পড়া পড়া খেলতাম। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে আগ্রহ ছিল না। বীরভূমের রামপুরহাট আমার জন্মভূমি। মামা বাড়ি ছিল সিউড়িতে। এক মামাতোদাদার সাফল্য দেখে পড়াশুনায় আগ্রহ হয়। পিতা ছিলেন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরে কোর্ট ইন্সপেক্টর। তিনি মাননীয় ভোলানাথ মণ্ডলের কাছে এক বছর পাঠাভ্যাস করালেন। ভোলানাথবাবু আমার প্রথম শিক্ষক। তাঁর অনুমোদনে ১৯৪১-এ সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই রামপুরহাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে। বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হই। স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট ভাল হল না। জেলার মধ্যে দ্বিতীয় হলাম। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলাম। সেখানে অসাধারণ সব শিক্ষক। তাঁদের সান্নিধ্য আমার জীবনের সেরা সময়। তাদের কাছে সবচাইতে সেরাটি শিখেছি। সেখান থেকেই সহপাঠী বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। এর পর প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্। আই. এ. তে রাজ্যের মধ্যে পঞ্চম হয়েছিলাম। ১৯৫৬-তে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক হই। ১৯৫৮-এ এম. এ. তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হই। তারপর 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে' যোগ দেই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে। বি. ই. কলেজে হিউম্যানিটিজ পড়াতাম। এরপর সরকারি বৃত্তি পেয়ে ইংল্যাণ্ডে পি. এইচ. ডি. করতে যাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র দার্শনিক টি. এইচ. গ্রীণের উপর আমার গবেষণাপত্র ছিল। ১৯৬৫-তে ডক্টরেট করে ২৭ বছর বয়সে সরাসরি অধ্যাপক হিসাবে প্রেসিডেন্সির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেই। ১৯৭৯তে বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৯১তে অধ্যক্ষ হই। ১৯৯৭তে অবসর নিলেও প্রেসিডেন্সিতে যে আই. এ. এস. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৯৫-এ গড়ে উঠেছিল এবং যার সাথে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলাম ১৯৯৭ থেকে তার অধিকর্তা হই। ২০০৯ পর্য্যন্ত সেখানে কাজ করি।

প্রশ্ন ঃ ছাত্র আন্দোলনের একাল ও সেকালের মধ্যে আপনার কোন পার্থক্য চোখে পড়ে?

উত্তর ঃ অনেক। সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯১৩তে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র আন্দোলন শুরু করেন। জাতীয়বাদী ছাত্র আন্দোলন চলতে থাকে। চল্লিশের দশক থেকে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। আমরাও ১৯৫৬-এ বাংলা-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে এবং ১৯৫৭-এ গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেই। তখন শিক্ষকদের ছাত্রদের প্রতি যেমন ছিল অপার স্নেহ, ছাত্রদেরও শিক্ষকদের প্রতি ছিল অসীম শ্রদ্ধা। ছিল শৃঙ্খলা, শালীনতা, সংযম ও ব্যবহারের মাধুর্য। ছাত্র আন্দোলনে তখন হিংসা প্রবেশ করেনি। ৬০-এর শেষ দিকে নকশাল আন্দোলনের সময় থেকে হিংসার সূচনা। ১৯৭২-র কংগ্রেস আমল থেকে ছাত্র আন্দোলনে সমাজবিরোধী দাপট ও বীভৎসতার শুরু। সমগ্র বাম আমলে দলবাজি, স্বজনপোষণ, অন্যায়, জুলুম, বীভৎসতার ধারা বেড়ে চলে এক সাঙঘাতিক পরিণতি লাভ করে। আর এখন যা চলছে, যা দেখছি, তাতে চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ, লজ্জিত, বাক্‌রোহিত...। ছাত্র আন্দোলন হতে হবে স্বতন্ত্র, কোন রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি নয়। মর্যাদাময়, গুণ্ডাগিরি নয়।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে কি বলবেন?

উত্তর ঃ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা চরম দুর্দশাগ্রস্ত। মান ক্রমাগত অধোগতি হয়ে তলানিতে ঠেকেছে। আমাদের, তার আগের ও পরের প্রজন্মগুলির কর্মজীবনে যতটুকু সাফল্য সেগুলি নিজেদের চেষ্টায় এবং গ্রামের সাধারণ স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানগুলির যৌথ প্রয়াসে। এখনকার প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উৎকর্ষতা হারিয়েছে, অজস্র অন্তঃসারশূন্য ভুইফোঁড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জন্ম নিচ্ছে পরিস্থিতির সুযোগে। ছাত্রছাত্রীরা অসহায়। শিক্ষালয়ে পড়াশোনা হয় না। প্রত্যেককে গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের সাহায্য নিতে হয় অনেক অর্থদণ্ডে। সেখানে হয়ত শিক্ষালয়ের শিক্ষকই অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে পড়ান। পঠনপাঠনের দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যবস্থা ও পদ্ধতির কারণে ছাত্রছাত্রীরা আজ তোতামুখী। চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা হারিয়ে গৃহশিক্ষকদের রোবটে পরিণত হয়েছে। বোর্ডের সেরাদেরও শুনি সাত-আটজন গৃহশিক্ষক, এছাড়াও নামীদামী কোচিং সেন্টারের ভূমিকা।

আগে শিক্ষকদের বেতন ছিল অতি সামান্য। দারিদ্র্যের মধ্যেও একান্ত ভালবেসে আন্তরিকভাবে তারা ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন। নিজেরা পরিশ্রম করতেন, ছাত্রদের পিছনে খাটতেন। তখন শিক্ষকতা ছিল এক মহান ব্রত। আর এখন অর্থ উপার্জনের পেশা। আশ্চর্যের কথা এখন শিক্ষকদের বেতন কাঠামো যথেষ্ট ভাল এবং তাতে সুস্থভাবে ভরণপোষণ সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও সময়ের পরিণামে শিক্ষকদের একটি বড় অংশ আরো বেশী অর্থোপার্জনের মরীচিকার পেছনে ছুটছেন। আমার বলতে দুঃখ হলেও দ্বিধা নেই যে তারা বিদ্যালয়ে-কলেজে মনোযোগ দেন না, প্রাইভেট পড়িয়ে বিপুল অর্থ রোজগারে মনোযোগী থাকেন।

অন্যদিকে সরকারের তরফ থেকে শিক্ষার উন্নতির জন্য কোন আগ্রহ বা উদ্যোগ নেই। একমাত্র আগ্রহ আনুগত্য এবং দলীয় রাজনীতি

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ও বাহুবলের বিস্তার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি ও বাণিজ্যিকিকরণ। গত পাঁচ বছরে শিক্ষার চরম বাণিজ্যিকিকরণ ঘটেছে। সরকারি আনুকূল্যে নেতা-মন্ত্রীদের বদান্যতায় অসংখ্য বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসা করে যাচ্ছে। শিক্ষাব্যবসায়ীরা বহু অর্থের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করছে। ধনী পরিবারগুলির পক্ষেই এই শিক্ষা, বিশেষত উচ্চশিক্ষা, গ্রহণ করা সম্ভব। সরকারি ছত্রছায়ায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি সংবাদজগতের সাহায্যে পাতাজুড়ে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা নিয়ে যে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তার ফাঁদে বিভ্রান্ত হয়ে বহু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবার সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। বর্তমান সরকারি শিক্ষার পঠন-পাঠন, সিলেবাস প্রভৃতিও তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। একুশ শতকের দ্রুতগামী প্রযুক্তির যুগের পক্ষে উপযোগী নয়। গত ৫০ বছরে বিশ্ব ও দেশজুড়ে বিপুল পরিবর্তনের ও উৎপাদনের সাথে তাল রেখে, পাশাপাশি দেশের বাস্তব অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে সবকিছু ঢেলে সাজাতে হবে। অথচ সরকার অমনোযোগী। শিক্ষাবিদ হিসাবে আমি হতাশ।

প্রশ্ন ঃ শিক্ষকদের দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টি কি থাকছে?

উত্তর ঃ বিপরীতটিই হচ্ছে। আজকে যারা শিক্ষকতায় আসছেন তাদের লক্ষ্য অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন। অতীতে আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে ছাত্রদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা, তাদের ভালোভাবে গড়ে পিঠে তোলা, মনপ্রাণ দিয়ে পড়াতে দেখেছি। আমরাও যখন শিক্ষকতায় এসেছি আমাদের লক্ষ্য থাকত কিভাবে নিজেদের উৎকৃষ্ট শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এখন দেখি শিক্ষকতা নিয়েই অনাগ্রহ।

প্রশ্ন ঃ 'বাংলা আজ যা ভাবছে, বাকি ভারত আগামীদিনে তা ভাববে'— আজকের পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয়?

উত্তর ঃ সেই সম্মান, সেই প্রত্যাশা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ সর্বক্ষেত্রে এক পিছিয়ে পড়া রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ অন্য সবকিছুর সাথে তার চিন্তা ও মননকেও হারিয়েছে। একমাত্র এগিয়ে রয়েছে কদর্য চিৎকারের রাজনীতিতে। চিন্তার রাজনীতি অনেকদিনই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের ব্যর্থতা এর আরেকটি উদাহরণ।

প্রশ্ন ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য একসময় শিক্ষায় অনিলায়নের বিরোধিতা করেছিলেন। আপনার কি মনে হয় অনিলায়ন শিক্ষার এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

উত্তর ঃ হ্যাঁ। অনেকটাই। আগেই বলেছি শিক্ষার স্বাতন্ত্র সম্পর্কে। শিক্ষার রাজনীতিকরণ, দলীয় রাজনীতিকরণ, এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। সেই অনিলায়ন আজও চলছে। আরও আগ্রাসীভাবে। দলের লোকের বাইরে কিছু ভাবা হয় না।

প্রশ্ন ঃ প্রেসিডেন্সি সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে গাঁটছড়া বাধাকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর ঃ এটিও ভুল। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের দেশের জলমাটির সাথে দৃঢ় থাকতে হবে। সবচাইতে বেশী জোর দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে। দেখতে হবে স্কুলশিক্ষা যেন শিশুদের কাছে আনন্দের কারণ হয়। এই কাজটিই রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। এই দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা কেবলি বিদেশীদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকার কেউই এভাবে ভাবেননি, করেননি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে তা সঠিক ও প্রয়োজনমত এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখে।

প্রশ্ন ঃ সাম্প্রতিক শিক্ষায় গৈরিকিকরণ নিয়ে যে হইচই হচ্ছে তা নিয়ে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ এটি ঠিকই যে কেন্দ্রীয় সরকার গত দু'বছর ধরে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে আর. এস. এসের লোক বসিয়ে এবং দলীয় ছাত্রসংগঠন ও পরিচালন সমিতিগুলির মাধ্যমে উগ্র স্বদেশীয়ানার নামে শিক্ষায় গৈরিকিকরণ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছেন। সর্বত্র একধরনের ফরমান বা ইনডকট্রিনেশন্ জারি করছেন। তাদের এই চিন্তা ও কর্মকাণ্ড ভুল। এর ফলে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষতি হচ্ছে। শিক্ষাকে শিক্ষা হিসাবেই দেখতে হবে। শিক্ষার মানদণ্ডে শিক্ষাকে বিচার করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ নয়াদিল্লীর জে এন ইউ সহ ছাত্র প্রতিবাদগুলি সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তর ঃ এগুলির কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অসহিষ্ণুতা। গণতন্ত্র মানে নানা মতের বিকাশ। সরকারের অবস্থানের বিরোধী কোন অবস্থান নিলেই কেউ দেশদ্রোহী হয়ে যায় না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই অসহিষ্ণুতা, সামগ্রিক শিক্ষার প্রবল অবতরণ, শিক্ষাপ্রাঙ্গনে কদর্য দলবাজি, বিশৃঙ্খলা, শিক্ষায় বাণিজ্যিকরণ-দুর্নীতিকরণের বিরুদ্ধে ছাত্রদেরতো বটেই এ রাজ্যের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে ও প্রতিবাদে সরব হতে হবে।

নারী বিপ্লবীদের অজানা কথা

বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা বসু, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরীদের অমর কৃতিত্বের কথা আমরা অল্পস্বল্প শুনেছি। ভাসাভাসা শুনেছি বিপ্লবী সুনীতিবালা সেনগুপ্ত (মা অথবা মাসীমা নামে অধিক পরিচিত), যিনি ঢাকা বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত ছিলেন, ডিনামাইট সহ ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। তারপর তাঁকে কুখ্যাত হিজলি জেল সহ বিভিন্ন জেলে দীর্ঘদিন আটক থাকতে হয়। এরকম অগ্নিযুগের ৯০০ জন নারী বিপ্লবীর কাহিনী প্রকাশিত হল ইন্টালিজেন্স ব্যুরোর (আই. বি.) ফাইল নং ২২৩/১৯, বিষয় : 'রিক্রুটমেন্ট অফ্ ফিমেলস্ ফর দ্য ফরমেশন অফ উইমেন ব্রাঞ্চ অফ দ্য রেভেলিউশনস্' প্রকাশ হওয়ার পর।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

স্মরণিকা

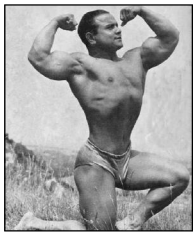

বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ
(১৯১২ - ২০১৬)

মাত্র ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে এই কাঠ বাঙাল আর কট্টর বাঙালী মনোতোষ রায়ের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে ১৯৫২-তে এন এ বি বি এ ইউনিভার্স চ্যাম্পিয়নশিপে মিষ্টার ইউনিভার্স হন। পাশাপাশি 'পকেট হারকিউলিস' আখ্যা পান। কুমিল্লায় জন্ম। ঢাকার জুবিলি স্কুলে পড়াশুনা। ছোটবেলা থেকেই কুস্তি ও ভারত্তোলনে আগ্রহ। ঢাকার 'রূপলাল ব্যায়াম সমিতি'তে ব্যায়ামানুশীলন। ১২ বছর বয়সে ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারে শরীর ভেঙ্গে পড়লেও আবার গড়ে তোলেন। পরে তিনি জাদুসম্রাট পি সি সরকারের 'ফিজিক ও ম্যাজিক' প্রোগ্রামে, এছাড়াও এককভাবে এবং কয়েকটি বাঙালী সার্কাস দলের হয়ে দেহসৌষ্ঠব ও শক্তি প্রদর্শন করতেন। ১৯৪২-এ রয়াল এয়ারফোর্সে যোগ দেন এবং আধুনিক পাওয়ার বিল্ডিং শুরু করেন। কিন্তু দেশকে অপমান করায় এক ব্রিটিশ অফিসারকে চড় মারেন। তাতে তাঁর সাত বছর জেল হয়। লাহোর, পেশোয়ার হয়ে আলিপুর জেলখানায় থাকার সময় স্বাধীনতার কারণে মুক্তি পান। বডি বিল্ডিং যে শুধু পেশী ফোলানো নয়, শক্তি বৃদ্ধিরও উপায় তা যেমন মানতেন করেও দেখিয়েছেন। তাঁর হাত ধরেই ভারতে 'পাওয়ার' বডি বিল্ডিং-র আগমন। আমৃত্যু অত্যন্ত সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ছিল তাঁর। শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের দিকে নজর দিতেন। মুসুর ডাল, পুঁইশাকের চচ্চড়ি, মাছ, মাছের মুড়ো, কচুর লতি প্রভৃতি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন দেশজ খাদ্যের প্রতি জোর দিতেন। দীর্ঘ জীবনে বহু ছাত্র তৈরী করেছেন। ইংল্যাণ্ডে, পাঞ্জাবে যাওয়ার লোভনীয় আমন্ত্রণ ছেড়ে আজীবন কলকাতাতেই থেকে গেছেন। মৃত্যুর আগে দেহ ও চক্ষু দান করে গেছেন।

অমল দত্ত
(১৯৩০ - ২০১৬)

৭০ ও ৮০-র দশক জুড়ে কলকাতা ময়দানকে টগবগ করে ফুটিয়ে রাখা ডায়মণ্ড কোচ বিদায় নিলেন। জোড়াসাঁকোয় জন্ম। পরিবারে সঙ্গীত চর্চা ছিল। নিজে ভাল তবলা বাজাতেন। মিডফিল্ডার পজিশনে খেলতেন। কলকাতা লীগে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ইষ্টবেঙ্গল ও ইষ্টার্ন রেলে খেলেন। ইষ্টবেঙ্গলের সাথে রাশিয়া ও ইউরোপ সফর করেন। ভারতের হয়ে ১৯৫৩-এ রেঙ্গুনে কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্নামেন্ট ও ১৯৫৪-এ ম্যানিলা এশিয়ান গেমসে প্রতিনিধিত্ব করেন। আপাদমস্তক ফুটবল বোদ্ধা ও ফুটবল পাগল মানুষ। অল্প বয়সে খেলা এবং ইষ্টার্নরেলের ভাল চাকরি ছেড়ে নিজের অর্থে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এফ. এ. কোচিং কোর্স করে আধুনিক ফুটবলের তাজা হাওয়া নিয়ে আসেন ভারতের মাটিতে। মান্ধাতা যুগের ক্যামেরা ঘাড়ে নিয়ে গ্রাম শহর চষে বেড়াতেন হুমড়ি খাওয়া ফুটবল পিপাসু আর ভাবী ফুটবলারদের আধুনিক ফুটবলের ঝলক দেখাতে। তাঁর প্রচেষ্টাতেই আমরা ষাটের দশকে সাদাকালো ছবিতে দেখি ব্রাজিলের বিশ্ববন্দিত ফুটবল দলের পেলে, গ্যরিঞ্চা, ভাভা, ডিডি, স্যন্টোস, টোস্টাওদের জাদু, পুসকাস-হিদেকুটি-বকসিসদের হাঙ্গেরীয়ান শিল্প কিংবা দি স্তেফানো, স্ট্যানলি ম্যথুজদের শৈলী। ফুটবলকে জনপ্রিয় করতে 'ফুটবল খেলতে হলে'-র মত বই লেখেন। অসংখ্য ফুটবলার তৈরী করেন। এরপর ১৯৬০ সালে বাংলা এবং ১৯৬৩ সালে ইষ্টবেঙ্গল দল দিয়ে শুরু হয় তাঁর বর্ণময় কোচিং জীবন। এইপর্বে ছোট বড় অসংখ্য দলের কোচিং করিয়েছেন, পেয়েছেন অসংখ্য ট্রফি। ভারতীয় দলকেও কোচিং করিয়েছেন, ট্রফি দিয়েছেন। আবার কর্তাদের সাথে মনোমালিন্যে বারবার বিতাড়িত হয়েছেন। কিন্তু অমল দত্ত তাঁর জায়গায় ছিলেন স্থির। তাঁর চ্যালেঞ্জ ছিল দুর্বল ও ছোট দল নিয়ে শক্তিশালী ও বড় দলকে হারানো বা আটকানো। এরকম কতবার যে হয়েছে। কত দলকে যে অবনমনের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন বা তুলেছেন। জুনিয়র খেলোয়াড় নিয়ে ওড়িশাকে দিয়েছেন সন্তোষ ট্রফি। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম পেশাদার ফুটবল কোচ। ভারতীয় ফুটবলে এনেছেন নিত্যনতুন ধারণা। সুইপার পজিশন, ওভারল্যাপিং, সেন্ট্রাল ডিফেণ্ডারের ধারণা, ডায়মণ্ড সিস্টেম। তাঁর সাথে পিকের দ্বৈরথ সবসময়েই ছিল উপভোগ্য।

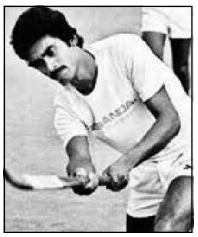

মহম্মদ শাহীদ
(১৯৬০ - ২০১৬)

ভারতীয় ফিল্ড হকি দলের অন্যতম শিল্পী খেলোয়াড়। তাঁর অসাধারণ ড্রিবলিং ও বল-কন্ট্রোল ছিল অবাক করার মত। বারাণসীতে জন্ম। ভারতের হয়ে প্রথম খেলেন ১৯৭৯-তে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত জুনিয়র বিশ্বকাপে। এরপর চতুর্দশ নেশন কাপ কুয়ালুলামপুরে ও আগা খাঁ ট্রফিতে খেলে তিনি সবাইকে মুগ্ধ করে দেন। এরপর ১৯৮০-র মস্কো ওলিম্পিকে সোনার পদক পাওয়ার পিছনে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি ইনসাইড ফরোয়ার্ডে খেললেও মূলত ছিলেন স্কিমার। তাঁর সাথে জাফর ইকবালের ভাল বোঝাপড়া ছিল। এই জুটির চেষ্টায় যেভাবে বল সাজিয়ে দেওয়া হত অন্য ফরোয়ার্ডদের গোল না করে কোন উপায় ছিল না। এছাড়াও তিনি '৮৪-র লস-এঞ্জেলস ও '৮৮-র সিওল ওলিম্পিক, ওয়ার্ল্ড কাপ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, এশিয়ান গেমসে সাফল্যের সাথে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

হেনড্রিক জোহান ক্রুয়েফ
(১৯৪৭ - ২০১৬)

ফুটবলের সত্যিকার রাজপুত্র। শক্তির সাথে দক্ষতার চমৎকার মিশ্রণ, অফুরন্ত স্ট্যামিনা, অদম্য মানসিকতা, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব এবং নির্ভেজাল ফুটবল দর্শন নিয়ে ফুটবল খেলার অন্যতম কারিগর ফ্লাইং ডাচম্যান জোহান ক্রুয়েফ। দুর্দান্ত বল-কন্ট্রোল, স্কিল ও পাশিং সমৃদ্ধ জ্যামিতিক প্রয়োগের জন্য অনেকের কাছে ফুটবলের পিথাগোরাস। নাদিয়া কোমানেচি যেমন জিমন্যসটিকসে, ক্রুয়েফ তেমন ফুটবলের কমপ্লিট প্লেয়ার। তাঁকে ধরেই স্মরণীয় ডাচ কোচ রেনে মিশেল ১৯৭০ সাল থেকে দুনিয়া কাঁপানো টোটাল ফুটবলের জয়যাত্রা শুরু করেন। ১৯৬৪ থেকে '৭৩ অবধি আজাক্সে খেলেন এবং আটবার দেশের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন এবং পর পর তিনবার ইউরোপীয় কাপ জয় করেন। ১৯৭৩ - '৭৮ অবধি বার্সেলোনায় খেলেন এবং একবার লা লিগা ও চারবার স্প্যানিশ লীগ জেতেন। তিনি '৭১, '৭২ ও '৭৪-এ ব্যলন দি'য়র বা ইউরোপের সেরা খেলোয়াড় মনোনীত হন। ১৯৭৯ থেকে ৮১ অবধি অন্যান্য ক্লাবে খেলে '৮১ তে আজাক্সে ফিরে আসেন এবং ১৯৮৪-তে অবসর নেন। দ্য নেদারল্যাণ্ডস্ জাতীয় দলে ছিলেন ১৯৫৫ - '৭৭। ১৯৭৪-এ তাঁর দল বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বে অসাধারণ ফুটবল খেলে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তোলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে হেরে রানার্স হন। তিনি গোল্ডেন বল পান। ১৯৭৮-র বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার কাছে ফাইনালে নেদারল্যাণ্ডস্ হারার সময় অনেকেই তাঁর কথা স্মরণ করছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ ফুটবলারদের ভোটে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। পেলে-র পর। ফুটবল ছাড়ার পরও ম্যানেজার হিসাবে আজাক্স ও বার্সিলোনায় বিপুল সাফল্য পান। বল নিয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার ক্রুয়েফ টার্নের জনককে ক্যানসার পরাস্ত করে ফেলল।

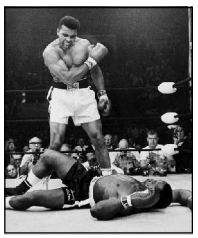

মহম্মদ আলি
(১৯৪২ - ২০১৬)

বক্সিং রিং ও তার বাইরে সর্ব অর্থে এক ক্লান্তিহীন যোদ্ধা। দুনিয়ার অন্যতম সেরা ও জনপ্রিয় খেলোয়াড়। গ্রেটেস্ট বক্সার। কেনটাকির লুইভিলের দরিদ্র নিগ্রো পরিবারে জন্ম ক্যসিয়াস ক্লে-র। দুর্দান্ত অ্যাথলিট। অবিচারের শিকার নিগ্রোদের সমস্যা সুরাহার কারণে বক্সিং-এ আসেন। ১৯৬০-র ওলিম্পিকে লাইট হেভিওয়েটে সোনা পান। ১৯৬৪-এ প্রথম বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হন সোনি লিষ্টনকে হারিয়ে। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মহম্মদ আলি হন। ১৯৬৫ তে লিষ্টনকে আবার হারান। বক্সিং-র রিং-এ শক্তির পাশাপাশি দ্রুতি, চাতুর্য, টেকনিক, ধৈর্য, স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আসেন। ১৯৬৭ তে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতার জন্য তাঁর জেল, জরিমানা হয় ও খেতাব চলে যায়। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদী হিসাবে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পরে রিং-এ ফিরে এসে তিনি আরও তিনবার হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হন। আলি ছিলেন অসামান্য বাগ্মী। ১৯৮১ তে অবসর নেন। সেইসময় থেকেই পার্কিনসনিজম্ রোগ দেহে বাসা বাঁধে। আমৃত্যু তিনি সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

"আমার শত্রু সাদা মানুষেরা। ভিয়েতকঙ, চীনা বা জাপানীরা নন। আমি যখন স্বাধীনতা চেয়েছি, তোমরা সাদা মানুষেরা আমাকে বিরোধিতা করেছো। আমি যখন সমতা চেয়েছি, তখনও করেছো বিরোধিতা। তোমরা আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য পাশে দাঁড়াওনি। সবসময়ে চেয়েছো আমি অন্য কোথাও চলে যাই আর সেখানে গিয়ে লড়াই করি। এটা আমার জন্মভূমি, এখানে কখনও আমার পাশে দাঁড়াও নি।"

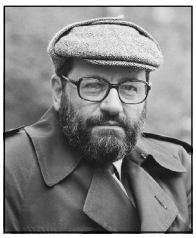

উমবের্তো একো
(১৯৩২ - ২০১৬)

বিশিষ্ট ইতালিয়ান পণ্ডিত, দার্শনিক, লেখক, সমালোচক। তাঁর মূল বিষয় ছিল সেমিয়াটিকস্ অর্থাৎ চিহ্ন, শব্দ, দ্রব্য, ভাষা, ব্যবহার, সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে কোন সময় ও সভ্যতাকে অধ্যয়ন করা। তিনি ইউরোপের প্রাচীনতম বোলগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় চার্চের দুটি পরস্পরবিরোধী ধারার সংঘাত, রহস্য ও বৈরিতা নিয়ে তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ 'দ্য নেম অফ রোজ'। ৩০টি ভাষায় অনুদিত হয়ে এক কোটির বেশী বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও তিনি ২০টির মত গ্রন্থ লেখেন।

হারপার লি
(১৯২৬ - ২০১৬)

যাকে বলে এলেন, দেখলেন, জয় করলেন, চলেও গেলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যের মনরোভিলের কন্যা। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ রাজ্যগুলিতে জাতিবিদ্বেষের পটভূমিকায় একটি ছোট্ট শহরে এক কালো মানুষকে মিথ্যা অভিযোগে বিচার করা এবং এক শ্বেতাঙ্গ আইনজীবীর তার হয়ে সংগ্রাম নিয়ে '৫০-র দশকে লিখলেন 'টু কিল আ মকিং বার্ড'। ১৯৬০-এ বেরোনোর পর হুলুস্থুল পড়ে গেল। পুলিৎজার পুরস্কার

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

পেলেন। বইটি নিয়ে অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র হল। এখনবধি বইটি চার কোটির বেশী বিক্রি হয়েছে। এক সময় বইটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ প্রজন্মের কাছে অবশ্যপাঠ্য। বইটি প্রগতিশীল আইনজীবীদের এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনে দিকনির্দেশ করেছিল। সেইময় লি সর্বত্র বিবৃতি, সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ করে একদম অন্তরালে চলে গেলেন। ৫০ বছরেরও পরে আরেকটি একইরকম বই নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন। ২০১৫-তে প্রকাশিত 'গো সেট আ ওয়াচম্যান' ও জনপ্রিয় হয়েছিল।

অ্যান্ড্রু গ্রোভ
(১৯৩৬ - ২০১৬)

হাঙ্গেরীয় উদ্বাস্তু যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হয়ে শুধু নিজের ভাগ্য ফেরাননি, ক্যালিফোর্নিয়ার জগদ্বিখ্যাত সিলিকন ভ্যালিকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এই বিশিষ্ট পদার্থবিদ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের মূল বিষয় ছিল সেমি কনডাকটারস। এ নিয়ে তাঁর অনেক কাজ রয়েছে বিশেষত কম্পিউটার হার্ডওয়ারে সুবিধাজনক সেমিকনডাকটরস ব্যবহার নিয়ে। তাঁর সংস্থা কম্পিউটার দানব ইনটেল বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে বেশী পরিমাণ কম্পিউটার ব্যবহারযোগ্য সেমিকনডাকটরস প্রস্তুত করে। তিনি ছিলেন ইনটেল কর্পের কর্ণধার অথবা সি.ই.ও.। আধুনিক ম্যানেজমেন্ট বিষয়েও তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে।

কে. জি. সুব্রহ্মনিয়াম
(১৯২৪ - ২০১৬)

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম পুরোধা। কেরলে জন্ম। শিল্পসাধনার জন্য শান্তিনিকেতনে আগমন। তিনি সেই বিরল সৌভাগ্যবান যিনি শিক্ষক হিসাবে নন্দলাল বসু, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেইজদের পেয়েছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে স্নাতক হন, চেন্নাই প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন এবং লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে স্লেড স্কুল অফ আর্টস্ নিয়ে ফেলো হন। শিল্পকলায় তাঁর যেমন ছিল দক্ষতা তেমনই ছিল বিস্তার। সবধরনের মাধ্যমে তিনি পারদর্শী ছিলেন, এমনকি কাঁচ চিত্র, পুতুল তৈরী ও তাঁত শিল্পেও নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। তাঁর চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ছিল বৈপরীত্য, বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম বিদ্রুপ। তিনি বিশ্বভারতী ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পেয়েছেন বহু পুরস্কার, অলঙ্কৃত করেছেন বহু পদ।

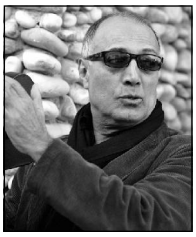

আব্বাস কিরোস্তোমি
(১৯৪০ - ২০১৬)

দারিয়ুস মেহর্‌জুই প্রমুখ প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারদের নিয়ে ইরাণীয় নিও ওয়েভ সিনেমা যা বিশ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ রেখেছিল তার জনক। একাধারে কবি, চিত্রকর, আলোকচিত্রী, চিত্রনাট্যকার, গ্রাফিক ডিজাইনার, চলচ্চিত্রকার। তাঁর জগদ্বিখ্যাত ছবিগুলি হল 'হেয়ার ইস দ্য ফ্রেণ্ডস্ হোম?', 'ক্লোজ আপ', 'থ্রু দ্য অলিভ ট্রিজ', 'টেষ্ট অফ্ চেরি', 'দ্য উইণ্ড উইল ক্যারি আস' প্রমুখ। জাফর পানাহির মত বহু স্বনামধন্য শিষ্য তিনি তৈরী করেছিলেন।

সৈয়দ হায়দর রাজা
(১৯২২ - ২০১৬)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় চিত্রকর। তদানীন্তন সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মাণ্ডলায় জন্ম। সেখানকার দামোতে সরকারি বিদ্যালয় থেকে পাশ করে নাগপুর স্কুল অফ আর্টে (১৯৩৯ - ৪৩) অধ্যয়ন করেন। এরপর বম্বের জে. জে. স্কুল অফ আর্টে (১৯৪৩ - ৪৭) উচ্চশিক্ষা নেন শিল্পকলায়। সেইসময় তিনি 'বম্বে প্রগ্রেসিভ আর্ট গ্রুপ'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৫০-এ ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে প্যারীর ই.এন.এস.বি.-এ. তে ভর্তি হন। ১৯৫৩-এ পাঠ শেষ করে প্যারীতেই থাকতে শুরু করেন। তাঁর আঁকার মাধ্যম ছিল তেল রঙ ও অ্যাক্রিলিক। বৈশিষ্ট্য ছিল রঙের তীব্রতা, বিমূর্ততা, ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ড ও দর্শনের প্রতীকগুলির উল্লেখ। তাঁর বিন্দু সিরিজ বিখ্যাত। তাঁর চিত্রগুলি অনেক দামে বিক্রি হত। তিনি পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ সহ বহু পুরস্কার পান। তিনি ফ্রান্সেও 'প্রিক্স দে লা ক্রিটিক' পুরস্কার এবং সর্বোচ্চ 'কমাণ্ডার দে ল্য লিঁজিও দ্য অনার' পান। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিশিষ্ট ফরাসী চিত্রকর জানিন মংলিয়াত।

- জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে নিহত সাধারণ কাশ্মীরী এবং উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত জওয়ানদের মৃত্যু মিছিল দেখে আমরা শোকস্তব্ধ। অবিলম্বে গণতান্ত্রিক ও শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
- সীমান্ত সঙঘর্ষ ও যুদ্ধ নয়, শান্তি ও স্থিতি চাই। যখন মানুষ চায় খাদ্য ও বস্ত্র, সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য। অবিলম্বে যুদ্ধ জিগির বন্ধ করতে হবে।
- কাজ দাও, জিনিষপত্রের দাম কমাও। চোরাচালান নয়, সীমান্ত সুরক্ষিত রাখো। প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলো।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বিশেষ স্মরণিকা

মহাশ্বেতা দেবী

(১৯২৬ - ২০১৬)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না লেখিকা, সমাজকর্মী, শবর জননী, হাজার চুরাশির মা....

সংবাদ সত্য নয় —অমর মিত্র

প্রিয় মহাশ্বেতাদি, আপনার কাছেই তো কতবার শুনেছি, কতবার উচ্চারিত হয়েছে, উলগুলানের শেষ নাই। মানুষের সংগ্রাম ফুরোয় না। বীরসা আর চোট্টি মুন্ডা বনের অধিকার বুঝে নিতেই এসেছিল, এসেই যাচ্ছে। সেই আসার বিরাম নেই। বিরাম হবে কেন, মানুষ যে সেই কত বছর ধরে যুদ্ধ করতে করতে টের পেয়েছে যুদ্ধ ফুরোয় না। মারাং দাঈ মহাশ্বেতা বলেছে, এক যুদ্ধ যেতে যেতে আর এক যুদ্ধ এসে যায়। প্রিয় মহাশ্বেতাদি, জগমোহন নামের হাতিটি তো এখনো পার হয়ে যাচ্ছে ক্ষুধার্ত পৃথিবী। তার মৃত্যু এখনো হয়ে যাচ্ছে, কত প্রলম্বিত সেই মৃত্যু, তার বুঝি আরম্ভ নেই, শেষও নেই। ক্ষুধার্ত মানুষ পার হয়েই যাচ্ছে মহাপ্রান্তর। ভয়ানক রৌদ্র, কঠিন মাটি, খিদেয় খিদেয় না খেয়ে খেয়ে মানুষগুলো বাড়েনি, অদ্ভুত সব শিশু চাল লুট করে পালায়। পালিয়ে যাচ্ছেই। প্রিয় মহাশ্বেতাদি, দ্রৌপদী মেঝেনকে কাপড় পরাবার কেউ নেই, না এখনো নেই। তার এজাহার নিয়েই যাচ্ছে ছোট কত্তা থেকে বড় কত্তা। বস্ত্রহীন দ্রৌপদী আমার দেশ মাতৃকাই হয়ে উঠেছিল মণিপুরে। ৭১-এর দেশ, ৭৭-এর দেশ আর এই বৃষ্টিহীন মাঠঘাট, নির্দয়া শ্রাবণে কোনো তফাৎ হয়নি। এতটা দিন গেল, সেই ভারতবর্ষ আর এই ভারতবর্ষকে রেখে যে আপনি চলে গেলেন, মারাং দাঈ, ছত্তিসগড়ে, জঙ্গলে জঙ্গলে মানুষ যে হাঁটু ভেঙে বসে আছে। জমি গেল, হাল গেল, ঘরের মেয়ে দ্রৌপদী মেঝেনকে বনের ভিতরে ধরেছে নিরাপত্তা রক্ষী, সকলকে রেখে চলে গেলেন। অথচ সেই বীরসা মুন্ডার দেশে, সাঁওতাল পরগণায়, সিংভূমের জঙ্গলে, ডুলং আর সুবর্ণরেখা কুলে, পথের ধারে বসে আছে তো রাবন সোরেন, জ্যাকব মুন্ডা কিংবা দ্রৌপদী মেঝেন, উৎসব নাইয়া। কতদিন ধরে বসে আছে শালবনের ধারে, হুড়ি, পাহাড় টিলার নিচে। স্টেশনের ধারে, বাবুবাড়ির দুয়ারে ভাতের জন্য। মারাং দাঈ, দিদি, মা অন্নপূর্ণা ভাত নিয়ে আসবে। মহাশ্বেতাদির থাকা আর না থাকায় অনেক তফাৎ। মহাশ্বেতাদিই তো আমাদের শিখিয়েছিলেন বহরমপুরের অনীক পত্রিকায় গল্প কেন উপন্যাসও লেখা যায়। আর সেই লেখা নিয়ে বেঁচে থাকা যায়। সেই শিক্ষাই আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চয়। মানুষের কাছে যাও। মানুষ নিয়ে লেখো। কত রকমের মানুষ তাঁর গল্পের বিষয়। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম ১৯৭৭-এর অক্টোবর কিংবা নভেম্বরে। তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমার একটি গল্প পড়ে। হ্যাঁ, এমন কতজনের খোঁজ করেছেন তিনি গল্প পড়ে, উপন্যাস পড়ে। তখন মহাশ্বেতাদিকে পড়ে আমরা উদ্দীপ্ত হয়েছি বারবার। সেই ৭২-এ প্রসাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাজার চুরাশির মা' গোপনে পৌঁছে গিয়েছিল জেলখানায় বিপ্লবীদের কাছে। তারপর ১৯৭৬-৭৭ নাগাদ কৃত্তিবাস পত্রিকায় 'অপারেশন বসাই টুডু', অমৃত পত্রিকায় 'জগমোহনের মৃত্যু ও তারপর', মহাশ্বেতাদিকে আমরা পড়েই চলেছিলাম। বহুদিনের এক অচলায়তনে যেন ঘা মেরেছিলেন তিনি। হ্যাঁ, ঘা-ই নিশ্চয়। ধামসায় ঘা দিয়েছিলেন তিনি। গ্রাম ভারতবর্ষ ফিরে এসেছিল তার ভাঙাচোরা মুখ নিয়ে। আমাদের গল্প আমাদের উপন্যাস যখন নীরক্ত, মানুষের মুখ যখন ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমাগত, তখন সেই গত শতাব্দীর সত্তর দশকে মহাশ্বেতাদি সেই বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে পথে নেমে এসেছিলেন। পথই পথ। দিদি সেই যে রোহিনী নামের গ্রাম, আদিম জাতি ঐক্য পরিষদের রাতভোর মিটিং, মনে পড়ে! সেই যে জ্যাকব মুন্ডা, বড় সাইজের ঢল ঢল হাফ শার্ট আর সস্তার প্যান্ট, যে আমার কাছ থেকে অরণ্যের অধিকার নিয়ে গিয়েছিল, তার হাত থেকে সেই বই ঘুরতে লাগল অন্যজনের কাছে, মুন্ডা গ্রামে গ্রামে, আমি আর ফেরতই পেলাম না বইটি। সেই বই এখনো ঘুরছে কারো হাতে, হাত বদল হয়েই যাচ্ছে। ৪০ বছর হয়ে গেল। কেউ যে বিশ্বাসই করবে না মারাং দাঈ নেই। মহাশ্বেতাদি আমাদের সাহিত্যের এক বিরল প্রকৃতির লেখক। তাঁর কোনো পূর্বসূরি ছিল না, তাঁর উত্তরসূরি হবে না। আরম্ভে কেন বহুদিন তাঁর স্পর্শ পেয়েছি আমি। তাঁর সমুখে বসে নতুন লেখা গল্প পড়েছি। তাঁর মতামত শুনেছি। শুনেছি তাঁর জীবনের কথা। সেই ১৩৫০-এর মন্বন্তরের কথা, তৃপ্তি মিত্র আর তিনি মন্বন্তরের কথা বলছেন, জীবিত শিশু মৃত মায়ের স্তনে মুখ দিয়ে আছে বলতে বলতে দুই মহীয়সীর চোখে জল, আমি নীরব শ্রোতা। শুনেছি ঝাঁসির রানি লিখতে একা একা ঝাঁসির পথে হেঁটেছিলেন কীভাবে সেই কথা। আমার এই সামান্য জীবনে মহাশ্বেতাদির যে অকৃপণ ভালবাসা পেয়েছি তা ধন্য করেছে আমাকে। এ জীবনের পুণ্য সেই মেলামেশা। আমাকে কোটিপতি করেছে তাঁর জীবনের স্পন্দন। মনে পড়ে চাকরির কারণে দীঘায় আমার হোটেল বাসের সময় তিনি বেড়াতে গিয়েছেন, বিকেলে আমরা ঘুরছি, হঠাৎ দেখি তিনি এক পুলিশ কনস্টবলের হাত ধরে টানাটানি করছেন, চ থানায় চ। সে গরিব আমওয়ালার ঝুড়ি থেকে বিনি পয়সায় অর্ধেক আম নিজের থলেতে ভরে চলে যাচ্ছিল। ভীড় জমে গেছে সেই অদ্ভুত দৃশ্যে। জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য একাকার। মহাশ্বেতাদি চলে গেলেন, কী করে যাবেন তিনি? হয় বীরসার দেশে গেছেন, না হয় ছত্তিশগড়ের অরণ্যে, সিংভূমের পাহাড়ে, ভাগনাডিহির প্রান্তরে। এই যাওয়া সেই পথে যাওয়া। না, সংবাদ সত্য নয়। এই মৃত্যু সত্য নয়। বসাই টুডুর কথা ভুলে গেছি আমরা? কতবার এনকাউন্টারে মরেছে বসাই, আবার মজুরির লড়াই নিয়ে অন্য জায়গায় বেঁচে উঠেছে। বসাই বসাই। মহাশ্বেতা তুমি বসাইয়ের জননী, তোমার মৃত্যু হয় না। তোমার বেঁচে ওঠার খবর ধামসা মাদলে ফিরে এল বলে।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

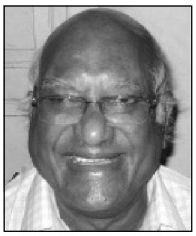

ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা
(১৯৩০ - ২০১৬)

আমৃত্যু জনহিতকর কাজ করে যাওয়া বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী
হে মহাজীবন ফিরে এসো বারবার

— সমীরণ পণ্ডা ও অরণি সেন

চলে গেলেন গরীবের চিকিৎসক। গরীব রোগের চিকিৎসক। কলকাতার 'স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন'-র ব্রিটিশ আমলে নির্মিত আউটডোরের পুরনো বড় বড় ঘর, অযত্নে মলিন, আলোর অভাব, তার চাইতেও বড় সমস্যা রোগীদের উপছে পড়া ভিড়। সেখানে ৭০ ও ৮০-র দশক জুড়ে অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্ন সহকারে যে নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক প্রতিদিন গা-গঞ্জ শহুরে বস্তির অসংখ্য জটিল, না সারতে চাওয়া রোগীদের দেখে গেছেন এবং আন্তরিকভাবে চিকিৎসা চালিয়েছেন, তিনি হলেন অধ্যাপক ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা (প্রফেসর কে. সি. সাহা নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন)। যখন চর্ম বা ডার্মাটলজি বিষয়টি তেমন কৌলিন্য পায়নি তখন তিনি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও অনুশীলন চালিয়ে গেছেন, হাতে ধরে শিখিয়েছেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে। আউটডোরে রোগীদের মধ্যে চব্বিশ পরগনার হাবড়া-অশোকনগর অঞ্চল থেকে আসা রোগীদের মধ্যে চামড়ায় কেরাটোসিসের আধিক্য দেখে তিনি গভীর অনুসন্ধান চালালেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলজি বিভাগের সাহায্যে রোগীদের নখ ও চুলের নমুনায় আর্সেনিক ডিপোজিট পেলেন। অন্যদিকে 'এ.আই.আই.পি.এইচ'-র সাহায্যে উক্ত অঞ্চলে ঘরে ঘরে গিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে ও পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষা করে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পেলেন। এরপর তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট প্রকাশিত হল ১৯৮৪ সালে যার থেকে সারা বিশ্ব জানল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় দুই বাংলা জুড়ে ক্রনিক আর্সেনিকোসিসের প্রাদুর্ভাব।

অবিভক্ত বাংলার ঢাকার মীরপুরে জন্ম। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এম.বি.বি.এস-এ মেডিসিন ও প্যাথোলজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পান। ট্রপিকাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা এবং জেনারেল মেডিসিনে এম.ডি. করেন। ১৯৫৭ তে ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে যোগ দেন। ৩০ বছর কৃতিত্বের সাথে কাজ করে ১৯৮৭-তে অবসর নেন। অধ্যাপক সাহার আর্সেনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, তার গোত্র ভাগ (চার স্তর, সাত গোত্র, ২০ উপগোত্র) প্রভৃতি যেমন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানমণ্ডলী গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই ডারমাটোগ্লাইফিকস্ নিয়ে তাঁর পথিকৃৎ গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। দেশে বিদেশে ১০০-র বেশী গবেষণাপত্র, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণ এবং ডারমাটোলজি নিয়ে বহু পুস্তক প্রকাশনা তাঁকে যশস্বী করেছে। এর বাইরেও তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত রচয়িতা, নাট্যকার, অভিনেতা ও লেখক। দূরদর্শনে নিয়মিত গানের অনুষ্ঠান করতেন। তাঁর বেশ কিছু গানের সিডি, ভিডিও ক্যাসেট বেরিয়েছিল। আর্সেনিক বিষক্রিয়াকে তিনি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সরকার ও জনসাধারণকে সচেতন করতে পথে নেমেছিলেন। পথনাটিকা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রচার আন্দোলন, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এবং রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ছুটে ছুটে যেতেন অসুস্থ দরিদ্র রোগীদের কুঁড়ে ঘরে, যথাসাধ্য তাদের সহযোগিতা করতেন। আমৃত্যু তিনি অমায়িক ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে জনহিতে কাজ করে গেছেন।

ডাঃ সুব্রত মৈত্র
(১৯৫৬ - ২০১৬)

মানবতাবাদী চিকিৎসক, মহৎ প্রাণ
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ,
নাহি নাহি দৈন্যলেশ

— সিদ্ধার্থ গুপ্ত

গত ১৭ মার্চ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন প্রথিতযশা এবং মানবদরদী চিকিৎসক ডা. সুব্রত মৈত্র। মাত্র ৫৯ বছর বয়সে মস্তিষ্কের দুরারোগ্য কর্কট রোগ ছিনিয়ে নিল তাকে। অসুখটির পোষাকি নাম গ্লোবাসটোমা মাল্টিফরমিস। ২০১৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর রোগ নির্ণয় হয়। তারপর মাথায় অস্ত্রোপচার, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, সব কিছুকে ব্যর্থ করে ডা. মৈত্র চলে গেলেন এক বছর তিন মাসের মাথায়।

কেন স্মরণ

আমাদের রাজ্যে, আমাদের দেশে প্রখ্যাত চিকিৎসকের, দক্ষ চিকিৎসাবিদের অভাব নেই। কিন্তু অবশ্যই অভাব আছে প্রকৃত অর্থে মানবদরদী চিকিৎসকের, গরীব মানুষের যন্ত্রণায় যাঁদের প্রাণ কাঁদে। যাঁরা মৃত্যুতেও এমন পদচিহ্ন রেখে যান যা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে জনগণের জন্য কাজ করতে। ডা. মৈত্র এমনই এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

প্রতিবাদী বংশ

ব্যক্তিজীবনে অভিজাত সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। পরিবারটি পূর্ববঙ্গের কুষ্ঠিয়া থেকে এপার বাংলার নদীয়ায় এসে বসবাস করতে থাকেন। পিতামহ লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ছিলেন স্বাধীনোত্তর ভারতে আইনসভার সদস্য। বাবা কাশীকান্ত মৈত্র ছিলেন বহুবারের বিধায়ক এবং মন্ত্রী। প্রখ্যাত আইনজীবী, বর্তমানে নবতিপর কাশীকান্ত বাবু জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৯৭১-এ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে এবং পরে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সহযোগিতায় সক্রিয় ছিলেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে কৃষক আন্দোলনের পক্ষে আইনজীবীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সাহায্য করেছিলেন অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং জনস্বার্থ মামলা করতে।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ব্যক্তি জীবন

ডা. মৈত্রের ছাত্রজীবন কেটেছে জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে এবং পরে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। এরপর যুক্তরাজ্যে গিয়ে তিনি লন্ডন, এডিনবরা এবং গ্লাসগো থেকে এম. আর. সি. পি. পাশ করেন। কলকাতায় ফিরে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় উডল্যান্ড হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের প্রধান হিসাবে। পরবর্তীকালে তিনি কাজ করতেন বেল ভিউ হাসপাতালে। ডা. সুব্রত মৈত্র প্রায় ১২ জনের একটি বিশেষজ্ঞ দল গড়ে তুলেছিলেন যাঁরা একসঙ্গে রোগীদের পরিষেবা দিতেন। এভাবে যৌথ পরিষেবা বেসরকারী হাসপাতালে গড়ে তোলা, এটাও তাঁর এক কৃতিত্ব।

সামাজিক অবদান

সুব্রত মৈত্র বহু মুমূর্ষু মানুষের চিকিৎসা করে তাঁদের আরোগ্য করেছেন। সেই তালিকায় অনেক প্রখ্যাত মানুষজন আছেন, যাঁরা তাকে নিয়মিত দেখাতেন। কিন্তু এসব কারণে নয়, কেবল একজন দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে নয়, রাজ্যের মানুষ সম্ভবত তাকে মনে রাখবে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল অবদানের জন্য। সুন্দরবনের সন্দেশখালি ব্লকে রঙ্গনাথানন্দ গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র তৈরিতেও তিনি সাহায্য করেছিলেন।

গত সাড়ে চার বছরের কর্মকাণ্ড

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উপর দায়িত্ব দেন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের (সেকেন্ডারি টায়ার) অর্থাৎ মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করে সেগুলি উন্নয়নের রূপরেখা তৈরির যাতে গ্রাম ও মফস্বলের মানুষ সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পান। যাতে তাদের ছোটখাটো অসুখ, অস্ত্রোপচার প্রসবের জন্য বারে বারে কোলকাতা শহরে ছুটে আসতে না হয় এবং শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলির ওপর চাপ কমে। এই উদ্দেশ্যে যে কমিটি তৈরি করা হয় তার নাম মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপ। পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে ডা. মৈত্র সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় একাধিকবার হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করেন। মোট ১১২টি ব্লক হাসপাতালে গ্রামীণ হাসপাতাল, মহকুমা ও জেলা হাসপাতালে পরিদর্শন করা হয়, যার মধ্যে অনেকগুলি পাঁচ-ছয়বারও যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পরিদর্শনের পর দফায় দফায় ডা. মৈত্রের নেতৃত্বে এই কমিটির চিকিৎসকরা (যার মধ্যে স্বাস্থ্যভবনের অধিকর্তারা ছাড়া বেসরকারি বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন) হাসপাতালগুলির অসুখ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন এবং সেগুলি দূর করার জন্য বহু মূল্যবান পরামর্শ দেন। বেসরকারি ক্ষেত্রের ডাক্তার হয়েও ডা. মৈত্রের ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতিসাধন। তাঁর কাজ ছিল জেলাগুলি পরিদর্শনের পর প্রতি সপ্তাহে স্বাস্থ্যভবনে মিটিং করে স্বাস্থ্য অধিকর্তার সামনে তুলে ধরা। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, গরীব মানুষ, সহায় সম্বলহীন মানুষ প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে ঘটিবাটি বিক্রি করে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে যায় এবং সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। সরকারি ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ছাড়া রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার সঠিক উন্নতির আর কোনও উপায় নেই।

পরামর্শ গ্রহণ

গত চার বছরে ডা. মৈত্রের পরামর্শগুলির অনেকটাই সরকার গ্রহণ করেছে এবং অনেকটাই কাজে পরিণত করেছে যা পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অবশ্যই এক নতুন উদ্যোগ।

সংক্ষেপে তার কতগুলি এখানে উল্লেখ করলাম—

১) বিভিন্ন মহকুমা ও জেলায় ৩২টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ-এইচডিইউ কমপ্লেক্স) গড়ে তোলা যার মধ্যে ২৫টি এর মধ্যে চালু হয়ে গেছে।

২) জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিট, ডিজিট্যাল এক্স-রে এবং নানা ধরনের রক্তপরীক্ষার জন্য সেমি অটোঅ্যানালাইজারের ব্যবস্থা করা।

৩) ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে কাজ করার জন্য চিকিৎসক ও সেবিকাদের নিয়মিত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা।

৪) সরকারি হাসপাতালগুলিকে রাষ্ট্রীয় বিমা যোজনা-র অধীনে নিয়ে আসা যাতে ঐ বিমার অর্থ রোগী কল্যাণ সমিতির তহবিলে রেখে নানা কাজে ব্যবহার করা যায়।

৫) সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চাপ কমানোর জন্য কোলকাতা শহরের অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু করা যেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সপ্তাহে দু থেকে তিন দিন বসবেন।

৬) ক্যানিং হাসপাতালে সাপে কামড়ানোর চিকিৎসার জন্য ও রানাঘাট হাসপাতালে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র চালু করা।

৭) আঠেরোটি বিষয়ে প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের জন্য কাউন্সিল তৈরি করা।

৮) চিকিৎসকের অভাব পূরণের জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসকদের ট্রেনিং দিয়ে অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী বানানোর জন্য প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছে।

৯) দূরবর্তী হাসপাতালগুলিতে সিজারিয়ান সেকশনের ব্যবস্থা করা।

১০) জেলা হাসপাতালগুলিতে ডিএনবি কোর্স চালু করা।

১১) বাঘাযতীন ও অশোকনগর হাসপাতালে পুরুষ নার্সিং কোর্স চালু করা।

এর মধ্যে অনেকগুলি প্রকল্প সর্বভারতীয় স্বীকৃতি আদায় করেছে এবং অন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তারাও সেগুলি গ্রহণ করেছে।

শেষ কথা : ডা. মৈত্র আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের সুফল রাজ্যবাসী দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

* * *

কন্যাশ্রী যে পুরস্কারগুলি পেয়েছে

* ডব্লিউ এস আই এস পুরস্কার, রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২০১৬
* স্কচ উইনার পুরস্কার ২০১৫
* সি এস আই — নিহিলেন্ট পুরস্কার ২০১৪-১৫
* জাতীয় ই-গভর্নেন্স পুরস্কার ২০১৪-১৫
* মন্থন পুরস্কার ২০১৪
* ডি এফ আই ডি ও ইউনিসেফের স্বীকৃতি ২০১৫

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বিশেষ রচনা

বাঙালীর হিমালয় বিপর্যয়

—গ্যাব্রিয়েল লোপেজ

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্ট অথবা সাগরমাতায় আরোহণ বহুদিন ধরেই মানুষের স্বপ্ন, বিশেষ করে পর্ব্বতারোহীদের। সেই কবে বাংলার রেঁনেসার পথিকৃৎ রাধানাথ শিকদার অঙ্ক কষে এভারেষ্টের উচ্চতা মেপেছিলেন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৯০০২ ফুট। তারপর বরফ পড়ার উপর নির্ভরশীল কম বেশি ৮৮৪৮ মিটার পর্ব্বত শৃঙ্গটি জয় করা হয়ে উঠল পর্ব্বতারোহীদের টার্গেট। ১৯২১ থেকে কত জনে কতভাবে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। অনেকে বেঘোরে মারা গেলেন। জর্জ ম্যালারিদের দুর্ঘটনা তো বিষাদ উপাখ্যান। একসময় সফল হলেন ভারতীয় উদ্বাস্তু শেরপা তেনজিং নোরগে ও নিউজিল্যাণ্ডার মেষপালক মাউন্টেনিয়ার এডমাণ্ড হিলারি (১৯৫৩)। তারপর থেকে পর্ব্বাতারোহীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ল যে হ্যাঁ পারা যায়। অভিযানের সংখ্যা বেড়ে চলল। অনেকে ব্যর্থ হলেন, অনেকে সফল। অনেকগুলি দুর্ঘটনাও ঘটল। ১৯৬৩-তে ভারতীয় শেরপা নাওয়াঙ গোমবু প্রথম পরপর দুবার এভারেষ্ট জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ১৯৬৫ তে প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রীরা সফল হলেন। ২১ জনের দলের নয় জন সদস্য লেফটেনান্ট কমান্ডার এম. এস. কোহলির নেতৃত্বে শৃঙ্গ জয় করলেন। ১৯৮৪ তে বাচেন্দ্রি পাল প্রথম ভারতীয় নারী হিসাবে মাউন্ট এভারেষ্ট শিখর জয় করেন। ১৯৯৩-তে সন্তোষ যাদব প্রথম ভারতীয় নারী হিসাবে দ্বিতীয়বার এভারেষ্টে ওঠেন।

অসীম মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য পর্ব্বতারোহীদের ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে কালিন্দীপাশ অভিযান আরও নির্দিষ্ট ভাবে ১৯৬০-র গাড়োয়াল শৃঙ্গ নন্দাঘুন্টি অভিযানের মধ্য দিয়ে বাঙালীর পর্ব্বতারোহনের বিকাশ, একইসাথে এভারেষ্ট জয়ের হাতেখড়ি। ২০০৪ এ প্রথম বাঙালী হিসাবে ইণ্ডিয়ান নেভির কমাণ্ডার সত্যব্রত দাম এভারেষ্টে ওঠেন। পরের বছরেই ওঠেন ইণ্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন শিপ্রা মজুমদার। অসামরিক বাঙালী হিসাবে প্রথম এভারেষ্টে ওঠেন বসন্ত সিংহরায় ও দেবাশিস বিশ্বাস ২০১০-এ। ২০১১-তে এভারেষ্ট জয় করেন রাজীব ভট্টাচার্য্য আর দীপঙ্কর ঘোষ। ২০১৩-তে ওঠেন পাঁচজন তার মধ্যে ছিলেন দুই তরুণী ছন্দা গায়েন ও টুসি দাস। ২০১৪-তে তিব্বতের দিক থেকে কঠিন পথ নর্থ কোল বেয়ে ওঠেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিপ্লব বৈদ্য। এ বছরও ২০১৬-তে অনেকে শিখর ছুঁলেন, কিন্তু দুর্ঘটনায় প্রাণ কেড়ে নিল চার অভিযাত্রীর, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন এক মহিলা অভিযাত্রী। অন্য এক অভিযানে মারা গেলেন রাজীব ভট্টাচার্য। তার আগে ছন্দা গায়েন।

এবার প্রশ্ন হল কেন এই বিপর্যয়? মাউন্টেনিয়ারিং রক ক্লাইম্বিং বিশেষ করে হিমালয় অভিযান এখন আর স্পোর্টস অ্যাডভেঞ্চারে আটকে নেই, এখন তা বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির দৌলতে কনডাকটেড ট্যুর প্যাকেজ। গাঁটে কড়ি থাকলে এখন আপনি এভারেষ্টের শিখরে উঠে যাবেন। পরিকল্পিত রুটে সাজানো পথে শেরপারা আপনাকে ঠেলে তুলে দেবে আবার কাঁধে করে নীচে নামিয়ে আনবে। তাই নাম করতে এভারেষ্টের পথে ট্রাফিক জ্যাম করে তুলেছেন দেশবিদেশের অর্থবান মানুষরা, এমনকি শারীরিক প্রতিবন্ধীরা। এভারেষ্ট চূঁড়ার মুখে সবচাইতে বিপজ্জনক এই সরু গিরিখাত যার নাম হিলারি স্টেপ (৮৭৭৮ মিটার)-এ জ্যাম হয়ে যাওয়ায় অভিযাত্রীদের ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর ফলে প্রধান তিনটি বিপদ ঘটছে ঃ (১) অভিযাত্রীদের সামিট করে ক্যাম্প ৪ এ (৭,৯২০ মিটার) ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে ফলে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। একজন ক্লাইম্বার দু'টি বড়জোর তিনটির বেশি সিলিণ্ডার নিতে পারেন না। এক একটি সিলিণ্ডারের আয়ু ছ'ঘন্টা। ফলে আক্ষরিক অর্থেই হিলারি স্টেপ ডেথ জোন হয়ে উঠেছে। (২) অতিরিক্ত অপেক্ষা ও দেরি হওয়ার কারণে সৃষ্ট শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ, যা আরোহীকে দুর্বল ও অসতর্ক করে তুলছে, ফলে ঘটছে দুর্ঘটনা বা পড়ে যাওয়া। (৩) নিয়ত পরিবর্তিত অসহনীয় আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হয়ে প্রবল ঝড়, তুষার ঝড়, বরফ চাপা পড়া, পায়ের তলা থেকে বরফ সরে যাওয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনা ডেকে আনছে।

এর উপর শোনা যাচ্ছে কিছু এজেন্সি অক্সিজেনের সিলিণ্ডারে কারচুপি করছেন এবং নিম্নমানের ও বহুব্যবহৃত সরঞ্জাম দিচ্ছেন

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বাঙালীসহ লো বাজেটের অভিযাত্রীদের। ফলে মারাত্মক ফ্রস্ট বাইট, ফুসফুসে জল জমা ও সংক্রমণ, অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে চলেছে। গাইডেরা ঠিক মত সাপোর্ট না দেওয়ার জন্য হচ্ছে অনেক বিপর্যয়।

এমনিতেই বিশ্ব-উষ্ণায়নের কারণে বরফ গলছে ও ঝড় দুর্যোগ বেড়ে গেছে। এর উপর চীন তিব্বতের দিকে বেসক্যাম্প অবধি এক্সপ্রেস হাইওয়ে বানিয়ে ফেলেছে তাতে ফসিল ফুয়েল পোড়ানো যানবাহনের নিত্য আনাগোনা। নেপালের দিকে মার্কিনি, ইউরোপিও, চীনা, জাপানী ধনীরা বিনোদন করতে কাঠমাণ্ডু থেকে লুকপা অবধি প্লেনে চলে আসছেন। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ষ্টার হোটেল, স্পা, বার, রেস্তোরাঁ। এর সাথে বহুমূল্যের প্যাকেজে রক ক্লাইম্বিং, র‍্যাফটিং, সারফিং, গ্লাইডিং প্রভৃতি হরেক অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা। কেউ কেউ খুম্বু হিমবাহ ধরে ঘুরে সেলফি তুলে আসছেন এভারেষ্ট বেসক্যাম্প (৫,৪০০ মিটার) থেকে। আর ন্যূনতম ১৮ লক্ষ টাকা দিলেই ১২টি সংস্থা ও তাদের অধীনে থাকা সাব-সংস্থাগুলি আপনাকে ঘুরিয়ে আনবে এভারেষ্ট। অত্যন্ত দরিদ্র ভূমিকম্প পীড়িত নেপালের এটিই অন্যতম বাণিজ্য। তাই নেই সঠিক নজরদাড়ি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। অনুপযুক্ত সরঞ্জাম ও অনভিজ্ঞ গাইড অনেক সময় বিপদ ডেকে আনছে। আর মনে রাখতে হবে যতই মই পাতা ও দড়ি লাগানো থাক অতখানি উচ্চতায় প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা থেকেই থাকে।

বাঙালী অভিযাত্রীদের এত দুর্ঘটনার ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ আবেগসর্বস্বতা অথচ পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব। এপ্রিল-মে ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এভারেষ্টে ওঠার দুই মরশুমে প্রায় ৪০০০ ট্রেকার এভারেষ্ট বেস ক্যাম্পে। তাদের ২.৫ শতাংশ বাঙালী। পশ্চিমবঙ্গে এখন ১৫০-র মত পর্ব্বতারোহী সংস্থা ও ক্লাব যাদের মধ্যে ৮০টির মত সংস্থা এভারেষ্ট অভিযানের আয়োজন করেন প্রতিবছর। বিশেষজ্ঞরা বলেন এভারেষ্ট সহ আটহাজারি পিক সামিট করার জন্য প্রয়োজন প্রবল মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা, দীর্ঘ প্রস্তুতি, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, এক বা একাধিক সাতহাজারি পিক সামিটের অভিজ্ঞতা, আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানো, নিয়মিত অনুশীলন, প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ, উপযুক্ত সরঞ্জাম ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বহু অভিযাত্রী কেবল প্যাসন সম্বল করে অল্প দিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দু'একটি ছোট পিক সামিট করেই

এভারেষ্টের দিকে ধেয়ে যাচ্ছেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত ছোট ব্যবসায়ী বাঁকুড়ার সুভাষ পাল এবং দুর্গাপুরের পেশায় দর্জি পরেশ নাথের অকালমৃত্যুর তদন্তে এসবই উঠে আসছে। দুজনেই এভারেষ্ট অভিযানের জন্য বাড়ির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিটুকুও প্রায় বেঁচে দিয়ে গেছেন। প্রবল সমস্যায় পড়েছে তাদের পরিবার। এরপর রয়েছে টাকা জোগাড়ের সমস্যা। প্রস্তুতির সময় চলে যায় টাকা জোগাড়ে। এরপর বাঙালীরা যে ন্যূনতম অর্থ জোগাড় করেন নেপালের সংস্থাগুলি তাদের হেলাফেলা করেন, বাজে সরঞ্জাম ও কম অভিজ্ঞ শেরপা দেন, ধনী বিদেশীদের দিকে নজর থাকে। এবার টেনশড চিন্তিত বাঙালী অভিযাত্রী স্পনসরদের কথা ভেবে খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও সামিট করার চেষ্টা করেন, তাড়াহুড়ো করে সামিট করার চেষ্টা করেন কারণ তার মনজগতে খালিহাতে ফেরার জায়গাই নেই। অথচ পাহাড় চড়ার মূল কথা হল ধৈর্য ও তিতিক্ষা। এসবই ডেকে আনে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়। আমরা হারাই ছন্দা, রাজীব, গৌতমদের।

নেপাল সরকারের দিক থেকেও যেমন উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ, পরিকাঠামো ও নজরদাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও গাইডলাইনস্, নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক ঝাড়াই বাছাইয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর তারও আগে চাই খেলাকে খেলা হিসাবে দেখা এবং গিরিরাজ হিমালয়কে উপযুক্ত সম্মান দেখানো।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

নির্বাচিত রচনা

বর্তমান ভারতের ক্ষরা পরিস্থিতি ঃ মেড ইন ইণ্ডিয়া

—অমিতা বাভিস্কার

তখন দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের আলিরাজপুরে গবেষণার কাজ করছি। সময়টি নব্বইয়ের দশকের সূচনা। স্থানীয় আদিবাসীরা 'ছাপানিয়া আকাল'-র কথা বলাবলি করতেন যা, তারা তাদের পিতৃপুরুষ ও পরিবারের নারীদের কাছ থেকে বংশানুক্রমিক শুনে আসছিলেন। এই মহাদুর্ভিক্ষের সময়কাল ১৮৯৯-১৯০০। প্রশান্ত মহাসাগরে 'এল নিনো'র কারণে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে ঐ সময় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে, দূরবর্তী চীনে এবং অনেক দূরবর্তী ব্রাজিলে একইসময়ে মহাদুর্ভিক্ষ ঘটায়। ১৮৭৬ থেকে ১৯০২-র মধ্যে এই 'এল নিনো' তার ভয়াল খেল দেখিয়ে পাঁচ কোটি মূল্যবান জীবন ছিনিয়ে নেয়।

ধ্বংস ও মৃত্যু সবসময়েই বেদনাদায়ক। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে তা ক্ষমাহীন অপরাধ। ক্ষরা পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে, তার চাইতেও বড় মানুষ মারা যাচ্ছে। এটি আটকানো যেত। এরপরও সরকার তার ভুল নীতি আঁকড়ে রয়েছেন (ভুল কৃষিনীতি, তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব', ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন, চিনি কলের জন্য আখ চাষ ও জল উত্তোলন, আইপিএল টুর্নামেন্টের জন্য জল উত্তোলন, অরণ্য-পাহাড়-নদী ধ্বংস ইত্যাদি)। এ বিষয়ে মাইক ডেভিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন এল নিনো সহ প্রাকৃতিক কারণের চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতি। অতীতে প্রাকৃতিক কারণে হওয়া সব কটি আকালই সাধারণ মানুষ তাদের চাষ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় সামলে নিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশের বিশ্ব বাজার ধরতে বলপূর্বক উর্বর ভারতে সস্তা শ্রমে অর্থকরী দ্রব্যের চাষ এবং একচেটিয়া সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানী সমগ্র ভারতীয় কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজকে ভেঙ্গে দিয়ে একের পর এক মন্বন্তর ও অগুন্তি প্রাণহানির জন্ম দিয়েছিল। 'ছাপানিয়া আকালে'র সময় লণ্ডনের শাসকরা যা করেছিলেন এখন দিল্লীর শাসকরা তাই করে চলেছেন।

গত পরপর তিনবছরের ক্ষরায় উপদ্রুত এলাকায় ন্যূনতম পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়নি, কৃষিতে জলসেচ বা শস্য বীমা ইত্যাদি তো অনেক দূরের বিষয়। কৃষিতে ব্যবহৃত বলদ এবং গৃহপালিত পশুদের খাদ্য ও পানীয় জলের কথা কেউ চিন্তা করেননি। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনে যেমন অনেক কৃষক জাতি উৎখাত হয়ে যাযাবর জাতিতে পরিণত হয়েছিল, সেরকম এযুগেও চলছে কাজ ও দু'মুঠো অন্নের জন্য অবিরাম অভিভাসন। গ্রামকে গ্রাম ফাঁকা হয়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলের ঝুপড়িগুলিতে ভিড় বাড়ছে। এন.আর.ই.জি.এস. প্রভৃতি প্রকল্পগুলি সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমে এটি আটকানো যেত। সে সবতো হয়ইনি, বরং অনেকের আগের কয়েকবছরের মজুরি এখনও বাকি রয়ে গেছে। এত কিছুর পরেও শিল্প ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে জলসরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। এরই মধ্যে জল মাফিয়ারা আরও ফুলে ফেঁপে ওঠে। বিশেষ করে বোরওয়েল ড্রিলার ও ট্যাঙ্কার মালিকরা। পি. সাইনাথ তার সাড়া জাগানো 'এভরিবডি লাভস এ গুড ড্রট' গ্রন্থে এর চমৎকার বিবরণ রেখেছেন।

প্রতিটি সঙ্কট নতুন সুযোগের সংস্থান করে। অতীতে জলের সঙ্কটের মোকাবিলায় আমাদের সমাজ জলসংরক্ষণে নানারকম পদ্ধতি ও প্রযুক্তি গ্রহণ করেছিল। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজস্থানের 'বাওলি' ও তামিলনাড়ুর 'এরি' দুই জল পুনস্থাপন চক্র। সেইসব দূরে রেখে আমরা স্বাধীনতার পর থেকে বহু অর্থ ব্যয়ে বড় বড় বাঁধ ও কংক্রিটের জলাধার বানাতে মগ্ন রইলাম (পৃথিবীর মধ্যে যে সব দেশে বেশি বাঁধ আছে তার মধ্যে ভারত তৃতীয়)। ধ্বংস করে দিলাম আমাদের অমৃতদায়িনী নদীগুলিকে ও তাদের ঘিরে থাকা অনন্য বাস্তুতন্ত্রকে। ছাড়পত্র দিয়ে দিলাম জঙ্গলাকীর্ণ গিরিখাতগুলিতে, যা ছিল ঐ নদীগুলির জলসঞ্চারী এলাকা, খনি তৈরি করতে। কোটি কোটি মানুষ যারা সেই কবে থেকে নদী নিয়ে বেঁচে ছিল তারা হলেন উৎখাত। কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় জলসেচ ও কিছুটা বিদ্যুৎ তৈরির বিনিময়ে আমরা ডেকে আনলাম অপূরণীয় ক্ষতি। ঐ বিল্ডার-আমলা চক্রই আবার উঠে পড়ে লেগেছে হাজার হাজার কোটি টাকা ধ্বংস করে নদীগুলি সংযুক্তিকরণের নামে দেশের আর যেটুকু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে শেষ করে দিতে। একি একটি এলবো জয়েন্ট লাগিয়ে দুটি পাইপ জোড়া লাগানোর কাজ? ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে এদের ন্যূনতম বোধই নেই।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও সরকারের উচিত অবিলম্বে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া।

১) বর্ষণযুক্ত এলাকাগুলিতে স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে নিয়ন্ত্রিতভাবে সারা বছর জলের ব্যবহার করা। এরজন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি এবং রাজ্য সরকার ও এই বিষয়ে ভাল কাজ করেছেন এমন এনজিও গুলির সাথে সমন্বয় করা দরকার।

২) সারা দেশের জন্য জল ব্যবহার কর্মসূচী থাকা দরকার এবং জলের ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা দরকার। যারা আইনভঙ্গকারী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিগ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩) জঙ্গল, নদীর অববাহিকা, হ্রদ, জলাশয় ও জলাভূমি, পাহাড়ের জল সঞ্চারী অঞ্চলগুলিকে সংরক্ষণ করা দরকার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষরাকে প্রাকৃতিক কারণ এবং দুর্ভিক্ষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতা হিসাবে দেখা হত। আজকের দিনে, এত ফসিল ফুয়েল পুড়িয়ে আমাদের গাড়ি ও প্লেন যাত্রা, বিদ্যুৎ তৈরি; পরিবেশ দূষণ করে হিমবাহ গলিয়ে নদীগুলিকে শুকিয়ে দেওয়া কিংবা বোরওয়েল খুঁড়ে জল ডাকাতি, আর এসবের ফলশ্রুতিতে জলের সঙ্কট, ক্ষরা ও দুর্ভিক্ষ কিছু মানুষের সৃষ্টি। এদের জন্য আমাদের ধরিত্রী ও মানবজাতি প্রবল বিপদের সম্মুখীন।

[কৃতজ্ঞতা ঃ 'ইণ্ডিয়া টুডে']

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

প্রধান রচনা

ডেঙ্গু মোকাবিলা — *গৌতম মৃধা*

ডেঙ্গু মহামারী পশ্চিমবঙ্গে সাঙঘাতিক আকার নিয়েছে। সরকারি হিসাবেই রোগীর সংখ্যা ৭০০০-এর বেশী ও মৃত্যু প্রায় ৪০। দিল্লীতে ডেঙ্গুর সাথে ম্যালেরিয়া ও চিকুনগুনিয়া মহামারীর আকার নিয়েছে। ডেঙ্গু, জিকা, জাপানী এনকেফেলাইটিস ও চিকুনগুনিয়ার কোন ওষুধ নেই। একমাত্র উপায় প্রতিরোধ।

ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে অবশ্য পালনীয়

ঘুমোনোর সময় (দিবানিদ্রার সময়েও) মশারির মধ্যে শোওয়া। কীটনাশক লাগানো মশারি হলে ভাল হয়। মশারি ভাল করে গদির মধ্যে গুজতে হবে। শিশু, প্রসূতি ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

ঘরের বাইরে, স্কুল, কলেজে, অফিসে, কর্মক্ষেত্রে ফুলহাতা শার্ট, ফুলপ্যান্ট, মোজা ও ঢাকা জুতো (চপ্পল, কাবলি নয়) পরুন। মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্যান্ট-জামা যেখানে গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে সালোয়ার কামিজ পরা যেতে পারে। ঘরের মধ্যেও ঢাকা সুতির পোশাক পরতে হবে। এক-নাগাড়ে টেবিল-চেয়ারে বসে পড়লে বা কম্পিউটারে কাজ করলে পায়জামা-কামিজের সাথে সুতির মোটা মোজা পরুন।

থাকার ঘর হতে হবে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বাতাস চলাচলযুক্ত। দেওয়ালের রঙ সাদা বা হাল্কা হলে ভাল। ঘরে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, আবর্জনা ইত্যাদি রাখবেন না। ঘরের কোণে, আলনা, পর্দা, খাটের তলা, আলমারির পিছন প্রভৃতি স্থান যেখানে অন্ধকারে বা আড়ালে ঈডিশ মশা লুকিয়ে থাকে নিয়মিত ঝাড়বেন। সূর্য উদয় ও সূর্যাস্তের সময় কিছুক্ষণ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রাখতে পারেন। সন্ধের মুখে নিমপাতা পোড়ানো, বিভিন্ন মশা মারার তেল, মেশিন ইত্যাদি মাঝে মাঝে চালাতে পারেন। মশা মারার রাসায়নিক বদ্ধ ঘরে একটানা চালাবেন না, তাহলে শরীরের অন্য ক্ষতি হতে পারে।

ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় জল জমা রাখতে হলে পাত্রের মুখ ঢাকা দিয়ে রাখুন এবং নিয়মিত ব্যবহার করুন। ট্যাঙ্ক, চৌবাচ্চা, ড্রাম কিংবা এসি, ফ্রিজ, টব ফুলদানির জল সপ্তাহে অন্তত একদিন পাল্টে ফেলুন। মাঝে মাঝে সেগুলোর ভেতরের দেওয়াল শুকিয়ে ভাল করে ঘষে পরিষ্কার করুন। এছাড়া বাড়ির মধ্যে ও বাইরে কোথাও জল জমতে দেবেন না।

প্রতিদিনের বর্জ্য পদার্থ পুরসভার সহায়তায় সরিয়ে ফেলুন। বাড়ির আশেপাশে, ড্রেনে, পিটে, বাগানে, ব্যাক-ইয়ার্ডে ময়লা ও জল জমতে দেবেন না। ডাব, নারকেলের মালা, মিষ্টির ভাড়, প্লাষ্টিক, টায়ার, গাছের কোটর ইত্যাদিতে যেন জল না জমে। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। গৃহপালিত পশুর ঘর বা পোল্ট্রি থাকলে থাকার জায়গা থেকে দূরে রাখতে হবে।

স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে, নেশা করা যাবে না, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। এভাবে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন প্রতি মঙ্গলবার, সেটা সম্ভব না হলেও প্রতি শনিবার বা রবিবার এলাকার তরুণরা মিলে এলাকাটিকে পরিষ্কার করার ও পরিষ্কার রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। বেকার সমস্যা রয়েছে ঠিকই তথাপি যত্রতত্র বাজার, খাবার দোকান ইত্যাদি বসা ঠিক নয়। নির্মীয়মাণ বাড়িগুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এলাকার পার্ক ও জলাভূমিগুলিকে ঠিকমত সংস্কার করতে ও পরিষ্কার রাখতে হবে। জলাভূমিগুলিতে গাপ্পি মাছ ছাড়তে হবে এবং মাঝে মাঝে জল নাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে (সাঁতার, নৌকা চালানো, রোটেটর)।

সরকার, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতকে সহযোগিতা করতে হবে।

জ্বর হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্লিনিক অথবা হাসপাতালে দেখাতে হবে, প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করতে হবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে ঠিকমত চিকিৎসা করতে হবে।

মশক বাহিত রোগ প্রতিরোধে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবশ্য করণীয়

(স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশনামা)

- প্রতি সপ্তাহে ছাদের ট্যাঙ্ক, ভূগর্ভস্থ জলাধার, এয়ারকুলার, ফুল বা গাছের টব, পশুপাখিদের খাবার দেবার জায়গা প্রভৃতি সম্ভাব্য মশার শূককীট জন্মানোর জায়গাগুলি পরীক্ষা করতে হবে।
- সমস্ত জলাধারকে মশানিরোধী ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- সমস্ত জল রাখার পাত্র, কুলার, টব প্রভৃতিকে সপ্তাহে একবার খালি করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- গাটার, ছাদ, ড্রেনের মুখ প্রভৃতি নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
- পুকুর, সীসপুল, ফোয়ারা ইত্যাদি থাকলে গাম্বুসিয়া/ গাপ্পি/ তেলাপিয়া প্রজাতির মশার শূককীট ভক্ষণকারী মাছ ছাড়তে হবে।
- এলাকায় ম্যালাথিয়ন/সাইফেনথ্রিন ধোঁয়া (ফগিং) দিতে হবে।
- ঘরের মধ্যে ২ শতাংশ পাইরেথ্রিয়াম স্প্রে করতে হবে।
- রোগী ও অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রোটেকশনগুলি নিতে হবে।

ওয়ার্ড, হষ্টেল ও কর্মচারীদের বাসস্থানে মশারি ব্যবহার করতে হবে।

- দরজা-জানালায় সঠিকভাবে মশা নিরোধক নেট লাগাতে হবে।
- রোগী, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে হবে।
- পুরসভার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং নিয়মিত বর্জ্য পদার্থ সাফ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

‘ডেঙ্গি সে আজাদি’র ডাক

রাজ্যে ডেঙ্গির দাপট সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি চুপচাপ। এই পরিস্থিতিতে ১৫ আগস্ট ‘ডেঙ্গি সে আজাদি’র ডাক দিয়ে পথে নেমেছে সদ্য-গঠিত যুব মঞ্চ ইয়ং বেঙ্গল। মূলত বামপন্থী ছাত্র-যুবকদের এই মঞ্চের তরফে প্রসেনজিৎ বসু জানান, তাঁরা রাজ্যে নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানের দাবির সঙ্গে সঙ্গে জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আন্দোলন করবেন। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের ‘ব্যর্থতা’র প্রতিবাদে ১৫ তারিখে শ্রীরামপুর ও কলকাতা পুরসভার সামনে সাফাই অভিযান হবে। ২ সেপ্টেম্বর সারা ভারত শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে এবং বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে সাইকেল মিছিল করবে ইয়ং বেঙ্গল। ছাত্র-যুবদের নিয়েই গড়া হয়েছে ওই মঞ্চ। নতুন সংগঠনকে স্বাগত জানিয়ে কনভেনশনে বক্তৃতা দেন সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মীরাতুন নাহার, মৌসুমী কয়াল প্রমুখ।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কীভাবে হয় ডেঙ্গু?

— স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

● ডেঙ্গু ভাইরাসবাহী মশা কামড়ালে

সাধারণ ডেঙ্গুর উপসর্গ ঃ

● অত্যধিক জ্বর। কখনও কম, কখনও বেশি। শরীরে গাঁটে গাঁটে ব্যথা, অবসন্নতা। প্রস্রাবে জ্বালাভাব, কম হওয়া। খাবারে অনীহা। ভাতে অরুচি

হেমারেজিক ডেঙ্গুর উপসর্গ ঃ

● হাতের তালু, গায়ে লাল ছোপ, চোখ জ্বালা করা। চোখ লালচে হয়ে যাওয়া ● রক্তক্ষরণ

শনাক্তকরণ ঃ

● উপসর্গ দেখা দিলে রক্ত পরীক্ষাই শেষ কথা ● প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে এন.এস.১ পরীক্ষায় ডেঙ্গুর অ্যান্টিজেন দেখে স্ক্রিনিং এবং পাঁচ দিনের পর এলাইজা পরীক্ষায় ডেঙ্গুর অ্যান্টিবডি দেখে কনফার্মড করা হয়

প্রাথমিক শুশ্রূষা ঃ

● প্রাথমিক পর্যায়ে ভরা পেটে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট
● প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। সঙ্গে তাজা ফল
● দিনে রাতে মশারির মধ্যে থাকা

চিকিৎসা ঃ

● প্যারাসিটামল চলতে পারে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই ভালো
● এমন ওষুধ চলবে না, যা রক্তে অনুচক্রিকা কমিয়ে দিতে পারে
● সাধারণ ডেঙ্গু এমনিতে সেরে যায়। রক্তক্ষরণ, শক ইত্যাদি হলে হাসপাতালে ভর্তি রেখে ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট, লাইফ সাপোর্ট ইত্যাদি সহযোগী চিকিৎসা চালাতে হয়

প্রতিরোধ ঃ

● এডিস মশার লার্ভাস্তরে স্প্রে করা
● বাড়ির চারধারে জল জমতে না দেওয়া
● ফুলদানি, চৌবাচ্চার জল নিয়মিত পাল্টানো ● বাড়ির আশপাশের নোংরা জিনিস পরিষ্কার করা
● রাতে মশারি টাঙিয়ে শোয়া ● দিনে মশা তাড়ানোর ম্যাট, কয়েল, লিকুইড ব্যবহার
● গা ঢাকা পোশাক পরা

মশা নিয়ে কথা ঃ

● এডিস মশা ডেঙ্গুর ভাইরাস বহন করে
● ডেঙ্গুর মশা সাধারণত দিনে কামড়ায়
● চলতে ফিরতে থাকা মানুষকে আক্রমণ করে ● সাধারণত কামড়ায় হাঁটুর নিচে
● একনাগাড়ে কামড়ায় না, হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে
● এডিস মশার উপাঙ্গে সাদা ছোপ থাকে
● শূককীট বা লার্ভা অবস্থায় মারা সহজ, পূর্ণ বয়স্ক মশাকে মারা কঠিন

নিজেকে তথা নিজের পরিবারকে রক্ষা করুন ডেঙ্গুর হাত থেকে

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

মশক বাহিনী ও জিকা কাহিনী

—গৌতম মৃধা

⊙ মশার রকমফের—

● কিউলেক্স মশা ঃ জাপানী এনকেফেলাইটিস, ওয়েষ্টনাইল ফিভার, লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস প্রভৃতি ভাইরাল অথবা নেমাটোডস্ জনিত রোগের কারণ।

● অ্যানোফিলিস মশা ঃ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি প্রোটোজোয়াল রোগের কারণ।

● ঈডিশ মশা ঃ ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, জিকা প্রভৃতি ভাইরাল রোগের কারণ।

⊙ প্রতিবছর—

● ৭০ কোটি সংক্রমণ ও ১০ লক্ষ মৃত্যু ঘটে।

● ৪০ কোটি মানুষ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হন।

● দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই ২০ লক্ষ মানুষ চিকুনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত হন।

● ৫০ হাজার মানুষ ওয়েষ্ট নাইল রোগে সংক্রামিত হন যাদের মধ্যে ১%-র মস্তিষ্কের গুরুতর ক্ষতি হয়।

● ৩০ হাজার মানুষের, মূলত আফ্রিকায়, পীতজ্বরে (ইয়েলো ফিভার) মৃত্যু হয়।

● ৭০ হাজারের মত মানুষ জাপানী এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হন।

● ২০১৫-তে ২০ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।

● ২০১৬-র মধ্যে ৪০ লক্ষ মানুষের জিকা রোগ হওয়ার কথা।

⊙ জিকা রোগের উৎপত্তি—

● ১৯৪৭ এ আফ্রিকার উগাণ্ডার জিকা জঙ্গলে রেসাস বানরের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়।

● ১৯৫২ তে মানুষের মধ্যে প্রথম জিকা রোগ পাওয়া যায়।

● বিগত কয়েকবছরে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় শুরু হয়ে ২০১৫-র নভেম্বর থেকে মহামারী রূপে ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ডমিনিকান রিপাবলিক, এল সালভাদোর, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, পানামা, প্যারাগুয়ে, সুরিনাম, ভেনেজুয়েলা, পুয়ের্তোরিকো প্রভৃতি দেশে ১৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

⊙ জিকা রোগের লক্ষণসমূহ—

● জ্বর, র‍্যাশ, গাঁটে ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, মাংসপেশীতে ব্যথা, দুর্বলতা, বমি, ডায়রিয়া। সাধারণত প্রতি পাঁচজন আক্রান্তর একজন অসুস্থ হন।

● মাইক্রোসেফালি অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্কের ক্ষতি হওয়া এবং মস্তিষ্কের ও করোটির আয়তন ছোট হয়ে যাওয়া। জড়ভরত সন্তান প্রসব করা।

⊙ জিকা রোগ কেন মারাত্মক—

● প্রসূতি অবস্থায় জিকায় আক্রান্ত হলে গর্ভস্থ শিশুর মাইক্রোসেফালি হওয়ার সম্ভাবনা।

⊙ জিকা রোগের কারণ—

● জিকা ভাইরাস যুক্ত ঈডিশ মশার কামড়। এটিই প্রধান রুট।

● যৌন সম্পর্ক ঃ জিকা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌনমিলন। জিকা ভাইরাস রক্তের চাইতে বীর্যে বেশিদিন থাকে এবং বীর্যে ভাইরাস লোড রক্ত ও প্রস্রাবের চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশি। পায়ুসঙ্গমে এবং ওরাল সেক্সেও জিকা রোগ ছড়াতে পারে।

● অযৌন রুট ঃ মা থেকে শিশু, অল্প কিছু ক্ষেত্রে প্রস্রাব, লালা, মায়ের দুধ ও দুর্ঘটনাযুক্ত নিডল ফুটে যাওয়ার কারণে হয়েছে।

⊙ জিকার চিকিৎসা—

● চিকিৎসা নেই। প্রতিরোধই ভরসা। পাশাপাশি শরীরের সাধারণ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ানো— সুশৃঙ্খল জীবন, পুষ্টিকর আহার, পর্যাপ্ত ঘুম, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম, নেশা না করা ইত্যাদি।

⊙ জিকার প্রতিরোধ—

● লার্ভাদমন ঃ জল জমতে না দেওয়া, জমা জল পাল্টে দেওয়া, লার্ভিসাইড প্রয়োগ।

● প্রাপ্ত বয়স্ক মশা নিধন ঃ ঝোপঝাড়, ড্রেন, ঘরের আনাচ কানাচ পরিষ্কার, মশা নিধনকারী স্প্রে, ধোঁয়া ইত্যাদির ব্যবহার।

● ব্যক্তি প্রতিরোধ ঃ মশারি, জানালায় নেট, ঢাকা পোশাক, মোজা-জুতো পড়া ইত্যাদি।

● নিরাপদ যৌনতা ঃ পুরুষ ও নারী দুজন বা দুজনের একজন জিকা অধ্যুষিত এলাকা থেকে এলে দু'মাস নিরাপদ যৌনতা (কনডোম ব্যবহার, ওরাল সেক্স নয় ইত্যাদি) অনুশীলন। পুরুষসঙ্গীর জিকার উপসর্গ দেখা দিলে ছয় মাস নিরাপদ যৌনতা। সমকামী ও লেসবিয়ান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন বা উভয়সঙ্গী যদি জিকা অধ্যুষিত এলাকার বা এলাকা থেকে আগত হন 'ব্যারিয়ার মেথড' (কনডোম, ফিমেল কনডোম, ডেনটাল ড্যাম প্রভৃতি) ব্যবহার।

● জিকা সিঙ্গাপুর অবধি পৌঁছে গেছে। সেখানে ২৯০ জন আক্রান্তের মধ্যে ১৩জন ভারতীয় ও ২০ জন বাংলাদেশী।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কিউবা এবং একটি নিঃশব্দ কৃষি বিপ্লব

—রূপক কুমার পাল

কিউবা মানেই ফিদেল কাস্ত্রো.... কমিউনিস্ট আন্দোলন.... সমাজতন্ত্র। কিউবা মানেই মার্কিন ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক অন্য ভাবনার রাজনৈতিক দর্শন। কিউবা মানেই রাশিয়ার সঙ্গী। আর তা ছাড়া? আছে আখের খেত....তামাক চাষ....হাভানা চুরুট....ভুট্টা ফলন। আছে খোলামেলা সমুদ্রতট....কোরালরিফের হাতছানি....বিদেশী পর্যটক। আছে হেমিংওয়ের বেছে নেওয়া বার্ধক্যের জীবন, সঙ্গে 'দ্য ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী'। এসব তো নখদর্পণে। কিন্তু ওই সমাজতন্ত্রের ছাউনির তলায় আরো যে কত উদ্ভাবনী বিকল্পের নজির রয়েছে তা এই দ্বীপরাষ্ট্রটির অন্দরমহলে প্রবেশ না করলে বোঝা মুশকিল।

নর্থব্লকের কৃষি টেকনোক্র্যাটরা যখন নিজেদের অভিজ্ঞতাকে বালিশ চাপা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের উন্নতির লক্ষ্যে প্রেসক্রিপশান লিখছেন.... আরো বেশী বেশী করে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ল্যাবরেটরির বীজ, সেচের জন্য শক্তিশালী পাম্পসেট, বড় বড় নদী বাঁধ.... ঠিক তখনই মাত্র একদশকের প্রচেষ্টায় প্রকৃতি নির্ভর বিকল্প চাষ পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগে জাতীয় অর্থনীতির খোলনলচে পাল্টে ফেলছে কিউবা। আশির দশকের শেষভাগেও সে দেশের কৃষি ছিল পুরোপুরি পেট্রোপ্রযুক্তি নির্ভর। আখ, তামাক আর ভুট্টার মতো হাতে গোনা কয়েকটি বাণিজ্যিক ফসলের চাষ ছিল একমাত্র কৃষি উৎপাদন। জাতীয় আয়ের সিংহভাগই এসেছে ওই গুটিকয়েক ফসলের রপ্তানী থেকে। অন্যদিকে অন্যান্য নাগরিক প্রয়োজন সবটাই ছিল আমদানী নির্ভর। কৃষি প্রযুক্তির প্রায় পুরোটাই যোগান দিত সোভিয়েত গোষ্ঠী। অথচ নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে এসে ওরা আমূল বদলে ফেলেছে কৃষি কাঠামো। বিষ নির্ভর রাসায়নিকের পরিবর্তে ফিরে এল প্রকৃতি নির্ভরতা। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনামাফিক ফসল নির্বাচন, স্থানীয় উপাদান দিয়ে জৈবসার, জৈব উপকরণ ব্যবহারে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ। ফলে এক নিমেষে দ্রুত বেড়ে গেল ফসলবৈচিত্র্য। খাদ্যশস্য থেকে ঔষোধি সবক্ষেত্রেই কিউবা এখন স্বনির্ভর। শুধু তাই নয়, ফসলে ফিরে এসেছে ঐতিহ্যগত খাদ্যগুণ। ক্যালোরি মেপে শুধু পুষ্টিগুণ মূল্যায়ণের পরিবর্তে নতুন করে জায়গা করে নিয়েছে মরসুমি শাক-সবজি, ফলমূল, দানা শস্য নির্ভর ঋতুভিত্তিক পরম্পরাগত খাদ্য সংস্কৃতি। ফলে স্বাস্থ্য ফিরেছে আপনা-আপনিই। সব মিলিয়ে এক নিঃশব্দ বিপ্লব.... অর্গানিক রেভ্যুলুশান।

আমরা প্রতিদিন যে ভয়াবহ তেতো অভিজ্ঞতা নিয়ে টিকে রয়েছি.... অর্থাৎ খাদ্যে কীটনাশক আর রাসায়নিক বিষ, পানীয়তে আর্সেনিক ফ্লুরাইডের মিশ্রণ, হারিয়ে যাওয়া মাটির উৎপাদন ক্ষমতা, শুকিয়ে যাওয়া নদী-জলাশয়, সুষম পুষ্টির অভাব মোকাবিলায় চিকিৎসা নির্ভর স্বাস্থ্য— কিউবাবাসীও এসবের মুখোমুখি হয়েছে। তবে এসব সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেই কাস্ত্রো প্রশাসনের এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। সঙ্গে ছিল চেতনা সম্পন্ন নাগরিক সমাজের একাংশ।

ক্যারিবিয়ান সাগরে জেগে থাকা কিউবার জাতীয় সীমানার মধ্যে রয়েছে দুটি বড় আকারের দ্বীপ, সঙ্গে প্রায় ১৬০০'র মতো সমুদ্রঘেরা ছোট ছোট টুকরো ভূ-খন্ড। সামগ্রিক আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার বর্গ কিমি। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে সামান্য বড়। এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই রয়েছে ৪৮টি সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চল। জলবায়ু উদ্ভিজ্জসংস্থান, ভূ-চিত্র প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্যের নিরিখে প্রতিটি অঞ্চল একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। বৃষ্টিঅরণ্য থেকে মরুপ্রায় ভূমি.... সে এক দীর্ঘ প্রসর যা প্রাণবৈচিত্র্যে ঠাসা।

প্রাকৃতিক বিভাজন এবং বৈচিত্র্যময়তার মধ্যে ঐক্যের নজিরও চোখে পড়ে। দেশের ৮০ শতাংশ সমতল। একঘেয়ে ঋতু। শীতের আমেজ বোঝা দায়। ঝলসানো গ্রীষ্ম নেই। ২৫ ডিগ্রির আশপাশেই পারদের আনাগোনা। তবে আছে বর্ষার বিলাসিতা। বছরের মোট বৃষ্টি ১৩০০ মিমি। ৮০ শতাংশই ঝরে পড়ে মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে।

জলবায়ু, ভূ-চিত্র, উদ্ভিদ সমারোহ, মাটির গুণাগুণ এসবের মিশেলে গড়ে উঠেছে কৃষি অনুকূল বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক কাঠামো। ৬০ শতাংশ জমি চাষযোগ্য হলেও বাস্তবে আবাদ হয় ৪৫ শতাংশ। বাকিটা জঙ্গল, পাহাড়, নদী-বাঁধের পেছনে থাকা বড় বড় জলাধার, বসতি, রেল আর সড়ক পথে মোড়া। ২০০১'র সুমারি অনুযায়ী প্রতি বর্গকিমিতে মেরে কেটে ১০০ জন। জনমানসের ৭৪ শতাংশই শহরবাসী। হাতে গোনা আট-দশটা শহরে কেন্দ্রীভূত।

১৪৯২ সালে কলম্বাস কিউবার মাটিতে প্রথম পা রেখে বিস্ময়ভরে বলেছিলেন.... এত অপূর্ব সুন্দর দেশ এর আগে কখনও মানুষের চোখে পড়েনি। স্পেনীয় উপনিবেশ তখনও গড়ে ওঠেনি। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে আরাওয়াক-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ওদের মধ্যে 'কোনুকো' নামে প্রকৃতি নির্ভর জটিল এক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। আরো বেশি বেশি করে ফসল উৎপাদনের জন্য আদিবাসীরা 'ক্যামেলোন' নামে এক বিশেষ চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। স্থানীয় এইসব কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল ফসল বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা। উত্তাপ, আর্দ্রতা, জমির উচ্চতা, মাটির গুণমান, আগাছার ধরন, পোকামাকড়ের জীবনচক্র এসবের চরিত্র অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেই বৈচিত্র্যময় ফসলের ক্রমবিন্যাস। এক কথায় মানুষ-প্রকৃতির সহবাসের এক সুস্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায় অভিজ্ঞতা নির্ভর পরম্পরাগত সেই ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায়। প্রচলিত বহুফসলীর আবাদের কারণে পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্য পুষ্টির সংস্থান ছিল সকলের হাতের নাগালে। সেই মতো গড়ে ওঠে স্বাস্থ্যবোধ— এক সুসংহত খাদ্য-পুষ্টি-স্বাস্থ্য সংস্কৃতি।

পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশের সদর দপ্তর হয়ে ওঠে এই দ্বীপরাষ্ট্রটি। বার বার ঔপনিবেশিকদের সংগঠিত গণহত্যার কারণে ক্রমেই নির্মূল হতে থাকে আরাওয়াক ইন্ডিয়ানরা। গুঁড়িয়ে যায় কয়েক হাজার বছরের সেই আঞ্চলিক আবাদ কৌশল। ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে একফসলী বাণিজ্যিক চাষ— কোথাও আখ,

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

তো কোথাও বা তামাক। লক্ষ্য শুধু ইউরোপে রপ্তানি। এই ঔপনিবেশিক চাষের কৃৎকৌশল স্থানীয় বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তার ওপর আদিবাসী হত্যার দরুন স্থানীয় শ্রমের ঘাটতি মেটাতে আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের আমদানি করা হতো। আর সে কারণে ওই ঔপনিবেশিক চাষ পদ্ধতির সঙ্গে মিশে যায় আফ্রিকার আবাদ কৌশলও। সবমিলিয়ে প্রকৃতির ওপর নেমে আসে এক সংঘটিত আক্রমণ। সহবাস বদলে যায় মানুষ-প্রকৃতির বৈরিতার সম্পর্কে।

এভাবেই একদিন এসে গেল ১৮৯৮। স্পেনীয় উপনিবেশের পতন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে কিউবা। স্বাভাবিকভাবেই ওই বৃহৎ শক্তিধরের সাথে গড়ে উঠলো বাণিজ্যিক সখ্যতা। এক নতুন পর্ব। দীর্ঘ সময় ধরে আমেরিকার কাছ থেকে 'ফেভার্ড ট্রেড নেশান'র মর্যাদা পেয়ে এসেছে এই ছোট দেশটি। কিন্তু কি এমন রসায়ন তৈরী হলো যে বেমানান দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে এত নিবিড় মিত্রতা। সময়ের হাত ধরে পেঁয়াজের খোসার মতো বাইরের আবরণ সরে যেতেই বেরিয়ে এলো রহস্যময় উপকথা। একরের পর একর জঙ্গল চেঁছে প্রসারিত হয়েছে আখের ক্ষেত। প্রযুক্তি সেই রাসায়নিক সার, ট্রাক্টর। সবটাই যোগান দিত আমেরিকা। বিনিময়ে চুক্তিভিত্তিক খরিদ করত আখ। শুধু কি তাই? খাদ্যশস্য থেকে জীবনদায়ী ওষুধ কিউবাবাসীর অপরিহার্য্য ভোগ্য সামগ্রীর সিংহভাগই আসতো মার্কিন মুলুক থেকে। সব মিলিয়ে আমেরিকার কাছে এই দ্বীপরাষ্ট্রটি হয়ে ওঠে এক নিশ্চিত স্থিতিশীল বাজার। অপরদিকে মার্কিন চিনিকলের বৃহত্তম কাঁচামালের উৎস এই ছোট্ট বাণিজ্যিক সঙ্গী।

দ্বিপাক্ষিক আর্থিক বিকাশের নিরিখে পারস্পরিক এই বাণিজ্যিক নির্ভরতার মধ্যে খারাপ তো কিছু নেই? এমনটাইতো কাম্য। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় বাণিজ্যিক নির্ভরতা আসলে মুখোশ। প্রকৃত মুখটি হল— 'কর্তৃত্ব', 'আর্থিক শোষণ'। ভোগ্যপণ্য কিম্বা কৃষিমূলধনী কিউবার বাজারে এ সবের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় দর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় মার্কিন বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর হাতে। দিন কে দিন কৃষি উপকরণের বাজারদর বাড়তে থাকে। তার ওপর আবার মিল মালিকরা চুক্তিভিত্তিক আখের স্বল্প দাম বেঁধে দিত। চাষাবাদ হয়ে উঠলো ব্যয়বহুল। অলাভদায়ক। স্থানীয় কৃষক মার্কিন মিল মালিক কিম্বা বহুজাতিক গোষ্ঠীর কাছে জমি বেঁচে ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালের কৃষি-সুমারিতে বলা হয়, কিউবার মোট কৃষি জমির ৪৭ শতাংশের মালিকানাসত্ত্ব মাত্র ১.৫ শতাংশ মালিকের দখলে। এবং তাতে আরও উল্লেখ আছে যে ও দেশের ৩০ শতাংশ চাষযোগ্য জমির নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র পাঁচটি মার্কিন চিনি কোম্পানী। একসময় কিউবার ৭৫ শতাংশ চাষের জমি দখল করে মার্কিন নাগরিক আর বৃহৎ কর্পোরেট।

ওরা অতি সামান্য মজুরির বিনিময়ে স্থানীয় ক্ষেত মজুরদের দিয়ে আখ উৎপাদন করিয়ে নিত। বছরে মাত্র চারমাস ক্ষেত মজুর জমিতে কাজ পেতেন। ফি-বছর হাইতি বা জামাইকা থেকে যাযাবর ভাড়াটে কৃষি শ্রমিক আমদানি হতো কিউবায়। এমনটা সম্ভব ছিল কেননা ১৮৮৬ সালে ওদেশে বিধিবদ্ধ ভাবে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও বাস্তবে কার্যত এই ব্যবস্থা টিকে ছিল পরবর্তী আরো কয়েক দশক। লাগামছাড়া আর্থিক শোষণ আর বঞ্চনার কারণে অনুগ্রহপুষ্ট কিউবার জাতীয় অর্থনীতি

ক্রমাগত শীর্ণকায় হতে থাকে। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ক্ষোভ। এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে পুঁজি করেই সংগঠিত হয় সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব।

১৯৫৯ সাল। ক্ষমতায় তখন বাতিস্তা। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চলতি শাসককে উৎখাত করে নতুন সরকার গড়লেন ফিদেল কাস্ত্রো। শুরু হলো আরো এক পর্ব। ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যে তৈরী হলো কৃষি সংস্কারের উদ্দেশ্যে নতুন আইন— 'এগ্রারিয়ান রিফর্ম ল' (মে অব্ ১৯৫৯)। আইন মোতাবেক জমির উর্দ্ধসীমা নির্দিষ্ট ছিল। বাড়তি জমি বাজেয়াপ্ত করে পুনর্বন্টন করা হয় ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি আর ঝুপড়িবাসীদের মধ্যে। ১৯৬৩ সালে শুরু হলো দ্বিতীয় দফার ভূমিসংস্কার। মাত্র বছর তিন-চারেকের মধ্যে দু'লক্ষেরও বেশী ছোট চাষিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। আখবাগিচা এবং গোচারণ ক্ষেত্রের ৭০ শতাংশের মালিকানাসত্ত্ব ফিরে আসে রাষ্ট্রের দখলে।

গ্রামের পর গ্রাম আখের ক্ষেতে যে মুনাফামঞ্চ নির্মিত হয়েছিল গত পাঁচ-ছয় দশক ধরে এক ধাক্কায় সেটা চলে গেল। স্বভাবতই লাল সংকেত দেখতে পেল পুঁজিবাদী বাণিজ্যিক সঙ্গী। প্রতিবছর কিউবার কাছ থেকে সরকারিভাবে আখ ক্রয়ের যে কোটা তৈরী হয়েছিল সেটা অস্বীকার করে ভবিষ্যতের সমস্তরকম বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল করলো আমেরিকা। প্রতিহিংসা স্বরূপ ওই ছোট্ট দেশটির ঔদ্ধত্যের উচিত শিক্ষা দিতে জারি করা হয় বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা— পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই হলো দীর্ঘতম ট্রেড এম্বারগো।

কাস্ত্রোর হাতে বাঁচার জন্য তখন একটাই পথ— নতুন কোনও বাণিজ্যিক সঙ্গীর খোঁজ। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কোনও বন্ধু। হাত বাড়াল সোভিয়েত রাশিয়া। শুরু হলো আরো এক নতুন অধ্যায়। এবার আর এক বছর নয়, চুক্তি হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য। চুক্তিভিত্তিক স্বেচ্ছায় চড়া দরে আখ খরিদ করছে সোভিয়েত, আর বিনিময়ে তারা প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিচ্ছে কিউবাকে। ৮০'র দশকে কিউবাতে প্রতি হাজার একরে ট্রাক্টর সংখ্যা ছিল ২১, যা লাটিন আমেরিকার সর্বোচ্চ অনুপাত। ওই দশকের শেষ বছরে কিউবা আমদানি করে ১৩ লক্ষ টন পোকামারা বিষ, প্রায় সমস্ত রকম চাষের যন্ত্রপাতি, স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি। বেশী পরিমাণে দুধ উৎপাদনের জন্য আমদানি করা হল ভিনদেশী গাই। দেশবাসীর মোট ভোগ্য প্রোটিন এবং ফ্যাটের ৮০ শতাংশই আমদানি করা। আয়ের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশই আসছে আখ রপ্তানি থেকে। মাত্র দুই দশকের মধ্যে গা-ঝারা দিয়ে ওঠে জাতীয় অর্থনীতি। বেড়ে গেল জীবনযাত্রার মান। ১৯৮৯ সালে ওভারসিজ্ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মাপা 'ফিজিক্যাল কোয়ালিটি অব্ লাইফ ইনডেক্স'-র তালিকায় কিউবা ১১ নম্বরে, যেখানে ১৫ নম্বরে রয়েছে

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

তার পূর্বতন বাণিজ্যিক সঙ্গী। লাতিন আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র দুই শতাংশ কিউবাবাসী হলেও ১১ শতাংশ বিজ্ঞানীর বসত ছিল ওই ছোট্ট দেশটিতে।

আর্থিক বৃদ্ধিতে গতি এলো বটে কিন্তু মৌলিক কতকগুলি ক্ষেত্রে কাঠামোগত কোনও পরিবর্তন ঘটলো না। এক, নাগরিক ভোগ্যসামগ্রীর প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে থেকে গেল সেই আমদানি নির্ভরতা। দুই, জাতীয় রোজগার বলতে নির্দিষ্ট কয়েকটি বন্ধুদেশে মূলতঃ আখ রপ্তানি। তিন, কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী কারখানা ভিত্তিক একফসল চাষের সেই

বাজার নির্ভর কাঠামো। শুধু রয়ে গেল তা নয়, বরং সেটা আরো মজবুত হলো। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এসব তো আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না। বরং স্তিমিত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলেছে। আলগাভাবে দেখলে এমনটাই তো মনে হয়। আসলে মানব উন্নয়নের যে চলতি মাপকাঠি রয়েছে তাতে এসব দিকগুলোর পরোয়া না করলেও চলে। কিন্তু স্থায়ীত্বের প্রশ্নে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ওসব প্রাসঙ্গিক তা নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কও বটে।

প্রথমে কৃষির কাঠামোগত দিকটা নিয়েই বলা যাক। কৃষি উৎপাদনে প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই জরুরী। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার ওই ব্যবহৃত কৃৎকৌশল প্রকৃতির কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা। অর্থাৎ কৃষির যে আদল আমরা গড়ে তুলেছি তাতে প্রকৃতির সমর্থন আছে কিনা। সমর্থন থাকলে কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন অবশ্যই স্থায়িত্ব পাবে অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে তার মুখ থুবড়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। একফসলি এস্টেট ফার্মিং প্রকৃতির কাছে না পসন্দ। কেননা প্রকৃতির স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে জীব বৈচিত্র্যের ওপর। এক্ষেত্রে তা হলো ফসল বৈচিত্র্য। রাসায়নিক সার, বিষ এসব পুষ্টিচক্রকে ধ্বংস করে। আর তাই প্রকৃতির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজন জৈব উপকরণ। ভারি যন্ত্রপাতি মাটির বাস্তুতন্ত্রের পরিপন্থী। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে কিউবার সেই পুঁজি আর প্রযুক্তি নির্ভর চাষের কাঠামো প্রকৃতিকে অস্থির করে তুলবে। হলোও তাই। নানান ঈশারা-ইঙ্গিতে বেরিয়ে এলো প্রকৃতির যন্ত্রণা.... ক্ষোভ.... প্রতিহিংসা। ওই ৭০-৮০'র দশকেই।

অতিরিক্ত সেচ নির্ভরতার কারণে ভৌমজল স্তর নেমে গেল, নদী-জলাশয় শুকিয়ে গেল, মাটির লবণতা বেড়ে গেল, ভারী যন্ত্রের কারণে অনমনীয় হয়ে গেল মাটি, ভূমিক্ষয়, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানীয় জলে পোকামারা বিষের মিশ্রণ, ফসলে রোগপোকার আক্রমণ, সর্বোপরি ফলন কমে যাওয়া। ১৯৯১ সালের এক সরকারি রিপোর্টে বলা হয় দেশের ৭০ শতাংশ জমি ভূমিক্ষয়ের কবলে। ওই নথিতেই উল্লেখ রয়েছে ১০ শতাংশ জমি লবণাক্ত। চাষের অনুপযুক্ত। অনমনীয় চাষের জমির অনুপাত প্রায় ২৫ শতাংশ। জমির উৎপাদনক্ষমতা বিনষ্ট হতেই গ্রামের মানুষ কাজের সন্ধানে শহরে পাড়ি দেয়। তৈরী হয় জনবন্টনে বৈষম্য। ১৯৫৬ সালে যেখানে গ্রামীণ অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ, সেখানে ১৯৮৯-এ তা কমে আসে ২৮ শতাংশে। তিন দশকে গ্রামের লোকসংখ্যা অর্ধেকে পৌঁছে যায়। চাপ বাড়ে শহরে।

এবারে আসা যাক ওই প্রথম দুটি বিষয়ে, অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি প্রসঙ্গে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী জোগাড়ের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা কিংবা জাতীয় রোজগারের ক্ষেত্রে কোনও এক বন্ধু দেশের নির্দিষ্ট বাজারে ভরসা আসলে দেশের সক্ষমতাকে বিনষ্ট করে। জাতীয় অর্থনীতিকে করে তোলে ক্ষণভঙ্গুর। একথার সত্যতা যাচাই করতে হলে আমাদের উল্টে দেখতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পরবর্তী কিউবার ইতিহাস। এবারে সেদিকেই তাকানো যাক।

সোভিয়েত ব্লকের ভাঙন শুরু হয় ১৯৮৯ নাগাদ। খুব শীঘ্রই ভেঙে গেল বার্লিন প্রাচীর। সোভিয়েত ভুক্ত যে সমস্ত ছোট বড় বাণিজ্যিক গোষ্ঠী ছিল সবগুলোই একে একে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কিউবার দৃষ্টিকোণ থেকে সব মিলিয়ে ঘটলো দুটি ঘটনা— এক, আমদানির উৎস আর নেই। দুই, রপ্তানি বাজার ধ্বসে গেছে।

কিউবার মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৮৫ শতাংশ হতো সোভিয়েতের সঙ্গে। রপ্তানির ক্ষেত্রে ৬৬ শতাংশ আখ এবং ৯৮ শতাংশ সাইট্রাস জাতীয় ফল। আমদানির ক্ষেত্রে ছিল দেশের মোট ব্যবহৃত খনিজ তেলের ৯৮ শতাংশ, ৬৬ শতাংশ খাদ্যদ্রব্য, ৮৬ শতাংশ কাঁচামাল, ৮০ শতাংশ যন্ত্রপাতি এবং তার স্পেয়ার পার্টস। ১৯৮৮ সালে যেখানে খনিজ তেল আমদানি করা হয়েছিল ১২-১৩ মিলিয়ন টন সেখানে ১৯৯১ সালে তা এক ধাক্কায় কমে হলো ৬ মিলিয়ন টন। জ্বালানীর অভাবে কারখানার ঝাপ বন্ধ হলো, থেমে গেল যানবাহনের চাকা। ট্রাক্টর বসে গেল, কৃষি রাসায়নিক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না খাদ্যসহ প্রতিদিনের অন্যান্য ভোগ্যপণ্য। তড়িঘড়ি দু-তিনটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো প্রশাসন। শক্তি সাশ্রয়ের জন্য পরিকল্পনামাফিক ব্ল্যাক আউট, জ্বালানী নির্ভর যানবাহনের পরিবর্তে রাস্তায় নামল বাই-সাইকেল, ট্রাক্টরের বদলে জমিতে এলো লাঙ্গল-বলদ, ৮০'র দশকে ১৯টি পণ্য সরকারি রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্টন করা হতো, এখন খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত ভোগ্যসামগ্রী জনগণের কাছে পৌঁছতে শুরু করলো রেশনিং মারফত। কিন্তু পরিস্থিতি খুব একটা বদলালো না। কারণ সমস্যা তো বন্টন ব্যবস্থায় নয়, সমস্যা রয়েছে যোগানের ক্ষেত্রে যা আমদানি নির্ভর। একদিকে খাদ্যের অভাব, অন্যদিকে হাঁটা আর সাইকেল চালিয়ে যাতায়াতে পরিশ্রম বেড়ে গেল। তাই বড়সড় আঘাত এলো জনস্বাস্থ্যে। একেক জনের ১৫-৩০ পাউণ্ড ওজন কমে গেল। নথি বলছে ৫০ হাজার মানুষ দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছেন, ভিটামিন-'বি'র অভাবে নিউরোপ্যাথি মহামারির আকার নেয়। একদিকে প্রয়োজন দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদন, অন্যদিকে উৎপাদনের উপকরণ রয়েছে অর্ধেক— সে এক বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ। এরমধ্যে মড়ার ওপর খাড়ার ঘা বসিয়েছে প্রতিহিংসা পরায়ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৯২ সালে মার্কিন প্রশাসন কার্যকর করে 'কিউবা ডেমোক্র্যাসি অ্যাক্ট' (যা টরিসেলি বিল

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

নামে বেশি পরিচিত), ১৯৯৬ সালে কার্যকর হয় 'কিউবা লিবার্টি এন্ড ডেমোক্র্যাসি সলিডারিটি অ্যাক্ট (যা হেলমস্ বার্টন অ্যাক্ট নামে সুপরিচিত)। প্রথমটি ট্রেড এম্বার্গোকে আরো মজবুত করে এবং খাদ্যশস্য রপ্তানিতে কড়াকড়িভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ওদিকে লিবার্টি, ডেমোক্র্যাসি ইত্যাদি গালভরা নানান শব্দ ব্যবহার করা হয় বটে, আসল উদ্দেশ্য মার্কিন ব্যবসায়ে যিনি আঘাত হেনেছেন সেই কাস্ত্রোকে বিতারণ করা। আমেরিকা ভেবেছিল বেকায়দায় পড়ে কিউবাবাসী কাস্ত্রোকে আপনা থেকেই বিদায় জানাবে। মার্কিন সেনেটে দ্বিতীয় আইনটি পাশ করার সময় সেনেটর জেসি হেলমস্ ঘোষণা করেছিলেন, এবছরটি হোক ফিদেলের কিউবা থেকে বিদায়ের বছর। তিনি আরো মন্তব্য করেন— ফিদেল কিভাবে বিদায় নেবে তাতে আমার মাথা ব্যথা নেই, ও বিদায় নিলেই হল।

কিন্তু এ পৃথিবী কি প্রত্যক্ষ করল? কিউবাবাসী পিছপাও হয়নি, মারাও পড়েনি। শিরদাঁড়া সোজা করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো— নিঃশব্দে ঘটে গেল আরো একটি বিপ্লব— কৃষি বিপ্লব। জৈব কৃষি বিপ্লব।

দু-আড়াই দশক অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে এই বিকল্প কৃষি অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলশ্রুতি দেশ বিদেশের নানান কাগুজে নথিতে প্রকাশ পেয়েছে। আর্থকেয়ার বুকস্ এর প্রকাশনায় ভারত মানসাটা একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন। প্রথম প্রকাশ ২০০৮। পরের বছর পুনর্মুদ্রণ করা হয়। 'অর্গানিক রেভল্যুশন/দ্য এগ্রিকালচার ট্রানসফরমেশন অব্ কিউবা সিনস ১৯৯০' শিরোনামে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কিউবার বিপ্লবের পটভূমি, নাগরিক সমাজ এবং প্রশাসনের ভূমিকা। সর্বোপরি বিপ্লবের ফলশ্রুতি। পঞ্চম অধ্যায়ে ভারত অসংখ্য তথ্যপঞ্জি দিয়ে বর্ণনা করেছেন বিপ্লবের সুদূর প্রসারি প্রভাব। তাতে দেখা যাচ্ছে নাগরিক জীবনের গভীরতম অংশেরও পুনর্নির্মাণ করেছে এই বৈপ্লবিক উদ্যোগ। কীরকম? একবার দেখে নেওয়া যাক— এক ঃ খাদ্য উৎপাদনে এসেছে স্বনির্ভরতা, আর তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খাদ্য সুরক্ষা, দুই ঃ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, তিন ঃ তৈরী হয়েছে জোরালো কমিউনিটি স্পিরিট, দেশাত্মবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, চার ঃ প্রাকৃতিক পুঁজি যা সভ্যতার বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন অর্থাৎ জল-জঙ্গল-মাটি-জীববৈচিত্র্য ইত্যাদির পুনরুদ্ধার। আর এই পুনরুজ্জীবিত সম্পদের টানে শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরেছে অসংখ্য মানুষ। পাঁচ ঃ সুস্থির হয়েছে অর্থনীতি। এছাড়া পরোক্ষভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, গবেষণা ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে ঘটেছে মৌলিক গঠনগত পরিবর্তন।

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত ইউ. এন. ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (ফাও)-র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ১৯৯৮ সালের পর পাঁচ বছরের মধ্যে কিউবায় সব্জি উৎপাদন বেড়েছে চারগুণ। দানাশস্য ৮০ শতাংশ, তন্তুজাতীয় শস্য ৬০ শতাংশ এবং লেবু জাতীয় ফলের উৎপাদন বেড়েছে ১১০ শতাংশ। ধানচাষে শ্রীপদ্ধতি প্রয়োগে ৭০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ফল উৎপাদন বৃদ্ধির হার বরাবর দশকের অঙ্ক ছুঁয়ে ছিল। ওই সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী একজন সুস্থ প্রাপ্ত বয়স্কের প্রতিদিন মাথাপিছু ৩০০ গ্রাম টাটকা শাক-সব্জি প্রয়োজন। সেখানে ২০০০ সালের মাঝামাঝি কিউবাবাসী গড়ে একেকজন ৮৬৯ গ্রাম শাক-সব্জি খেত। বছর তিন পর শুধু হাভানা প্রদেশেই প্রতিদিন শাক-সব্জি উৎপাদন হতো মাথাপিছু ৯৪৩ গ্রাম। শুধু তাই নয়, একই সংস্থার আরেকটি সুপারিশে বলা হয়েছে যে, দৈনিক মাথাপিছু ২৪০০ কিলো-ক্যালোরি তপনমূল্যের খাবার প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিমাণ ৭২ গ্রাম (বয়স পার্থক্যে অবশ্যই মাত্রাগত হেরফের ছিল)। অথচ কিউবাবাসী ভোগ করছিলেন দৈনিক মাথাপিছু ২৬০০ কিলো-ক্যালোরি। ভোগ্য প্রোটিনের পরিমাণ অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় ৪ গ্রাম কম।

এর পরেও কি একজন শিক্ষিত সচেতন নাগরিক ওই বহুজাতিক কোম্পানীর আদলেই প্রশ্ন তুলবেন— রাসায়নিক ছাড়া দেশজ প্রযুক্তিতে খাদ্য উৎপাদন করে দেশবাসীর খাদ্যের চাহিদা কি মেটানো সম্ভব? আচ্ছা বেশ, বাজে কথা ছাড়ছি। কাজের কথায় আসি। সোভিয়েতের পতনের সময় কিউবাতে জনসংখ্যা ছিল ১০.৭ মিলিয়ন যা ২০০২ সালে বেড়ে হয় ১১.২ মিলিয়ন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই এক দশকে অপুষ্টির সংখ্যা কমে হয় অর্ধেক। ০.৮ মিলিয়ন থেকে ০.৪

মিলিয়ন। এই মুহূর্তে কিউবাবাসীর গড় আয়ু ৭৬ বছর যা মার্কিনিদের সমান। কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার মার্কিনিদের থেকে কমিয়ে এনেছে কাস্ত্রো সরকার। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিউবার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুষ্টিকর খাবার খেয়ে শরীর গড়ার মধ্য দিয়ে রোগ প্রতিরোধ করা। একদিকে সুষম আহার অন্যদিকে হেঁটে কিম্বা সাইকেলে যাতায়াতে যে লাইফস্টাইল শুরু হয় তাতে আধুনিক অনেক রোগ যা নিয়ে এ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোও বেশ চিন্তিত সেগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। আমেরিকান জার্নাল অব পাবলিক হেলথ্ জানুয়ারি, ২০০৬ ইস্যুতে দাবি করে যে ২০০২ নাগাদ কিউবাতে হৃদরোগ ১৯৭০'র তুলনায় ৪৫ শতাংশ কমে গেছে। লেখক আরো দাবি করেন যে, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী সাফল্য পেয়েছে এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি। প্রকৃতি নির্ভর কৃষি উদ্যোগের অন্যতম শরিক ছিলেন ডঃ ফার্নান্দো ফিউন আগুইলার। তিনি কোনও এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যেহেতু আমাদের কোন ওষুধ ছিল না তাই আমরা বেশী বেশী করে ভেষজ গাছ লাগাতে শুরু করি'। এক দশকের অনেক কম সময়ের মধ্যে প্রত্যেকের বাড়ির বাগানে গড়ে ওঠে একেকটি আস্ত ডিসপেনসারি। ছোটখাটো রোগের ক্ষেত্রে খাদ্যাভাসের কিছু উপদেশসহ ঔষধি গাছ ব্যবহারের পরামর্শ দিতে ডাক্তারবাবুরাও খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন বলে জানা যায়।

খাদ্যোৎপাদনে ভর করেই গড়ে উঠেছে নিরাপদ স্বাস্থ্য। আবার এই উদ্বৃত্ত খাদ্যই নাগরিক জীবনে এনে দিয়েছে উচ্চমার্গের এক সামাজিক বোধ। অভিনব এক কমিউনিটি স্পিরিট। অনেক প্রতিবেদনে দেখা গেছে

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

যে হাভানা অঞ্চলে নিজস্ব বাগানের ফসল বয়স্ক এবং দরিদ্র মানুষদের উপহার স্বরূপ প্রদান করার এক অভূতপূর্ব রেওয়াজ তৈরী হয়েছে। পাড়ার প্রাইমারি স্কুল, ডে কেয়ার সেন্টার কিম্বা অবসরপ্রাপ্ত পড়শিদের অনেক গৃহস্থই নিয়মিত উদ্বৃত্ত উৎপাদন উপহার স্বরূপ দিতেন। হাভানার এক বাগান মালিক তার বাড়ির সব্জি বাগানে কেন তিনি কোনও ঘেরা-

বেড়া দেননি সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'বাগানে কীভাবে ফসল চাষ করা হয় সে বিষয় আমি পাড়ার বাচ্চাদের শিখিয়েছি। ওরা আমাকে মাঝে মধ্যে সাহায্য করে। আমি ওদের পরিবারের জন্য বাগানের উৎপাদিত ফসল উপহার দিই। বেড়া দিয়ে না ঘিরে পড়শির সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ফসলে অনেক বেশী নিরাপত্তা যোগানো যায়'। বেশী বেশী ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে অনেক ভূমিহীনদের বিনে পয়সায় সরকার থেকে জমি দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যাশা যে ওই কৃষকরা তাদের উৎপাদনের একটা অংশ স্থানীয় স্কুল, হাসপাতালে স্বেচ্ছায় সোস্যাল রেন্ট হিসেবে প্রদান করবে। আর করেও তাই। ওদিকে সরকারি উদ্যোগে প্রতিটি স্কুলের প্রতিটি ছাত্রের জন্য প্রতিমাসে বরাদ্দ করা হয় ১০ পাউন্ড খাদ্যদ্রব্য। চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের প্রতিটি শিশুর জন্য ১৩ পাউণ্ড, হাসপাতালের রুগীর জন্য ২৮ পাউন্ড। সবই বিনে পয়সায়। ১৯৯৮ সালের তথ্য অনুযায়ী সরকারি রেশনিং ব্যবস্থায় প্রতিমাসে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বরাদ্দ হতো অন্তত ৫ পাউন্ড চাল, ১ পাউন্ড বিন এবং ৩ পাউন্ড চিনি। পর্যাপ্ত খাদ্যের বন্টন প্রতিটি নাগরিককে এক সুতোয় গেঁথে তৈরী করে এক নিবিড় সামাজিক ঠাসবুনট।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী তিন দশক গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমিয়েছে শহরে। মূলত কাজের প্রয়োজনে। কেউ কেউ আবার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে। কেননা আগেই বলেছি যে একফসলি আখচাষের কারণে জমির উর্বরতা কমে গেছিল, জল-জঙ্গল মাটি গুণমান নষ্ট হয়ে গেছিল। শেষে ৯০'র দশকে বিকল্প চাষ মডেল প্রয়োগের পর প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকারিতা বেড়ে গেলে মানুষ আবার গ্রামমুখী হয়। জমিতে তৈরী হয় নতুন নতুন কর্মসংস্থান। আরবান এগ্রিকালচার শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। ২০০৩ সাল নাগাদ হাভানাতে দুই লক্ষাধিক পূর্ণ সময়ের শ্রমিক চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অনেক মানুষ কিচেন গার্ডেনে আংশিক সময়ের জন্য কাজ পায়। সে বছরই শহুরে কৃষিতে রাজধানী শহরে কাজের সুযোগ বাড়ে ২২ শতাংশ। ভূমিসংস্কারের ফলে বড় জোত ভেঙে গেছে। সাধারণ দরিদ্র মানুষের মালিকানায় জমি এসেছে। চাষে আগ্রহ বেড়েছে। তৈরী হয়েছে সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন— আখ থেকে খাদ্যশস্য সবেতেই। প্রথম সারির বিত্তবানদের তালিকার ওপর থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে অনেক কৃষক জায়গা পেয়েছে। তারা ডাক্তার কিম্বা অ্যাকাডেমিশিয়ানদের থেকেও এগিয়ে। সব মিলিয়ে শোষণ মঞ্চের ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত হয়েছে সুস্থায়ী এক মজবুত কৃষি অর্থনীতি।

কিউবা বিকল্প পথ খুঁজেছে পরিস্থিতির চাপে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা ইউরোপীয়ন ইউনিয়নের বণিক মহলের একাংশ এখন পরিকল্পনামাফিক ওই একই মডেল বেছে নিয়েছে। উদ্দেশ্য অবশ্য ভিন্ন। পুঁজির সম্প্রসারণ। নতুন মুনাফার খোঁজ। বড় বড় শহরের নামিদামি হোটেল-রেস্তোরায় চড়া দরে বিকোয় বিষমুক্ত জৈব খাবার। কেন না এক সচেতন বাজার ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। সে যাইহোক ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোতে যেখানে ৭০ শতাংশেরও বেশী মানুষ কৃষি নির্ভর সেখানে অনাহার, অপুষ্টি বেকারত্ব, দারিদ্রতা এসব সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে বাস্তুতান্ত্রিক কৃষিই যে একমাত্র পন্থা তা নিয়ে কিউবার কৃষি বিপ্লবের পর আর কোনও সংশয় নেই। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, সায়ন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (আই.এ.এ.এস.টি.ডি.) এপ্রিল, ২০০৮ সালে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। উদ্যোগ এবং বহরে ২৫০০ পাতার এই নথি আই.পি.পি.সি.-র অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের সাথে তুলনীয়। বিভিন্ন দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি উদ্যোগ, বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা সহ বিশ্বব্যাঙ্ক, এফ.এ.ও., ইউ.এন.ডি.পি. এবং হু প্রতিনিধিত্ব করছে ওই আই.এ.এ.এস.টি.ডি.-তে। ভারত মানসাটা তার বইয়ের সংযোজনীতে উল্লেখ করেছেন— "প্রাকৃতিক ভারসাম্য রেখে ক্ষুদ্র কৃষিতে অগ্রগতি সম্ভব যেখানে নিজস্ব প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জি. এম. শস্য খুবই বিতর্কিত এবং তা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের উত্তর নয়।"

সুতরাং জি.এম. শস্য আদৌ কোনও সুবিধে নিয়ে আসে নাকি সর্বনাশ ঘটায় তা বোঝার জন্য আরো অনেক গবেষণা প্রয়োজন। অন্যদিকে সুসংহত প্রকৃতি নির্ভর আবাদ ব্যবস্থায় বিস্তর প্রাপ্তিযোগ ঘটে। নিশ্চিত ফলন, ব্যয় সংকোচ, স্বাস্থ্যকর খাবার, মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার, জলসংকট থেকে রেহাই, হাতের নাগালে স্থিতিশীল বাজার, আরো কত কি! আর তাই কর্পোরেট চালিত পেট্রোপ্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাকে সরিয়ে এই প্রাকৃতিক চাষ মডেল গ্রহণ করার এখনই উপযুক্ত সময়।

বার বার মডেল মডেল বলে আখ্যা দেওয়ায় বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। মনে হতে পারে আর পাঁচটা উন্নয়ন তত্ত্বের মতো ইকোলজিক্যাল ফার্মিংও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গবেষণালব্ধ এক উদ্ভাবনী। তা কিন্তু নয়। ইকোলজিক্যাল ফার্মিং বা বাস্তুতান্ত্রিক চাষ আসলে হাজার বছর ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রতিস্থাপিত হয়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত অভিজ্ঞতালব্ধ এক কৃষিভাবনা যা প্রয়োগ আর অভ্যেসের মাধ্যমে বেঁচে আছে। সুতরাং এটি চাষাবাদের কোনো কৃৎকৌশল নয়। বলা যেতে পারে প্রকৃতির সঙ্গে যাপন করা অতি প্রয়োজনীয় এক নিয়মবিধি। এক জীবন দর্শন, যা জীবন প্রবাহকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্ঠিপাথরে মূল্যায়ন করে বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানীরা একে সভ্যতার অস্তিত্ব

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

রক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মাত্র। ফুকওকা থেকে জ্যাকসান প্রত্যেকে একই লাইনে কথা বলেছেন। আইএএএসটিডি-ও ওই একই মতামতের পৃষ্ঠপোষক। আর সে কারণেই রিপোর্টে এরকম সুপারিশ।

এখন কথা হলো বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব? কিউবা তো শাপে বর পেয়েছে ইতিহাসের প্যাঁচে পড়ে। অন্যেরা ওই একই প্রয়োগ কৌশলকে অন্ধ অনুকরণ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। কারণ ইকোলজিক্যাল ফার্মিং রূপায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা জরুরী। এক, এলাকার প্রাকৃতিক গড়ন; দুই, অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা পরম্পরা; তিন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা; চার. অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সেই অনুযায়ী বাজারের চরিত্র ইত্যাদি। পাশাপাশি জনগণের চেতনার স্তরটিও খেয়াল রাখা ভালো। যাই হোক এগুলোর অধিকাংশই অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেলে ঋতুচক্রই পাল্টে যায়। আর মাটির গুণাগুণ তো হাঁটা পথে বদলায়। সুতরাং কোনও অঞ্চলের প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ওই কৃষিভাবনা প্রয়োগের ছক কষতে হবে। প্রসঙ্গ যখন প্রয়োগ পরিকল্পনা তখন অগ্রজের অভিজ্ঞতাও একটু নেড়েচেড়ে নেওয়া দরকার যাতে অনিবার্য কিছু ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে চলা যায়। এবার তাহলে সেদিকেই একটু চোখ ফেরানো যাক অর্থাৎ দেখে নেওয়া যাক কিউবা কীভাবে কেমিক্যাল থেকে ইকোলজিক্যাল ফার্মিং-এ পৌঁছালো।

ভারত মানসাটার লেখায় স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে দুটি পর্যায়ে পুরো কৃষি রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মূলত তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক, কৃষি উদ্যোগের পুনর্গঠন; দুই, নয়া বাজার ব্যবস্থার সূচনা; এবং তিন, স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য জৈব উপকরণের ব্যবহার। দ্বিতীয় পর্যায়ে মাটির পুষ্টিচক্র এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ বাস্তুতান্ত্রিক চাষাবাদ ইকোলজিকাল ফার্মিং ব্যবস্থা।

সরকারি উদ্যোগ তো কার্যত শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে ঠিক যখন ট্রেড এম্বার্গোর কারণে তীব্র সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। কিন্তু নাগরিক আন্দোলন শুরু হয় আরো কয়েক বছর আগে থেকে। তা প্রায় ১৯৮২ সাল নাগাদ। মূলত ছোট চাষি, শিক্ষিত নাগরিক, সচেতন বিজ্ঞানী প্রমুখদের একাংশের উদ্যোগে। দাবী ছিল একফসলি আখ চাষের বিকল্প কৃষির প্রবর্তন, প্রাণপ্রকৃতির অবক্ষয় রোধ ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আন্দোলনকারীরা কিছু সংগঠন তৈরী করে ফেলেছে। অন্যতম একটি সংগঠন কৃষি ফলন সমবায়। স্বেচ্ছায় চাষিরা নিজেদের মালিকানায় থাকা জমিগুলো একত্রিত করে চাষের কাজে ব্যবহার করে। সে যাই হোক আন্দোলনের আঁচ বুঝে প্রশাসন তড়িঘড়ি কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। তারমধ্যে অন্যতম 'ন্যাশনাল ফুড প্রোগ্রাম'। লক্ষ্য ছিল ২০১০০ হেক্টর আখের খেতে সব্জিচাষের প্রচলন করা। একদিকে যেমন খাদ্যের চাহিদা মিটবে। অন্যদিকে বাড়বে ফসল বৈচিত্র্য যা প্রকৃতির স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক।

বছর কয়েক পর নব্বইয়ের দোরগোড়ায় কাস্ত্রো ঘোষণা করলেন, 'কোনও চাষযোগ্য জমি যেন ফাঁকা পড়ে না থাকে'। সরকারি দফতরগুলো তাদের অফিসের চৌহদ্দির মধ্যেকার ফাঁকা জায়গাতে

চাষ শুরু করে। যে সমস্ত অফিসে এরকম চাষযোগ্য জমি নেই তাদের ক্ষেত্রে আশপাশ থেকে জমি সংগ্রহ করে তাতে চাষের অধিকার অর্পণ করা হয়। কৃষিমন্ত্রক হাভানার সদর দফতরের লম্বা উঠোন চষে ফেলে। সেখানে দিব্যি ফলানো হচ্ছে লেটুস, কলা, বিনস্ এরকম নানা ধরনের ফসল। সেনা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করে জানানো হলো, 'খাদ্য উৎপাদন করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ'। মিলিটারিরা এখন নাগরিকদের কাছ থেকে কোনও রকম কৃষিজ দ্রব্য সংগ্রহ না করে বরং তাদের নিজস্ব উদ্বৃত্ত উৎপাদন সিভিলিয়ানদের কাছে সরবরাহ করার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশ জুড়ে ৯৩টি ফার্ম সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলো দেখভাল করতো ইউথ ওয়ার্ক ট্রুপস্ নামে মিলিটারিদের একটি বিশেষ শাখা। যুবকদের একবছর বাধ্যতামূলক মিলিটারিতে কাজ করার পরিবর্তে ওই ফার্মে যোগ দেবার জন্য আবেদন করা হয়।

১৯৯৩-এ সরকার আরো একবার ভূমিসংস্কার করে কৃষি উদ্যোগের পুনর্গঠনে হাত দেয়। ছোট ছোট ব্যক্তি কৃষকদের নিয়ে তৈরী করা হয় কো-অপারেটিভ, যার নামকরণ হয়— বেসিক ইউনিটস অফ কো-অপারেটিভ প্রোডাকশান। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা জমি ওই কো-অপারেটিভের মধ্যে বন্টন করা হয়। নথি বলছে এক বছরের মধ্যে সরকারি মালিকানায় থাকা প্রায় সবকটি সুগার ফার্ম বিইউসিপি-তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশান কো-অপারেটিভ-এর কাজকর্ম সম্প্রসারণে সরকারি সাহায্য আসতে থাকে। এই দুইয়ে মিলে কৃষকদের মধ্যে চাষে বাড়তি উৎসাহ তৈরী হয়। এপিসি তৈরী হয়েছিল ষাটের দশকে। কৃষকদের নিজস্ব উদ্যোগে। সরকারি প্রচেষ্টায় বিইউসিপি তৈরী হয় মূলত ওই সংগঠনের আদলেই। তবে পার্থক্য হলো এপিসি-র নিজস্ব মালিকানায় জমি থাকতো। অন্যদিকে বিইউসিপি-র ক্ষেত্রে জমির মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের হাতে, তবে সুনিশ্চিতভাবে সেই জমি চাষের অধিকার ছিল সংগঠনের দখলে। এছাড়াও ছোট কৃষকদের আরো একটি সংগঠন হলো ক্রেডিট অ্যান্ড সার্ভিস কোঅপারেটিভ যা কিনা সরকারি ব্যাঙ্ক লোন, সম্প্রসারণ পরিষেবা ইত্যাদি সংগ্রহের একটি বিধিবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম। এই কো-অপারেটিভের ব্যবসায়িক দিকটি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তৈরী হয় ন্যাশনাল এসোসিয়েশান অফ স্মল প্রডিউসার। ১৯৯৮-এ তারা অনেকগুলি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে যা কৃষি বাস্তুতান্ত্রিক আন্দোলনকে কয়েকধাপ এগিয়ে দেয়।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

এই যে সরকারি-বেসরকারি, ছোট-বড় নানা মাপের নতুন নতুন কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা কিম্বা পুরোনো সংগঠনকে উজ্জীবিত করা এসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উদ্যোগের বিকেন্দ্রীকরণ। আর এই বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থাই ছিল ও দেশের কৃষি বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি। শুধু উৎপাদন কেন, বিপণনের ক্ষেত্রেও একই কৌশল অবলম্বন করে প্রশাসন। ১৯৯৪ সালে সরকার সারা দেশজুড়ে ১২১টি নতুন কৃষক বাজারের সূচনা করে। দ্রব্য কেনাবেচার ওপর থেকে সব রকম নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়। কমিয়ে ফেলা হয় সেলট্যাক্স। বাজার চলে তার নিজস্ব নিয়মে — চাহিদা আর যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে। ফল মেলে হাতে-নাতে। উৎপাদক যেমন লাভের অঙ্ক বাড়াতে সক্ষম হয় তেমনি ভোক্তারাও অপেক্ষাকৃত কম দামে দ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্যের প্রশ্নে শহর ছিল পুরোপুরি গ্রাম নির্ভর, যেমনটা হয় আর কি। কিন্তু গ্রাম থেকে শহরে বয়ে আনতে যে পরিবহন ব্যয় হয় তাতে দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। এই সমস্যা মেটাতে সরকার নজিরবিহীনভাবে এক নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করে— আরবান এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম। ১৯৯৪ সালে কৃষি মন্ত্রকের অধীনে তৈরী হয় নতুন ডিপার্টমেন্ট— আরবান এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট। লক্ষ্য ছিল প্রতিটি শহরে চাষের বন্দোবস্ত করা, সম্প্রসারণ পরিষেবা নাগরিক কৃষকদের কাছে পৌঁছানো, কৃষিজ দ্রব্য সংরক্ষণ, বিপণনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ডঃ আগুইলার একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন, 'শহরে প্রতিটি ফাঁকা জায়গাতে চাষ শুরু হয়। ১৯৯২ সালে কিউবাতে নগর কৃষি ছিল প্রায় শূন্য। সেখানে ১৯৯৩ তে আমরা একশো টন কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করি। ১৯৯৪ সালে তা পৌঁছায় হাজার টনে। এক দশকে সেটা হলো মিলিয়ন টন। ২০০৬-এ এই নগর কৃষিতে আমরা উৎপাদন করেছিলাম তিন মিলিয়ন টন খাদ্য'। ভারত মানসাটাও তার লেখাতে বলেছেন যে কিউবায় নগরবাসী শুধুমাত্র বাড়ির ফাঁকা জায়গায় নয়, ছাদ, ব্যালকনি সহ সমস্ত জায়গায় ফসল উৎপাদন করতো। আইনসভা এবং প্রশাসনের উদ্যোগে শুধু হাতেনাতেই কয়েক হাজার নতুন কিচেন গার্ডেন গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে আরো নতুন নতুন বিপণন কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন প্রথমে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করত, প্রতিটি নাগরিক যেন তাদের বসত বাড়ির সামনে বা পেছনের ফাঁকা জায়গায় চাষ করে, নতুবা তাদের ছয় মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হতো। এর মধ্যে চাষ শুরু না হলে ওই জমিতে চাষের সত্ত্বাধিকার বন্টন করে দেওয়া হতো ইচ্ছুক প্রতিবেশীদের মধ্যে। নিজস্ব জমি নেই এমন কোনও বাসিন্দা চাষের ইচ্ছা প্রকাশ করে মিউনিসিপ্যালিটিতে আবেদন করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় জমি যোগাড় করে দিত স্থানীয় প্রশাসন। মিউনিসিপ্যালিটি এবং নাগরিকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজটি করতো স্বশাসিত নাগরিক সংগঠন। আরবান এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট আবার তাদের সম্প্রসারণ পরিষেবার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময় নানা আলোচনাচক্র, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থাও করত।

শুধুমাত্র প্রশাসনিক উদ্যোগ কেন, এই আলোচনাচক্র, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও শুরু হয়। ১৯৯২ সালে একদল গবেষক অধ্যাপক হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয় শুধু এই উদ্দেশ্যেই। তারা জৈব কৃষির ওপরে প্রথম জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করে। তৈরী করে কিউবান অরগানিক ফার্মিং এসোসিয়েশান যা পরবর্তীতে বদলে হয় অরগানিক ফার্মিং গ্রুপ। ১৯৯৫ সালে আয়োজিত হয় দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন। তৃতীয়টি সংঘটিত হয় ১৯৯৭-এ। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রি এবং পি. এইচ. ডি. স্তরে কৃষি বাস্তুতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে এই বিষয়ে চালু হয় করেশপনডেন্স কোর্স।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে কিউবার কৃষি বিপ্লবের প্রধান প্ল্যাটফর্ম ছিল ওদেশের কৃষি উদ্যোগের কাঠামোগত পুনর্গঠন। আগের অনুচ্ছেদগুলোতে খন্ড খন্ড করে বললেও এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক কেমন ছিল সেই নবনির্মিত উৎপাদন ব্যবস্থার গড়ন।

লুসি মার্টিন, মানসাটার ওই বইটির পরিশিষ্টতে তার একটি লেখার উল্লেখ করেছেন যে, কিউবার সমস্ত কৃষি উদ্যোগকে তিনটি স্তরে বিভাজন করা যায়— এক, রাষ্ট্রীয় খামার অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগ; দুই, যৌথ খামার অর্থাৎ সমবায় ভিত্তিক এবং তিন, নিজস্ব খামার অর্থাৎ কিনা ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

সরকারি উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে পাঁচ রকমের খামার— এক, নিউ টাইপ ষ্টেট ফার্ম যেখানে জমির মালিক সরকার, কিন্তু চাষিরা কো-অপারেটিভ গড়ে কিছু কিছু অর্থ বিষয়ক দায়িত্ব পালন করতো; দুই, ফার্ম অফ রেভলিউশানারি আর্মড ফোর্সেস; তিন, ফার্ম অফ ইয়ং ওয়ার্কার্স আর্মি; চার, ফারমস্ অফ মিনিষ্ট্রি অফ ইনটেরিওর; এবং পাঁচ, সেল্ফ প্রভিশনিং ফার্মস্ অর্থাৎ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দফতরের ক্যাম্পাসে যে চাষের ব্যবস্থা করা হয় সেগুলো।

সমবায় ভিত্তিক কৃষি উদ্যোগে রয়েছে মূলত দু-ধরনের সংগঠন— এক, ফার্মস অফ এপিসিও'স এবং দুই, ফার্মস্ অফ বি ইউ সি পি যেখানে জমির ভোগদখল করবে সংগঠন কিন্তু জমির মালিকানা থাকবে সরকারের হাতে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে দুটি চরিত্র লক্ষণীয়— এক, ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজস্ব জমিতে চাষ এবং দুই, ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকার থেকে প্রাপ্ত জমিতে চাষের সত্ত্বাধিকার উপভোগ করা।

সামগ্রিক এই কাঠামোয় ভর করে প্রথমে ইনপুট সাব্সটিটিউশান অর্থাৎ চাষে রাসায়নিকের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য জৈব উপকরণের ব্যবহার এবং তারপর বৃক্ষরোপণ, ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামোকে মজবুত করে বাস্তুতান্ত্রিক চাষাবাদে উত্তরণ। কিউবার এই নিঃশব্দ বিপ্লবের ইতিহাস ঘেঁটে যে অনুভব মনের মধ্যে বার বার অনুরণন তৈরী করে তা হলো কৃষি উন্নয়নের প্রশ্নে প্রকৃতি নির্ভরতাই শেষ কথা। অর্থাৎ আমাদের গন্তব্য নির্দিষ্ট... "প্রকৃতির কাছে ফিরে চলো"। এখন এই ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা সংশ্লিষ্ট দেশ, জাতি বা সমাজের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। সাবধানতা এখানেই প্রয়োজন। অন্ধ অনুকরণ নয়, নাগরিক সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো, বিবর্তনের ইতিহাস, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা এই সমস্ত দিক বিবেচেনা করে নিজেদের মতো যাত্রাপথ নির্মাণ করা জরুরী।

[কৃতজ্ঞতা ঃ **উত্তর দক্ষিণ**]

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সিঙ্গুর রায় ও তার শিক্ষা

—অরণী সেন

দীর্ঘদিন মামলা চলার পর গত ৩১ আগষ্ট '১৬ সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অনেকগুলি মামলা এক করে রায় দিলেন যে এই জমি অধিগ্রহণ ছিল অবৈধ এবং অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত দিতে হবে, সঙ্গে গত দশ বছরের দুর্দশার জন্য ক্ষতিপূরণ। আর ইচ্ছুক জমিদাতারাও জমি ফেরত পাবেন, তাদের ফেরত দিতে হবে না ক্ষতিপূরণ। জমিটিকে আগের অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ১২ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

এই রায় সব অর্থেই শুধু ঐতিহাসিক নয় প্রবহমান বৃহৎ পুঁজি বান্ধব সরকারি নীতি ও আদালতের রায়গুলির সাপেক্ষে বৈপ্লবিক। এছাড়াও এই রায় সিঙ্গুরের নির্যাতিত সংগ্রামী কৃষক এবং তাদের সহায়ক গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য শক্তিগুলির কাছেও অত্যন্ত আনন্দের ও উৎসাহব্যঞ্জক। পাশাপাশি এই রায় ক্ষমতা হারানো সিপিআইএম-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী কর্মকাণ্ডের একটি চূড়ান্ত উন্মোচন। অনায়াসে ছোটগাড়ি ও তার অনুসারী শিল্প দুর্গাপুর অথবা খড়্গপুর শিল্পাঞ্চলে হতে পারত। কিন্তু সম্ভবত কলকাতার কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের পাশে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জন্য বৃহৎ শিল্পপতি রতন টাটার অভিলাষে ক্ষমতামত্ত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ২০০৬-র নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের পর কোনরকম আলোচনা বা মতামত না নিয়েই গায়ের জোরে রাষ্ট্রশক্তির অসুর বল প্রয়োগে গঙ্গা অববাহিকার সর্বোৎকৃষ্ট উর্বর প্রায় হাজার একর জমি দখল করেন। অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প জোয়ারের অজুহাতে।

কিন্তু সিঙ্গুরের লড়াকু কৃষকেরা সহজে ছেড়ে দেননি। তারা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাদের উপর পুলিশ এবং সিপিআইএমের গুণ্ডারা প্রবল অত্যাচার চালান। মহিলাদের উপরও অত্যাচার চলে। কিশোরী কৃষক যোদ্ধা তাপসী মালিককে ধর্ষণ ও খুন করার পর তার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেককে জেলে পোড়া হয়। সারা রাজ্য, দেশ এমনকি বিশ্ব প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। বহু গণতান্ত্রিক ব্যক্তি ও নাগরিক, কৃষক ও নাগরিক সংগঠন, মানবাধিকার সমিতি এবং রাজনৈতিক দল পথে নেমে লাগাতার প্রতিরোধ ও সহায়ক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল দল বিধানসভার ভেতরে বাইরে তুমুল ঝড় তোলেন। মমতা ধর্মতলায় ২৬দিন অনশন করেন, সিঙ্গুরে রাজপথ আটকে ১৪ দিন ধর্না দেন। মহাশ্বেতা দেবী, কবীর সুমন প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা তার সাথে যোগ দেন। গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি হওয়া সত্বেও বুদ্ধদেব সরকার রাষ্ট্রের অসুর বলপ্রয়োগে কৃষকদের উৎখাত করেন, কিন্তু পরে নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনে ধাক্কা খেয়ে তার মুঠি আলগা হয়ে যায়। হাওয়া বুঝে টাটা গুজরাটে সরে পড়ে। সেই ২০০৮ থেকে কৃষকদের হাহাকার নিয়ে পরিত্যক্ত কারখানা পড়ে ছিল। টাটারা অর্থশক্তিতে আইনি লড়াই দীর্ঘায়িত করে যাচ্ছিল। ২০১১-তে বিপুলভাবে ক্ষমতায় এসেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুতেই সিঙ্গুর জট ছাড়াতে পারছিলেন না। তার অধিগ্রহণ আইন ফস্কা গেড়োয় পরিণত হয়েছিল। যে সিঙ্গুর জমি আন্দোলন থেকে তার উত্থান, সেখানে কিছু করতে না পেরে তার যেমন খেদোক্তি বাড়ছিল, সিঙ্গুরের কৃষকদের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল গভীর হতাশা।

২০১৬ গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে অনেক বেশি রাজনৈতিকভাবে পরিণত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যপথে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পথে হাঁটলেন। ইতিমধ্যে টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার থেকে রতন টাটা বিদায় নিয়ে অনেক নমনীয় সাইরাস মিস্ত্রি এসেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল দলের এখন বাংলায় একচ্ছত্র প্রভাব। সংসদে প্রবল প্রতাপ। সর্বত্র ঠোক্কর খাওয়া মোদীর সরকার চালাতে মমতার দাক্ষিণ্য ছাড়া উপায় নেই। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ বিরোধীশূন্য। এক সময়কার প্রবল প্রতাপশালী সিপিএমকে দূরবীন দিয়েও চোখে পড়ছে না। মমতা অন্তরালে কেন্দ্রের মোদী সরকার ও টাটাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে আদালতকেও স্বপক্ষে নিয়ে এই আইনি জয় ছিঁনিয়ে নিলেন। রায়দানের আগে সাইরাস মিস্ত্রির এবং রায়দানের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিঙ্গুর জমি আন্দোলনের অন্যতম নেতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও টাটা মোটরস্-এর বিবৃতি খুবই অর্থবহ। যথারীতি জ্যোতি বসুর পর পশ্চিমবঙ্গের সবচাইতে দক্ষ ও সফল রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুর ইস্যুটিকে নিয়ে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। যে সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল সেই সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক রায় তার রাজনৈতিক সংহতকরণ ও ক্ষমতার বিস্তৃতির অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠেছে।

কন্যাশ্রী, দু'টাকার চাল, ক্লাব ক্ষয়রাতি, সম্মান-শিরোপা প্রভৃতি বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী 'কনডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার' প্রকল্পগুলি হয়ত বেশ কিছু উপভোক্তামণ্ডলী ও ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে, কিন্তু এগুলি ক্ষণস্থায়ী। পশ্চিমবঙ্গে ৩০ বছরের কংগ্রেস ও ৩৪ বছরের দীর্ঘ বাম শাসনের মত তৃণমূল শাসনের দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য সিঙ্গুরের মত একটি মোক্ষম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি এটিকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চান না। ইতিমধ্যেই তিনি সিঙ্গুর বিজয় দিবস উদযাপন করে বামদের ২ সেপ্টেম্বর বন্ধকে ম্লান করে দিয়েছেন এবং তার দিশাহীন

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ক্যাডার বাহিনীকে (বড় অংশ সিপিএম থেকে আসা, আর বেশি সংখ্যকই লুম্পেন শ্রেণীভুক্ত) চাঙ্গা করে তুলেছেন। টিম তৈরি করে সময়সীমা বেধে আমলা-নেতাদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন। নিজে দুবাই-ভ্যাটিকান থেকেও সরাসরি তদারকি করেছেন। পার্থবাবুরা তাকে খুশী করতে সিঙ্গুরের ঘটনা পাঠ্যপুস্তকে ঢোকানো সহ অনেক কিছু করতে চলেছেন। সিঙ্গুরের জমি ফেরত দিয়ে মমতা বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আসন লাভ করবেন। অন্যদিকে যদি এই রায়ের অ্যাপিলে কোন পরিবর্তন হয় কিংবা অন্য আইনি বাধায় অথবা টেকনিকাল কারণে জমি ফেরানো কোন কারণে সম্ভব না হয় তাহলেও তার রাজনৈতিক লাভ। তাই ভ্যাটিকান ও জার্মানী সফরের পর ও তাইল্যাণ্ড সফরের আগে সিঙ্গুর সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানের কৃতিত্ব প্রচারের জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর আড়ম্বরে সিঙ্গুর দিবস পালন, সিঙ্গুরের অধিকৃত জমি ফেরত, টাটার তৈরি কারখানার শেড, ফ্লোর, রাস্তা প্রভৃতির বিনির্মাণ, কৃষি জমির চরিত্র পরিবর্তনের চরিত্র পরিবর্তন, অন্যদিকে টাটা মোটরসকে গোয়ালতোড়ে জমির প্রস্তাব। এমনও হতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো ফর্মূলা মেনে ৬০০-র অধিক একরে চাষ এবং ৩০০-র অধিক একরে শিল্প, হয়ত টাটারই শিল্প হল। যে রাজ্যে তেলেভাজা, ধূপকাঠি, মিষ্টিও ইনডাস্ট্রি, সেখানে সাপুরজী পালনজীর রিয়েল এস্টেটও তো বড় ইনডাস্ট্রি। তাহলে বুদ্ধবাবু যেটা পারলেন না মমতাদেবী সেটা করে দেখিয়ে দিয়ে বিরাট কৃতিত্ব পাবেন। এটি না হলেও এই শিল্পক্ষরার রাজ্যে সিঙ্গুরের বিনিময়ে টাটা বা সাপুরজীকে অন্যত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ভূমিকায় দেখা যেতে পারে। ইতিমধ্যে অবশ্য অনিচ্ছুক কৃষকদের একাংশকে দিয়ে টাটাকে আহ্বান করা হচ্ছে।

এই রায় কার্যত সিঙ্গুরের সংগ্রামী কৃষক ও গণতান্ত্রিক শক্তির দীর্ঘ আন্দোলনের এক বিশাল জয়। বামফ্রন্টের অন্যায়ভাবে সিঙ্গুরের জমি দখল নিয়ে তখন ছোট ছোট গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তি এবং ছোট বামদল ও মেধা পাটেকরের সংগঠনও লড়াই শুরু করেছেন, মার খাচ্ছেন। মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল প্রবেশের পর তা ব্যাপ্তি পায়, বেচারাম মান্নার মত প্রাক্তন বাম জঙ্গী কর্মীরা সদলবলে তৃণমূলে যোগ দেন। এক্ষেত্রে অন্যদলগুলির কাছে শিক্ষা যে বড় করে, ভালভাবে, লাগাতার ও নাছোরভাবে উদ্যোগ না নিলে সফল হওয়া যায় না। দ্বিতীয় ও প্রধান শিক্ষা যে লাগাতার প্রতিরোধ ও আইনি লড়াই চালিয়ে টাটার মত বৃহৎ অর্থনৈতিক এবং সিপিএমের মত পরাক্রমশালী রাজনৈতিক শক্তিকে পরাস্ত করা যায়। আর তৃতীয় ও আরও বড় শিক্ষা যে বড় বড় তত্ত্ব না কপচিয়ে সাধারণ কৃষকদের উদ্বুদ্ধ, শিক্ষিত ও সংগঠিত করে গণতান্ত্রিকভাবে এতবড় সফল আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। চতুর্থত, সিঙ্গুরের বীরত্বব্যঞ্জক আন্দোলন যেমন নন্দীগ্রাম, জৈয়তাপুর, জগৎসিংহপুর, নিয়ামাগিরির আন্দোলনগুলিকে পথ দেখিয়েছিল। তেমনই সিঙ্গুরের এই রায় বর্দ্ধমান, কাওয়াখালি প্রমুখ জমি ও কৃষক আন্দোলনগুলিকে প্রভাবিত করেই চলবে। পঞ্চমত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই ২০১৬-র শেষেও ভারত প্রধানত একটি গ্রামীণ ও কৃষিপ্রধান দেশ এবং এখনও ৮০ শতাংশের বেশি ভারতীয় গ্রাম, কৃষি আরও নির্দিষ্টভাবে জমির উপর নির্ভরশীল। তেভাগা থেকে

ভাট্টাপারশাল বারবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে সেটাই দেখিয়ে দিয়েছে। তাই জমির প্রসঙ্গ অমীমাংসিত রেখে কৃষি, শিল্প, সমাজ, অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। নরেন্দ্র মোদী গত বছর বিষয়টি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। যার ফলে তাকে তার জমি অধ্যাদেশ তুলে নিতে হল। আলিমুদ্দিনের ঘেরাটোপে এক সময়কার ডাকসাইটে বামনেতৃত্ব কতটা বুঝেছেন জানি না, তবে একদম নীচ থেকে সংগঠন গড়ে তোলা মমতা বিষয়টি ভালই বোঝেন।

২০০৬-'০৮ সিঙ্গুর আন্দোলন এবং ২০০৮-'১৬ আইনি প্রক্রিয়ায় সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হন অনিচ্ছুক কৃষকেরা। এই কয়েকবছরে তাদের অবর্ণনীয় কষ্টের মোকাবিলা করতে হয়। তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করেন। বরং কিছুটা সুবিধা হয় ইচ্ছুক কৃষকদের একটি অংশের যাদের জমির উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না অথবা কলকাতায় বা হাওড়া-হুগলী শিল্পাঞ্চলে থেকে যারা জমি লিজ দিতেন বা বর্গাদারদের দিয়ে চাষ করাতেন। এককালীন থোক টাকা পেয়ে তারা অনেকেই লাভবান হন। এরা ছিলেন মূলত বামফ্রন্টের সমর্থক। আর সবচাইতে বিপন্ন হন বর্গাদার, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুররা যারা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় 'কেউ নন' হয়ে সর্বস্ব হারান। এ বারের রায়েও ধর্মাবতাররা তাদের কোন স্থান দেননি। গণতান্ত্রিক শক্তিকে এদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে। এর সাথে দেখতে হবে টাটা মোটরস ও অনুসারী শিল্পে যে সমস্ত ব্যক্তি পুঁজি ঢেলেছিলেন বা কাজ নিয়েছিলেন এবং পরবর্তিতে কোন অর্থ ফেরত পাননি অথবা কাজ হারান তাদের স্বার্থের বিষয়টি। এর সাথে সাথে দেখতে হবে সত্যি সত্যিই সবাইকে জমি ফেরত দেওয়া হল কিনা? ক্ষতিপূরণ সকলে পেলেন কিনা? জমি কৃষিকাজের চরিত্র অর্জন করলো কিনা? জমিতে কৃষিকাজ শুরু করা গেল কিনা?

সিঙ্গুরের সফল ও ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন গণতান্ত্রিক শক্তিকে আরও উৎসাহিত করল মরিচঝাঁপি, নানুর, করন্দা, বিজনসেতু গণহত্যা সহ তদানীন্তন বামফ্রন্টের অপকীর্তিগুলি আরও উন্মোচনের এবং উপেক্ষিত ও নির্যাতিত উদ্বাস্তু ও কৃষক পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণের। একইসাথে সুযোগ করে দিল সারদা-নারদা সহ চিটফান্ড ঘোটালাগুলি, টেট ঘুষকাণ্ড, সিন্ডিকেট, লালগড়ের আদিবাসী আন্দোলনকারীদের গুপ্তহত্যা প্রভৃতি তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপগুলি উন্মোচনের এবং দোষীদের শাস্তির ও ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের। সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনের যে কোন গণ আন্দোলনের প্রেরণারও কাজ করবেন সিঙ্গুরের কৃষক যোদ্ধারা। তাদের অভিনন্দন। আর এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়েই সবদিক ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সঙ্কটগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প, অর্থনীতির বিকাশের এবং সার্বিক জনমুখী ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

পৃথিবীর সব শিশুই নাস্তিক; আমরাও কেন না হব?

—ভবানীপ্রসাদ সাহু

একটি শিশু যখন জন্মায় তখন সে কোন পূর্ব আরোপিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না। এই বিচারে তার মধ্যে অন্যান্য সব কিছুর মত, ঈশ্বর জাতীয় কোন অতিপ্রাকৃতিক কল্পিত শক্তি সম্পর্কিত কোন বিশ্বাসও থাকে না। তাই তাকে নাস্তিক হিসেবেই গণ্য করা যায়। আসলে সে আস্তিক বা নাস্তিক কোন কিছুই নয়। একইভাবে একটি নবজাত শিশুর শরীরে বিশেষ কোন ধর্মপরিচয়ের চিহ্নও থাকে না। এই বিচারে সে ধর্মপরিচয়মুক্তও।

কিন্তু শিশুটি যখন বড় হতে থাকে তখন চারপাশের বড়রা তথা সমাজ ও রাষ্ট্র তারমধ্যে নানা জ্ঞান ও তথ্য ঢোকাতে থাকে, শিশুটির মস্তিষ্ক বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে থাকে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরু ঈশ্বরবিশ্বাসী ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা ধর্মের অনুসারীরা তার মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কিত একটি অলীক ধ্যানধারণাও ঢোকাতে থাকে। ঠাকুরদেবতা দেখলে প্রণাম করা, পূজা করা, কিংবা গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করা অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নমাজ পড়ার মত নানা কিছু সে শিখতে থাকে, ফলে ধীরে ধীরে একটি 'নাস্তিক' শিশু 'আস্তিক' হয়ে ওঠে। একইভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাবা-মায়ের ধর্মপরিচয় শিশুটির উপর আরোপিত হয়— হিন্দু-খৃষ্ট-ইসলাম ইত্যাদি ধর্ম সম্পর্কে কিছু না জেনেই সে বিশেষ ধর্মের নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হয়। আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এটি ঘটেছে।

ব্যাপারটি কত হাস্যকর তা বাস্তব একটি সম্ভাবনা থেকে বোঝা যায়। এখন হাসপাতালে একসঙ্গে একাধিক প্রসূতি মায়ের সন্তান প্রসব হয়। নবজাত শিশুর ও তার মায়ের শরীরে চিহ্ন দেওয়া হয় মেলানোর জন্য। মনে করা যাক অতি ব্যস্ততার মধ্যে, নার্সের মুহূর্তের ভুলে এক হিন্দু মায়ের নবজাত সন্তানের সঙ্গে এক মুসলিম মায়ের নবজাত শিশুটি পাল্টাপাল্টি হয়ে গেল এবং এভাবেই পাল্টানো শিশুটি পাবেন মায়েরা। তাহলে হিন্দুর পরিবারে আসলে মুসলিম মায়ের সন্তান হিন্দু পরিচয়েই বড় হবে এবং উল্টোটাও। তার কারণ বাবা-মায়ের কোন ধর্মপরিচয়ই একটি শিশুর শরীরে চিহ্নিত থাকে না। চেহারা দেখে কোন নবজাতককেই হিন্দু-মুসলিম-খৃস্টান হিসেবে চেনা সম্ভব নয়— সবাই মানুষ অর্থাৎ

সিঙ্গুর মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের রায় গণআন্দোলনের জয়, কোন দলের জয় নয়

সাথী,

দীর্ঘ আন্দোলনের পর অনেক কৃষকের রক্তের বিনিময়ে রাজ্যের পালা বদলের প্রায় এক দশক কেটে গেছে। আজ দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর সেই জয়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি মনে করে এই জয় কোনও দলের জয় নয়, বরং এই জয় মানুষের জয়। সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন শুধু জমির অধিকারের লড়াই ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার এক দৃষ্টান্তমূলক সংগ্রাম যেখানে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুরদের সাথে সমাজের সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ে যে শুধু অবৈধ জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জয় হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে মানুষের অংশগ্রহণ ও জীবনের বিনিময়ে গণতন্ত্র রক্ষার ঐতিহাসিক লড়াইও স্বীকৃতি পেয়েছে। সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল স্থানীয় উন্নয়নের উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নীতি নয়, বরং মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু সিঙ্গুর আন্দোলনের এত বছর পরেও আজও রাজ্যের উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের অধিকারকে সুরক্ষিত করা যায়নি। উপর থেকে সরকার ও নেতাদের অঙ্গুলি হেলনেই ঝুলে রয়েছে রাজ্যবাসীর ভাগ্য। রায়দানের পর সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীর ২রা সেপ্টেম্বরকেই সিঙ্গুর দিবস হিসেবে বিজয় উৎসব পালনের জন্য বেছে নেওয়ার মধ্যেও রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে বলে মনে করে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি। বর্তমান শাসক দলের এই সিদ্ধান্ত প্রকারান্তরে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করবে এবং এই সিদ্ধান্ত আসলে এক কৃষক আন্দোলনের জয়কে অন্য শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কু-চক্রান্ত। আমরা এই রাজনৈতিক নীচতার নিন্দা করছি। আজকের এই ঐতিহাসিক রায়দানের মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি জমি রক্ষা আন্দোলনের সমস্ত শহিদদের সালাম জানায়।

ধন্যবাদান্তে,

অনুরাধা তলওয়ার ও উত্তম গায়েন

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতির পক্ষে

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

হোমো সেপিয়েনস্। আর ঐভাবে পাল্টাপাল্টি হলে, বড় হয়ে কোন দাঙ্গার সময় হয়তো দেখা যাবে হিন্দু পরিবারে বড় হওয়া আসলে মুসলিম মায়ের সন্তান মুসলিম হত্যা করে বা মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করে, কিংবা তার গর্ভস্থ শিশুকে ত্রিশূলে গেঁথে (যেমন নাকি ঘটেছিল ২০০২-এ গুজরাট দাঙ্গার সময়) হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা গেল বলে বর্বর উল্লাস করবে। অন্তত মূর্তিপূজা করা আর গরুর মাংস না খাক পছন্দ হলে শুয়োরের মাংসও খাবে নির্দ্বিধায়। একইভাবে মুসলিম মায়ের কাছে, আসলে হিন্দুমায়ের পুত্র সন্তান বড় হয়ে নামাজ পড়বে, সুন্নৎ করাবে, নির্দ্বিধায় গোমাংস খাবে ইত্যাদি এবং দাঙ্গার সময় হিন্দু হত্যা করে, হিন্দু রমনীকে ধর্ষণ করে (যেমন ঘটে চলেছে বাংলাদেশে) আল্লার তথা ইসলামের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করার বর্বরতায় মেতে উঠতে পারে।

ঈশ্বর বা আল্লায় বিশ্বাস কিংবা হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ের মত ব্যাপারগুলি যে কত কৃত্রিম তা বোঝা যায় অনায়াস ধর্মান্তরকরণ এবং সব ধরনের অলীক ঐশ্বরিক-ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করার মধ্য দিয়েও। বড় হয়ে যে কেউ তার বিচারবিবেচনা বা কোন বাস্তব প্রয়োজনে, ধর্মান্তরিত হতে পারে। যে ছিল হিন্দু সে হয়তো হয়ে গেল আল্লার উপাসক মুসলিম বা খৃস্টের ভজনাকারী খৃস্টান এবং উল্টোটাও। কিন্তু কেউই মানুষ বা হোমোসেপিয়েনস্ হিসেবে নিজের পরিচয়কে মুছে ফেলতে পারবে না।

আসলে ঈশ্বর-আল্লা-গড জাতীয় বিশ্বাস যেমন আদিম প্রাগৈতিহাসিক মানুষের (নিয়ানডার্থাল আমলের শেষের দিকের) একটি অসাধারণ কল্পনার ধারাবাহিকতা মাত্র, তেমনি হিন্দু-ইসলাম-খৃস্ট জাতীয় সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মও কৃত্রিম— মানুষের তৈরি করা। ঐ নিছক একটি কল্পনা আর কৃত্রিম এই ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে বিভেদ, হানাহানি, মারামারি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীস্বার্থে তা ব্যবহৃত হচ্ছে, নিপীড়িত মানুষ তাকে আঁকড়েও ধরছে আপাত শান্তি আর সান্ত্বনার জন্য। সব মিলিয়ে ভুলে যাওয়া হয় বা শাসকশ্রেণী মানুষকে এই সত্য থেকে ভুলিয়ে রাখে যে, সবার উপরে মানুষ সত্য, হ্যাঁ, ধর্ম ও ঈশ্বরেরও উপরে।

জন্মানোর পর আমরা যখন আস্তে আস্তে বড় হই, তখন প্রয়োজনীয় নানা জ্ঞানও অর্জন করি। একটি শিশুর মস্তিষ্ক খালি মানিব্যাগের মত। এই ব্যাগে সচল পয়সার সঙ্গে অচল পয়সা রাখলে প্রয়োজনের সময় এই অচল পয়সা বেরিয়ে এসে বিপদে ফেলতে পারে। একইভাবে শিশুর মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সঙ্গে হাবিজাবি, কাল্পনিক বা মিথ্যা ধ্যানধারণা ঢোকানোর জন্য সৃষ্টি হয় নানাবিধ কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অজস্র ধরনের অসুস্থতাও। এই ধরনের অচল পয়সার মত, মিথ্যা ধ্যানধারণা ঢোকানোর ফলে বিশেষ সময়ে তার বিপজ্জনক বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তা সে গোমাংস খাওয়ার 'অপরাধে' নরহত্যা করা হোক বা নিজ ধর্মের ধ্বজা ওড়াতে আমেরিকার টুইনটাওয়ার ধ্বংস করা কিংবা আত্মঘাতী জঙ্গির দ্বারা নিরীহ আবালবৃদ্ধবণিতাকে হত্যা করা, যাইই হোক না কেন।

তাই সুস্থ সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার মত অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কিংবা ধর্মপরিচয়ের মত একটি কৃত্রিম বিভেদমূলক বিষয়কেও দূর করা দরকার। অর্থাৎ আমাদের জন্মকালীন নাস্তিকতার মানসিকতাই কাম্য। আমাদের মস্তিষ্ক মানিব্যাগের মত নির্জীব নয়। তাই বড়রা ও তাদের সমাজ শিশুদের মস্তিষ্কে অচল পয়সার মত অলীক ধ্যানধারণা ঢোকালেও পরবর্তীকালে আমাদের অনেকেই 'ঐ' সব 'অচল পয়সা'-কে মস্তিষ্ক থেকে দূর করে ঈশ্বরবিশ্বাসের মিথ্যা ও ধর্মপরিচয়ের মত কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হতে পারি। অর্থাৎ আবার 'নাস্তিক' হতে পারি। এবং সত্যি কথা বলতে বিগত কয়েকদশকে মানবতাবাদী মানবপ্রেমিক মানুষেরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এই কাজই করছেন। আড়াই হাজার বছর আগে গৌতমবুদ্ধ-মহাবীর জৈন-চার্বাক গোষ্ঠীর মানুষজন সহ অনেকেই এই ভারতীয় ভূখণ্ডে তাত্ত্বিকভাবে বেদব্রাহ্মণের বিরোধিতা করে নাস্তিক আখ্যা লাভ করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে গ্রীসেও একই ধরনের দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এখন নাস্তিকতা বলতে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঐ বিশ্বাসকেন্দ্রিক ধর্মীয় পরিচয় থেকে মুক্ত হওয়াকে বোঝায়।

এই হিসেবে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় শতকরা ২০ জন মানুষ (অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনে একজন) নিজেদের নাস্তিক ও ধর্মপরিচয়মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কোন কোন দেশে এঁরা তুলনায় অনেক বেশি। যেমন ইংল্যাণ্ডে। কিছুদিন আগের একটি সংবাদে (দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া; ২৬ মে, ২০১৬) জানা যায়— বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে ও ওয়েলস-এর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৩.৮ জন খৃস্টান, পাশাপাশি শতকরা ৪৮.৫ জন নিজেদের কোন ধর্ম নেই তথা নাস্তিক বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ ঐ দেশে এখন খৃস্টানদের চেয়ে নাস্তিকেরা সংখ্যাগুরু। আর বাকি ৭.৭ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এ প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালে ইংল্যাণ্ড-ওয়েলস এ ধর্মপরিচয়মুক্ত তথা নাস্তিক মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৫ ভাগ। অর্থাৎ পরবর্তী পাঁচ বছরে নাস্তিকের সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়েছে, এবং স্পষ্টত এই সব মানুষদের অধিকাংশই ছোটবেলায় খৃস্টান হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছিলেন ও ঐ ভাবে বড় হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা ঈশ্বর তথা ধর্মবিশ্বাসের অসারতা অনুধাবন করে তা ত্যাগ করেছেন।

নাস্তিকদের কাছে মানবতাই একমাত্র 'ধর্ম'। তাদের কাছে প্রকৃত অর্থেই 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। তাঁরা অলীক ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করা বা ভালোবাসার চেয়ে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন মানুষকেই, নির্ভর করেন মানুষেরই উপর। বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার জন্য অন্য মানুষকে নির্দ্বিধায় হত্যা করা, নিগৃহীত করার কাজটি করেন ধর্মবিশ্বাসীরা তথা ঈশ্বরবিশ্বাসীরা— নাস্তিক বা ধর্মপরিচয়মুক্ত ব্যক্তিরা নন।

তাই সারা বিশ্বে যতই নাস্তিক মানুষের সংখ্যা বাড়বে ততই ধর্মকে কেন্দ্র করে ও ঈশ্বরের নাম নিয়ে বর্বরতাও কমবে। আমাদের দেশে কবে হিন্দুদের চেয়ে (বা হিন্দু-মুসলিম উভয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে) নাস্তিকরা সংখ্যায় বেশি হবেন?

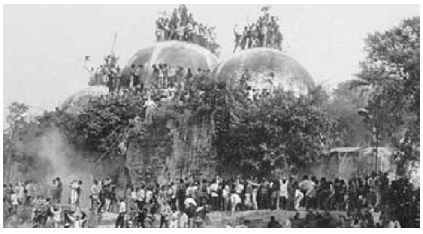

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বাগরাকোটা চা-বাগানের বারোমাস্যা

['মাসুম'-র অনুসন্ধানকারী দলের প্রতিবেদন থেকে, ৮ মার্চ ২০১৬]

প্রতি,

সভাপতি
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন,
মানবাধিকার ভবন,
ব্লক-সি, জি.পি.ও. কমপ্লেক্স, আই এন এ
নয়াদিল্লি-১১০০২৩

মাননীয় মহাশয়,

বাগরাকোটা চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যাতে আপনি সেই বিষয়ে অবহিত হন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন। **এম. এ. এস. ইউ. এম (মাসুম)** একটি উদ্যোগ নিয়েছে সকলকে অবগত করার জন্য সেখানকার সার্বিক অপুষ্টিজনিত সমস্যা, সরকারি পরিষেবার উদ্যোগহীনতা এবং ফলস্বরূপ প্রান্তিক মানুষের বহুবিধ রোগ ও অনাহার জনিত কারণে মৃত্যু এবং বাগান কর্তৃপক্ষ ও মালিকপক্ষের অবহেলার বিষয়ে।

উত্তরবঙ্গ-এর তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের চিত্রাণুরূপ চা বাগানগুলিতে সর্বোৎকৃষ্ট চা উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলেই বিশ্বের উৎকৃষ্টতম এবং সবচেয়ে দামী চা শ্রমিকরা উৎপাদন করে থাকে। তবে এখানকার চা-শ্রমিকরা তাঁদের নিম্নমজুরি, খারাপ মানের রেশন ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ। বাগরাকোটা চা-বাগানটির মালিক কলকাতার 'ডানকান' গোষ্ঠী। এই অঞ্চলে বর্তমানে যা অবস্থা তা পূর্বের সব অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যায়। গত কয়েকমাস আগে মালিকপক্ষ হঠাৎই শ্রমিকদের মজুরি বাকি রেখেই বাগান বন্ধ করে দেয়, শ্রমিকদের কোনো বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করেই। চা-বাগানগুলিতে আজ অন্ধকার নেমে এসেছে এবং শ্রমিক আবাসনগুলিতে রোগ এবং মৃত্যু এক স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। চা-বাগান বন্ধ হওয়ার পর অনাহার এবং অপুষ্টি প্রচুর জীবন নিয়েছে বলে শ্রমিকদের দাবী।

গত ৭ মার্চ, ২০১৬ বিচারপতি সঞ্জীব ব্যানার্জী, কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন মোকদ্দমা (ডব্লিউ পি আই ৮৯৭/২০১৬-২০১৫/২০১৬) -এর পরিপ্রেক্ষিতে মতামত দিয়েছেন যে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি ডানকান গোষ্ঠীর বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের যে সমস্যা তা সমাধানের কথা না ভেবে বিষয়টির রাজনীতিকরণ করছে।

মাসুম তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বাগরাকোটা চা-বাগানে আসে যা জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমায় অবস্থিত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই অঞ্চলে ২৯ অক্টোবর, ২০১৫ তে অপুষ্টিজনিত কারণে বিনা চিকিৎসায় একজন শ্রমিক মারা যান, এবং তাই তথ্য অনুসন্ধানের দল এই অঞ্চলগুলিতে শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের উপর সমীক্ষা চালায় অপুষ্টিজনিত মৃত্যু সম্পর্কে।

ভয়াবহ কিছু তথ্য বেরিয়ে আসে যখন সার্বিকভাবে অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে শ্রমিক পরিবারগুলিতে অনুসন্ধান চালায় দলের সদস্যরা। চা-শ্রমিকরা বলেন— "আমরা পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যু অভিমুখে এগিয়ে চলেছি।" গত কয়েকমাস যাবৎ অর্ধাহারে বাঁচার ফলে আজ প্রায় কয়েকশো শ্রমিক অপুষ্টিতে ভুগছে যা কিনা

ভয়াবহ রোগের জন্ম দিচ্ছে যথা— যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যানিমিয়া, হেপাটাইটিস, রিকেট, বাত, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

দলের সদস্যরা পূর্ণিমা ওঁরাও-এর বাড়ি গেলে দেখতে পান যে তাঁকে প্রচুর কসরৎ করে বাড়ির দোর অবধি পৌঁছতে হচ্ছে। তার শরীরের রক্তের অভাবের ফলে তিনি আজ প্রায় পঙ্গুত্ব লাভ করেছেন। তার পাঁচ ফুটের শরীরটি আজ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল এক লাঠির উপরে। তিনি যক্ষ্মা রুগী। তার ছেলেরাও বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বাগান বন্ধ হওয়ার পর থেকে। তাঁকে ডাক্তাররা সবুজ সব্জি খেতে বললেও তিনি তাঁর জন্যে অর্থের জোগান দিতে পারেন না। তিনি বলেন— "আমি আজ সম্পূর্ণরূপে আমার ছোটো ছেলের উপর নির্ভরশীল, কেননা, কেবল সেই কিছু যৎসামান্য রোজগার করতে পারছে।"

তথ্য অনুসন্ধানকারী দল আবারও বাগরাকোটা চা-বাগানের অনাহারে মৃত্যুর খবর পেয়ে ২৮/১/১৬-তে পরিদর্শনে আসে। তারা মৃতদের পরিবারের সাথে দেখা করতে এবং তথ্য অনাবৃত করার কাজে অগ্রসর হয়।

ঘটনা নং ঃ ১

কাষ্টু ওঁরাও-এর মৃত্যু বিষয়ে কথা বলতে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রেখা ওঁরাও-এর সাথে দলটি দেখা করে। জানা যায় কাষ্টু ওঁরাও, মানু ওঁরাও-এর পুত্র উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা গিয়েছেন, গত ২৪/১/১৬-তে ভোররাত ২টো ৪০ নাগাদ, অপুষ্টিজনিত কারণে। তবে জেলা প্রশাসন অপুষ্টি বা অনাহারকে মৃত্যুর কারণ হিসাবে স্বীকার করতে চায়নি। কাষ্টু ওঁরাও বাগরাকোটা চা-বাগানের আবাসন অংশ নং-২০/১৪-এ তার স্ত্রী এবং বাচ্চাদের সাথে থাকতেন। চা-বাগান বন্ধ হওয়ার পর তিনি এপ্রিল ২০১৫-তে কেরলে শ্রমিকের কাজ নিতে বাধ্য হন। তিনি সেখানে সবার মতনই দৈনিক ১২ ঘন্টা করে শ্রম দিলেও, তার আয় তুলনামূলক স্বল্প হওয়ায় তার জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ নাগাদ আবারও বাড়ি ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর তার পরিবারের কোনো আয় না থাকায়, তারা নিজেদের খাবার অবধি জোগাড় করতে পারছিল না। তারা অর্ধেক মিলও নিজেদের জন্য জোগাড় করতে পারত না এবং তিনি আরও দুর্বল হয়ে পড়েন। গত ২৩/১/১৬-তে তিনি তার অগ্রজের বাড়িতে টাকা ধার করতে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই অচেতন হয়ে যান। তাকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে, তার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পন্ন করেই, চিকিৎসক জানান তার অবস্থা খারাপ হওয়ার

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ফলে যত শীঘ্রই সম্ভব তাকে যেন কোনো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাকে শিলিগুড়ির শান্তি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে, নার্সিংহোম থেকে চিকিৎসা বাবদ ৫০০০ টাকা চাওয়া হয়। তবে আর্থিক সমস্যার জন্যে তারা সে টাকা না দিতে পারায় এরপর তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল হাসপাতালে (রেজিস্ট্রেশন নং ০৪৩২২, মেল-মেডিক্যাল ওয়ার্ড নং ৫) ভর্তি করতে হয় ২৪/১/১৬ তারিখে। তিনি এরপর প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে বলা হয় তিনি ইন্ট্রাসেরিব্রাল হ্যামারেজ-এ মারা গিয়েছেন। রেখা ওঁরাওকে আজ দায়িত্ব নিতে হয়েছে পুরোপুরিভাবে তাঁর বড়ো পরিবারের। রেখা ওঁরাও-এর পরিবারে আজ তিন কন্যা যথা আশা ওঁরাও, উষা ওঁরাও এবং দীপা ওঁরাও, এবং দৌহিত্রী ষ্টিফেন ওঁরাও এবং এক পুত্র কিরণ ওঁরাও, যাদের মধ্যে একজন শারীরিক ভাবে বিকলাঙ্গ। তারা এখন রোজগারের জন্য নিকটবর্তী খাদানে পাথর ভাঙে।

গত ৭/১/১৬-তে শ্রীমতি রেখা ওঁরাও একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেন চা-বাগানের সাব-ডিভিশন অফিসারকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এবং কিছু আর্থিক সাহায্য অনুরোধ করে।

ঘটনা নং ২

২৬ জানুয়ারী, ২০১৫ তে ২টো ২৫— ভোররাতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (রেজিস্ট্রেশন নং ০৩৮৪৮, ফিমেল মেডিকেল ওয়ার্ড) সুষমা টিগ্গা, শ্রী নির্মল টিগ্গার কন্যা, মারা যান রক্তাল্পতা এবং সেপ্টিসেমিয়ায় ভোগার পর। তিনি মারা যান কেননা পেটের যন্ত্রণা অনুভূত হওয়ার পর থেকে মারা যাওয়ার আগে অবধি বাগানের হাসপাতালে তার কোনো চিকিৎসাই হয়নি। কর্তৃপক্ষ জানায় তার মৃত্যুর কারণ বহুদিনের অসুস্থতা।

এটি জানা যায় যে শ্রী নির্মল টিগ্গা পেশায় বন্ধ বাগরাকোটা চা-বাগানের করণিক কর্মচারী ছিলেন। তিনি গত ১১ মাস যাবৎ বাগান এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনোরকম বেতন বা আর্থিক সুবিধা পাননি। নির্মল টিগ্গার বড়ো পরিবারের সদস্য ছিলেন তার স্ত্রী শ্রীমতী বিনজি টিগ্গা, দুই কন্যা সুষমা (প্রয়াত) এবং মঞ্জুষা, তিন পুত্র কিশোর, প্রণাম এবং মার্টিন, তাঁর মা শ্রীমতী বাসন্তী টিগ্গা, তাঁ পুত্রবূ শ্রীমতী মান্‌জা এবং পৌত্র রায়ান। আজ তাদের পরিবার প্রবল প্রতিবন্ধকতায় জীবন যাপন করছে, কেননা আধাসামরিক বাহিনীতে কর্মরত কিশোর টিগ্গা ছাড়া আর কারও কোনো রোজগার নেই। নির্মল টিগ্গা গত ১৮ মাস ধরে নিয়মমাফিক ডায়ালেসিস করে চলেছেন কেননা তার দুটি কিডনি-ই অকেজো হয়ে গেছে। তবে এখন আর কোনো আর্থিক সম্বল না থাকার কারণে তাঁর পক্ষে নিজের চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এর উপর তার স্ত্রীর দৃষ্টির সমস্যা থাকার কারণে তাকে চিকিৎসার জন্য আহমেদাবাদ নিয়ে যাওয়া হয় তবে তাও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি আর্থিক সমস্যার কারণে।

এই ভদ্রলোক নানান সময় কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেও, কোনো সুরাহা পাননি। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারের সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কাছে গত ১২/২/১৬ তে তিনি লিখিত অভিযোগ জমা করেন এবং একইসাথে জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের কাছেও একই অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং প্রার্থনা করেন আর্থিক সহায়তার জন্য।

নিরীক্ষা অনুসারে, চা-বাগানের পুষ্টিকর এবং বিবিধ খাবারের অভাবে এবং মন্দ নিকাশী ব্যবস্থার দরুন এই অনাহার ও রোগে মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে। কেউই এই বিষয়ে কোনো সুযোগ সুবিধা পান না যথা ভর্তুকি দেওয়া রাজ্যসরকারের রেশন, নিরাপদ পানীয় জল বা পরিষ্কার শৌচালয়। সীমিত খাদ্য এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অপুষ্টির কারণ যা তাদের স্বাস্থ্যকে ভেঙ্গে দিয়েছে। সকলেই প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় বসবাস করছে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য অর্থ কারোর কাছে চাই।

বাগরাকোটা চা-বাগানের এই গোষ্ঠীর নেতা, শ্রী লোলেনতোষ লাকড়া বলেছেন যে শ্রমিকরা কাজ করতে চায় এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেই বিষয়ে সহায়তা আশা করেন। তিনি আরও বলেন যে খাবারের স্বল্পতার ফলে, শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তার মতে, মালিকপক্ষই আজ শ্রমিকদের এবং শ্রমিক পরিবারগুলির এই অবস্থার জন্য দায়ী। একজন অভিজ্ঞ শ্রমিকের বক্তব্য অনুসারে মালিকপক্ষের সাথে শাসকদলের সুসম্পর্ক আছে। মালিকপক্ষ আজ ইউনিট বন্ধ করে দিচ্ছে মিথ্যা ক্ষতির গল্প হাজির করে। মালিকপক্ষকে তার জন্য শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্বের সাহায্য নিতে হচ্ছে।

পঞ্চায়েত সদস্যদের সাথে কথা বলা হলে তাঁরা জানান যে, তারা কেবল অসহায় দর্শক এবং তাঁদের চোখের সামনে তাঁদের আত্মীয়স্বজন, পিতা-মাতাকে মারা যেতে দেখছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও রাজ্য বা কেন্দ্র থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

কর্তৃপক্ষের অসংবেদনশীল মনোভাব এই বাগানের সাথে জড়িত মানুষদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। পরিচালন সমিতি বাগান চালিয়ে নিয়ে যেতে এবং শ্রমিকদের বেতন দিতে ব্যর্থ। বাগরাকোটা চা-বাগানের পরিচালন সমিতি, যারা মাঝেমধ্যে বাগান পরিদর্শনে আসেন, তথ্য অনুসন্ধানী দলের সাথে কথা বলতে অস্বীকার করেন।

বাগরাকোটা চা-বাগানের শ্রমিকদের বেতনের মধ্যে কিছু খাদ্যবস্তু ধার্য ছিল পরিচালন সমিতির দ্বারা, তবে চা-বাগান বন্ধ হওয়ার পর থেকে শ্রমিকদের জন্য আজ আর কোনো খাবার বরাদ্দ নেই। কিছু শ্রমিক আজ পাথর ভেঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করছে, তবে বড়ো অংশেরই আজ কোনো কাজ নেই এবং তারা অনাহার এবং অপুষ্টিতে ভুগছে। বয়স্ক, মহিলা, শিশু এবং রোগীদের অবস্থা আজ দুর্বিষহ। ক্ষুধার জ্বালায় বহু শ্রমিক সস্তা খাবার গ্রহণ করছে যা অপুষ্টি, খাদ্য বিষণ (ফুড পয়জোনিং) এবং অন্যান্য ব্যধি সৃষ্টি করে তাদের ধীরগতিতে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যেহেতু বিদ্যুৎ-এর যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ চা-বাগানে তাই আজ শ্রমিকদের বাড়িতে জলের জোগান বন্ধ। বেশীরভাগ শ্রমিকই এখন পাহাড়ি ঝর্ণার জল গ্রহণ করে থাকে। এই ঝর্ণাগুলি ডলোমাইটের উপস্থিতির ফলে দূষিত। আবার উল্টোদিকে এই ঝর্ণাগুলি ব্যবহৃত হয় শবদাহ করার কাজে। পরিদর্শনকারী দলের সদস্যরা এই ঝর্ণার জল পরীক্ষা করে দেখেন যে তা পান করার বা আহারাদির কাজে ব্যবহার করার অযোগ্য।

শ্রমিক আবাসনের ভিতরে জল জমে থাকার সমস্যা থাকায় এবং সাধারণ নিকাশী ব্যবস্থার সুবিধা না থাকার ফলে জল ও পতঙ্গ বাহিত রোগের সম্ভাবনা আছে। পরিদর্শনকারী দলের মতে নিকাশী ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে সারা চা-বাগান জুড়ে যে-কোনো সময় সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। সঠিক শৌচালয় বহু ধরনের রোগকে দূরে রাখতে পারে, কিন্তু শ্রমিক আবাসনগুলিতে তার কোনো সুব্যবস্থা নেই। এছাড়া চিকিৎসাকেন্দ্র বহু দূরে হওয়ার কারণে গ্রামবাসীদের মূলতঃ এনজিও দ্বারা সংগঠিত সাপ্তাহিক চলমান চিকিৎসা শিবিরের উপর নির্ভর করতে হত। জটিল রোগের ক্ষেত্রে এদের শিলিগুড়ি শহরের

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

হাসপাতালগুলির উপর নির্ভর করতে হয়, যার দূরত্ব ৩৫ কিমি। গুরুতর আহত বা ভীষণ অসুস্থ কাউকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই। বহুক্ষেত্রেই এমন হয়েছে যে সন্তান প্রসবের সময় কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকার ফলে গর্ভবতী মহিলাদের মৃত্যু ঘটেছে।

চা-বাগানের স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে বড়ো অংশই মহিলা, কেননা তারাই মূলতঃ চা-পাতা চয়নের কাজে নিযুক্ত। মহিলারাই প্রধান উপার্জনকারী হওয়ার ফলে তারা আজ প্রবল চাপের মধ্যে আছে। বিকল্প কোন রোজগারের সুযোগ না থাকায় এবং দূরত্বগত সমস্যা থাকায়, রোজগারের কোনো উপায় তাদের কাছে নেই। তথ্য অনুসন্ধানী দল বহু পরিবারের সাথেই কথা বলে যেখানে মহিলারাই একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁরা তাদের নিরাপত্তাযুক্ত বরাদ্দ আবাসন ছেড়ে যেতে পারছে না কেননা বহু প্রজন্ম জুড়ে তারা সেখানেই থাকে। বহুবার এমন খবর এসেছে যে গর্ভজাত সমস্যার ফলে মহিলা শ্রমিকরা মারা গিয়েছেন। কিছু গর্ভবতী মহিলা হয়ত শহরের হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে সকলে মিলে সাহায্য করার ফলে, এরকম ঘটনার সংখ্যা বিরল।

আজ চা-বাগানের চা আবাদের সাথে যুক্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। তার বদলে আজ তাদের রান্না করে, নিকটবর্তী নদীর পাশে অবস্থিত খাদানে যেতে হচ্ছে যেখানে তাদের বাবা-মা'রা কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন। পরিদর্শনকারী দল বহু ছেলেমেয়েকে তার বাবা-মার সাথেই পাথর ভাঙ্গার কাজ করতে দেখেছে। এমনিতেই বাগরাকোটা চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরি তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলের অন্য চা-বাগানগুলির থেকে কম। শ্রমিকদের বহু কষ্টে জীবনযাপন করতে হত। তবে, এপ্রিল ২০১৫-এর পর তারা কোনোরকম মজুরি বা অধিবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত।

চা-বাগানের শ্রমিকরা নানান ধরনের সরকারি স্কিমের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত। এইরকম স্কিমগুলি হল, 'এনআরইজিএ', 'ফিনানসিয়াল অ্যাসিসট্যান্স টু ওয়ার্কারস অফ লকআউট ইনডাসট্রিজ', 'ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন', রাজীব গান্ধী শ্রমিক কল্যাণ যোজনা, রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বিদ্যুৎ যোজনা, রাজীব গান্ধী আবাস যোজনা, বিপিএল কার্ড, বেকারত্ব ভাতা ইত্যাদি। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের কোনো রূপায়ণ বাগরাকোটা চা-বাগানে হয়নি। স্থায়ী শ্রমিকদের সবাইকেই বিবেচনা করা হয়েছে কারখানার শ্রমিক হিসেবে, সবাই তালিকাভুক্ত হয়েছে দারিদ্র সীমারেখার উপরে এবং ফলস্বরূপ তারা ইন্দিরা আবাস যোজনার জন্য বিবেচিত নয়।

বহু সংখ্যক পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের এখন তাদের বাড়ি ঘর পরিবার ছেড়ে দূর-দূরান্তরে কাজের খোঁজে চলে যেতে হচ্ছে। শ্রমিকদের মধ্যে বৃদ্ধ অংশকে চা-বাগানেই বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছে। বাইরে কর্মরত শ্রমিকরা তাদের জীবনযাপন করে খুবই সামান্য আয় পাঠাতে পারে নিজেদের পরিবারে, বা বহুক্ষেত্রে কিছুই পাঠাতে পারে না। অবশিষ্ট অংশ আজ সামান্য মজুরিতে পাথর কোড়ানো এবং পাথর ভাঙ্গার কাজ করছে নদী তীরে।

পরিদর্শনকারী দলের অনুসন্ধান থেকে বেরিয়ে এসেছে যে বহু যুবক এবং যুবতীকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পরিচারক/পরিচারিকা-র কাজে নিয়োগের জন্যে। এও জানা গেছে যে যুবতীদের অনেককেই দেশের বিভিন্ন গণিকালয়ে পাচার করে দেওয়া হয়েছে।

বন্ধ বাগরাকোটা চা-বাগানের শ্রমিকরা একসময় চা উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের জীবন অতিবাহিত করত। তবে আজ এই কর্মহীনতা চা-বাগানের শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে প্রভাবিত করছে। কোনো বিকল্প চাকরি বা রোজগার না থাকায় জীবনধারণ এক দৈনন্দিন সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। বন্ধ চা-বাগানের মহিলারা বর্তমানে মৃতপ্রায়, কেননা, সামান্য যে সাহায্য তারা কর্তৃপক্ষ বা নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলি থেকে পাচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই হাজার হাজার প্রান্তিক মানুষের সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় বা পন্থা দেখাতে পারে নি। এই অবস্থায় সমস্যার রাজনীতিকরণ হলেও এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অভাব দেখা যাচ্ছে।

'মাসুম' অনুরোধ জানাচ্ছে যে—

- বন্ধ চা-বাগান পুনরায় খোলা এবং বকেয়া মজুরি শ্রমিকদের দেওয়া হোক। কোনোরকম বিলম্ব না করে না দেওয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুয়িটি মিটিয়ে দিতে হবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণের খাদ্যশস্য চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য মজুত রাখা অনিবার্য, যেহেতু সেখানে অনাহার বা অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এটি খাদ্য সুরক্ষার আইনি ব্যবস্থার আওতায় আনা যেতে পারে।
- বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮-কে কার্যকরী করা।
- চা-আবাদ আইন, ১৯৫১ অনুযায়ী সমস্ত সুযোগ সুবিধা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সুরক্ষা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা সমেত চা-বাগানের শ্রমিকদের দিতে হবে।

- সমস্ত চা-শ্রমিকদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং সমস্তরকম সামাজিক সুবিধা ও জীবনযাপনের সুবিধা দিতে হবে। চা-বাগানের অধিকাংশ শ্রমিকরাই আদিবাসী। আদিবাসীদের জন্য প্রদেয় সুযোগ-সুবিধাগুলি তাদের দিতে হবে।
- চা-বাগানের শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারকে সমস্তরকম চিকিৎসার সুবিধা চলমান হাসপাতাল সমেত দিতে হবে।
- চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শ্রমিক আবাসনের নিকাশী ব্যবস্থা এবং শৌচালয়গুলিকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।
- রেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় ভর্তুকিযুক্ত রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বার্দ্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা প্রকল্পকে সমস্ত চা-বাগানের শ্রকিদের উপর প্রযুক্ত ও প্রণয়ন করতে হবে।

[সংকলন ঃ অনল মূর্মূ; ভাষান্তর ঃ ঋতম রায়]

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধানে

— বিজ্ঞানমনস্ক

২০১৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি একটা গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো, যাতে বলা হলো— বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত দুটো কৃষ্ণগহ্বরকে সংঘর্ষ করতে দেখেছেন, এরপর আবার একীভূত হয়ে যেতে দেখেছেন, এবং এই ঘটনা থেকে পেয়েছেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধান, যে তরঙ্গ কে বিগত ১০০ বছর ধরে খুঁজছিলেন পদার্থবিদরা। আমাদের মহাবিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল মাইলফলক আবিষ্কার। কেন এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ, সেই ব্যাপারে যথাসময়ে আসছি। তবে তার আগেই প্রাথমিক জ্ঞানগুলো সহজ ভাষায় বলে নেওয়া দরকার। আমাদেরকে শুরুতেই জানতে হবে মহাকর্ষ কী। এটা নিয়ে ভালো করে না জানলে ঐ তরঙ্গের বিষয়টি বোঝা যাবে না।

মহাকর্ষ কী?

অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করি— নিউটন বলেছিলেন, সবকিছু একে অপরকে আকর্ষণ করছে এবং এই আকর্ষণ বল হচ্ছে মহাকর্ষ। এই মহাকর্ষ বলের মাধ্যমেই সূর্যের চারপাশে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরছে। কিন্তু কিভাবে, সেটা তিনি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করে যাননি। আইনস্টাইন বললেন, আসলে আকর্ষণের জন্য নয়, মহাকর্ষ কাজ করে আরেকটু ভিন্নভাবে। কিভাবে? সংক্ষেপে, মহাকর্ষ হচ্ছে "স্থান-কাল ব্যাপ্তির মধ্যে একটা বক্রতার প্রভাব।"

স্থান বলতে আমরা ত্রিমাত্রিক প্রাণীরা যা বুঝি, তা হলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমন্বয়। এই তিনটি জিনিস আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এবং এগুলোর মাধ্যমে আমাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণও করতে পারি। মানে, আমরা সামনে-পিছনে (দৈর্ঘ্য) ডানে-বামে (প্রস্থ), আর উপরে-নিচে (উচ্চতা) নড়াচড়া করতে পারি। আইনস্টাইনের মতে সময়ও এখানে আরেকটি মাত্রা হিসেবে কাজ করে। তিনটি মাত্রার স্থান আর আরেক মাত্রা সময়, দুটো মিলিয়ে চতুর্মাত্রিক পর্দা তৈরি হয়, যার নাম 'স্পেসটাইম কন্টিনিউয়াম' বা স্থান-কালের ব্যাপ্তি। আমরা ত্রিমাত্রিক প্রাণী, আমাদের জন্য চারটি বস্তুগত মাত্রা কল্পনা করা অত্যধিক কঠিন। তাই, আসুন আমরা ত্রিমাত্রিকভাবেই চিন্তা করি।

মনে করুন, একটি বিশাল এবং মোটা কাপড়ের পর্দাকে টানটান করে ঘরের চারকোণার খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। ধরুন, এই চাদরটা হচ্ছে স্থান-কালের ব্যাপ্তি। এখানে আপনি যত ভারী বস্তু রাখবেন, তত বেশি বক্রতা তৈরি হবে। আর এই বাঁকের মধ্যে যারা আসে, তারা সেই বাঁকে আটকে যাবে অর্থাৎ, বক্রতার কারণে এখন যা যা ঘটবে, সেটাকেই আমরা মহাকর্ষ বলি। এখন, কম ভরের বস্তুগুলো বেশি ভরের বস্তুর চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরা শুরু করবে। আর এভাবেই মহাকর্ষ কাজ করে, কোনো আকর্ষণের বালাই নেই। আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলেন।

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ কী?

তরঙ্গ প্রধানত দু'প্রকার—

১) অনুদৈর্ঘ তরঙ্গ বা লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ— যেটা এগিয়ে যায় সংকোচন আর প্রসারণের মাধ্যমে। যেমন শব্দ।

২) অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা ট্রান্সভার্স ওয়েভ— যেটা এগিয়ে যায় শীর্ষ এবং খাদের মাধ্যমে। যেমন আলোর তরঙ্গ রূপ, তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ, জলের তরঙ্গ ইত্যাদি।

এই অনুপ্রস্থে শুধু একটি মাত্রা (উচ্চতায়) নড়াচড়ার ফলে তরঙ্গটা আরেকটি মাত্রায় (দৈর্ঘ্যে) এগিয়ে যাচ্ছে। এই দুটি তরঙ্গ দ্বিমাত্রিক তলে দেখানো গেলেও মহাকর্ষীয় তরঙ্গের জন্য ত্রিমাত্রিক চিত্রটা প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে সংকোচন-প্রসারণ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দুটো মাত্রায়, একই সাথে প্রস্থে এবং উচ্চতায়। যখন এই তরঙ্গ কোনোকিছুর মধ্য দিয়ে যাবে, তখন সেই জিনিসটাও এভাবে মুচড়ে যাবে। মোচড়ানোর পরিমাণ অতি সামান্য। এতো সামান্য যে সেটা সনাক্ত করার জন্য আমাদেরকে প্রায় ১০০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এতোদিন আমাদের সেই যান্ত্রিক সক্ষমতাই ছিলো না। এবং এভাবেই এই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে স্থান-কালের ব্যাপ্তিতে, আলোর গতিতে। আমরা জানলাম যে, যে-কোনো বস্তুই স্থান-কালের ব্যাপ্তির বক্রতা তৈরি করে। আর এভাবেই মহাকর্ষ তৈরি হয়। যখন ভরযুক্ত বস্তু স্থান-কালের ব্যাপ্তিতে ভেসে বেড়ায়, তখন এই বক্রতার প্রভাবও কিন্তু সেই বস্তুর সাথে সাথে চলতে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো, কোনো বস্তুর ত্বরণ বা গতিবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। কিভাবে বেড়ে যায়? যখন একটা বিশাল ভরের বস্তু আরেকটা বিশাল ভরের কাছাকাছি আসে। যেমন দুটো কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাক হোল), একটা কৃষ্ণগহ্বর এবং একটা বিশালাকার নক্ষত্র, ইত্যাদি। একটা আরেকটার বক্রতার মধ্যে আটকা পড়ে যায়। একজন আরেকজনকে চক্কর খেতে থাকে, ত্বরণও বাড়তে থাকে। যাই হোক, ত্বরণ বেড়ে গেলে স্থান-কালের ঐ ব্যাপ্তিতে একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, যা ঢেউ আকারে আলোর গতিতে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউকেই বলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ)। প্রথমবারের মত দুটো কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে এমনটি কাজ করতে দেখেছি আমরা। কিভাবে এটা সনাক্ত করা হলো?

লিগো—লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি এই ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত সনাক্ত করতে পেরেছে। কিভাবে?

১৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে, অর্থাৎ ১২৩০ ট্রিলিয়ন মাইলের মত বিশাল এক দূরত্বে দুটো কৃষ্ণগহ্বর একটা আরেকটির সাথে সংঘর্ষ করে একীভূত হয়ে গেলো। দুটি কালো গহ্বরের একটির ভর ছিলো আমাদের সূর্যের ২৯ গুণ, অন্যটি ৩৬ গুণ। সূর্যের ভর চিন্তা করলেই খাবি খেতে হয়। সূর্য আয়তনে অনেক বড় একটা বস্তু, এটিতে অনেক অনেক ভর ধরে। সূর্যের ভরকে ২৯ আর ৩৬ দিয়ে মনে মনে গুণ দিন। এবার চিন্তা করুন, সেই বিশাল ভরের দুটি বস্তু (যদিও আয়তনে অনেক ছোটো, কম জায়গায় বেশি বস্তু নিয়ে গঠিত কৃষ্ণগহ্বর) সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে।

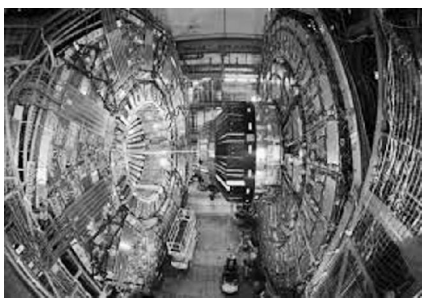

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সংঘর্ষে দুটি মিলে একটি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হলো, যার ভর দাঁড়ালো আমাদের সূর্যের ৬২ গুণ, বাকি ৩ গুণ ভর শক্তিতে পরিণত হলো। এই সংঘর্ষের ঘটনাটি স্থান-কাল ব্যাপ্তির পরিসরে জন্ম দিল মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ আলোর গতিতে, অর্থাৎ ১৩০ কোটি বছর সময় অতিক্রম করে এসে পৌঁছল পৃথিবীতে। এ ধরনের ঘটনাগুলি থেকে যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বের হয়, তা আইনস্টাইনই বলেছিলেন ১৯১৬ সালেই। এরপর থেকে চলছিলো সনাক্ত করার চেষ্টা। আমরা জানি, এই তরঙ্গ স্থান-কালকে মুচড়ে দেবে। অর্থাৎ পৃথিবীতেও আমরা স্থান দেখি, সেই স্থানের সংকোচন-প্রসারণ ঘটবে। আমরা সেই সংকোচন-প্রসারণ বুঝবো না, কারণ সেটা খুব সামান্য।

আর মাপার জটিলতাতে কাহিনী আরো একটি আছে। মনে করুন, আপনার কাছে একটি স্কেল আছে যেটি দিয়ে আপনি বারো ইঞ্চি মাপতে পারেন। এখন বারো ইঞ্চির দুদিকে দুটো খুঁটি পুঁতলেন। এই দুই খুঁটির মধ্যে দূরত্বটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আসার পর বাড়লো নাকি কমলো, সেটা ঐ স্কেল দিয়ে বোঝা যাবে না। কারণ তরঙ্গের কারণে ঐ দূরত্বটা যদি বাড়ে, তাহলে স্কেলেরও ততটুকু প্রসারণ ঘটবে। আপনার কাছে তখন সেটাকে ১২ ইঞ্চিই মনে হবে। মহাবিশ্বের গ্রহণযোগ্য একটি মানদণ্ডই আছে, যা এই তরঙ্গে পরিবর্তিত হবে না। সেই মানদণ্ড দিয়ে আপনি সংকোচন বা প্রসারণ মাপতে পারবেন। সেই মানদণ্ড হচ্ছে আলো। আলোর গতি একই থাকবে এবং আলোর যাওয়া-আসার সময় দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন দূরত্ব কতটুকু। ধরুন, আগে স্থান-১ থেকে স্থান-২ পর্যন্ত যেতে যদি আলোর ০.০০১ সেকেন্ড সময় লাগতো, দূরত্বটা প্রসারিত হলে ০.০০১ সেকেন্ডের চেয়ে একটু বেশি লাগবে।

দৃশ্যপটে এলো লিগো। চার কিলোমিটার লম্বা ইংরেজি এল-আকৃতির সুরঙ্গ বানালেন বিজ্ঞানীরা। সুড়ঙ্গের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় তারা লেজার ছুঁড়ে মারলেন। এরপর অন্য মাথায় গিয়ে সেটা ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগে, সেটা বিচার করে দেখলেন যে আসলেই দূরত্বটা এখনো ৪ কিলোমিটারই আছে না পরিবর্তিত হয়েছে। যদি সময় কমবেশি লাগে, তাহলেই বোঝা যাবে যে স্থান মুচড়ে গেছে, সংকোচন-প্রসারণ হচ্ছে। এক মাত্রায় (ধরুন ডানে-বামে) যদি প্রসারিত হয়, তাহলে অন্য মাত্রায় (সামনে-পিছনে) সংকুচিত হবে। অর্থাৎ এল-এর এক বাহুতে আলো যেতে বেশি সময় নেবে, আরেক বাহুতে আলো যেতে কম সময় নেবে। দুটিই মিলে যাবার কথা।

কতটুকু সংকোচন বা প্রসারণ হয়েছিলো? একটি প্রোটনকে ১০ হাজার ভাগে ভাগ করলে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, ততটুকু পরিমাণ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য যদি আপনি মাপতে পারেন, তাহলে আপনি এই সংকোচন আর প্রসারণ মাপতে পারবেন। আরেকটি উদাহরণ দেই— ধরুন, আপনার কাছে এক বিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার লম্বা একটা ট্রেন আছে। সেটার মধ্যে যদি মাত্র ৫ মিটার লম্বা আরেকটি কোচ লাগাতে হয়, তাহলে দৈর্ঘ্যের যেমন পার্থক্য হবে, সেটা আপনাকে মাপতে পারতে হবে। অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র ছাড়া এই পার্থক্য মাপা সম্ভব নয়।

মাপার মধ্যে আরেকটি সমস্যা তো ছিলোই, সেটি হল অন্যান্য তরঙ্গ। যে কোনো জিনিস, যার আয়তন আছে, অথবা যার তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রার ওপরে, সেটাই কাঁপে, সর্বদাই কাঁপছে। এগুলোকে যন্ত্রের হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে। তারপর অন্যান্য তরঙ্গ আছে, সেগুলোকেও বাদ দিতে হবে। তার ওপর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কোনরকম কিছু ঘটল কি না, তাও দেখতে হবে। তাই, এই ধরনের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বানানো হলো দুটি। একটি যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানাতে, আরেকটি চার হাজার কিলোমিটার দূরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। নিশ্চিত

হবার জন্য দুটো পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের একই পরিমাপ পেতে হবে।

২০০২ থেকে ২০১০ পর্যন্ত লিগো'র তথ্য সংগ্রহের প্রথম পর্যায় চলেছিল। কিন্তু কোনো উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়নি। এরপর ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অনেক যান্ত্রিক ত্রুটি সারালেন। এই ত্রুটি সারাতে, সংবেদনশীলতা বাড়াতে, ৫ বছরে খরচ হয়েছিল প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার। ২০১৫-এ যখন তথ্য সংগ্রহের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো, তখন তারা প্রায় সাথে সাথেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা আসলেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ কিনা, সেটা নিয়ে আবার পরীক্ষা চলতে লাগলো। অবশেষে ২০১৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে তারা নিশ্চিতভাবেই এই কৃষ্ণগহ্বর সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। শুরু হল গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ লেখার কাজ। গবেষকদের বিশাল দল ফিজিকাল রিভিউ নামক গবেষণা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ জমা দিলেন ২০১৬ সালের জানুয়ারির ২১ তারিখে। সেই প্রবন্ধ প্রকাশনার জন্য নির্বাচিত হল ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ। সেই প্রবন্ধে একটি রেখাচিত্র (গ্রাফ) আছে, যেখানে দুই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রতেই একই ফলাফল পাওয়ার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই তরঙ্গ আবিষ্কার হওয়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? প্রত্যেকটি তরঙ্গ আমাদেরকে নতুন কিছু শেখায়। প্রথমে আমরা শুধুমাত্র চোখের দেখাতে যা যা দেখা যায়, তাই দেখতাম। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলি ধরা পড়ে, সেই দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গকেই দেখতাম। এরপর যখন অবলোহিত (ইনফ্রারেড), অতিবেগুনী (আলট্রাভায়োলেট), বেতার (রেডিও) এমন তরঙ্গগুলি আবিষ্কৃত হল, আমাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে গেল। আর সেগুলোর প্রভাব নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবে না। আর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তো একেবারে আলাদা এক ধরনের তরঙ্গ। এই তরঙ্গ ব্যবহার করে যে সামনে আমরা কী কী দেখব, তা এখন অনুমানও হয়তো করা যাচ্ছে না। একদম কম করে বললেও, আমরা বুঝতে পারবো— আমাদের এই মহাবিশ্ব কিভাবে কাজ করে, মহাকর্ষ কিভাবে কাজ করে। এটি জন্ম দিয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার একদম নতুন একটি শাখাকে। হয়তো একদিন এটির মাধ্যমেই আমরা মহাকর্ষকে কাজে লাগাতে শিখব। মহাকর্ষকে যদি কাজে লাগানো যায়, কোনোভাবে যদি স্থান-কাল ব্যাপ্তির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যায়, তাহলে কী হবে, আন্দাজ করতে পারছেন? হয়তো আমরা ওয়ারমহোল বা কীটগহ্বর তৈরি করতে পারবো, আলোকবর্ষ ভ্রমণ করতে পারবো মুহূর্তের হিসেবে।

স্টিফেন হকিং একটা মন্তব্য করেছেন এই আবিষ্কারটি প্রকাশিত হওয়ার পর। তিনি বলেছেন বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রাকে পাল্টে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই ধরনের বিশাল আবিষ্কার আমাদের জীবদ্দশায় আবার হবে কিনা, তা বলা বেশ মুশকিল। এটিই হয়তো আপনার আর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান ভিত্তিক মুহূর্ত— এতটাই বিশাল এই আবিষ্কার।

[কৃতজ্ঞতা ঃ **সমীক্ষণ**]

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বৃহৎ পুঁজির বিস্তারের প্রেক্ষিতে বামপন্থার পতন ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ঃ একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

—বাপ্পাদিত্য রায়

■ **উপক্রমণিকা ঃ**

অরিজিৎ এক শহুরে শিক্ষিত বামপন্থী পরিবারের যুবক। সে নিজের যোগ্যতায় সরকারি চাকরি পেয়েছে। সে সৎ ও দক্ষ, কিন্তু অলস ও আবেগপ্রবণ। বর্তমান মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে হিমশিম, তাই তার প্রার্থনা মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধি ও নতুন পে-কমিশনের অনুকূল সুপারিশ। গত পাঁচ বছরের তৃণমূল শাসনের তোলাবাজি-সিন্ডিকেট, মহিলা ও বিরোধীদের উপর অত্যাচার, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের দলদাসে পরিণত হওয়া, নেতা-নেত্রীর অকথা-কুকথার ছড়াছড়ি প্রভৃতি দেখে সে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিল। সে মনে প্রাণে চেয়েছিল তৃণমূলের পরাজয়। তাই কংগ্রেস-সিপিএম আসন ভাগাভাগির 'জোট', সারদা-নারদা সহ যাবতীয় তৃণমূলী কেচ্ছা নিয়ে যখন আনন্দবাজার সহ বাজারি পত্রিকাগুলি উত্তাপ ছড়াচ্ছে সে প্রবল আশান্বিত। যখন তৃণমূলের 'তাজা ছেলেরা' তাদের মত করে প্রচুর পরিশ্রম করে প্রচার করছে, বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে; যখন তাদের সর্বোময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একার কাঁধে সব দায়িত্ব তুলে নিয়ে সর্বাঙ্গীন বিরোধিতা, বিরোধী প্রচার ও প্রবল চাপ সামলে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সাঙঘাতিক দাবদাহের মধ্যে তিনমাস ধরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছেন এবং উন্নয়ন, কাজ ও তাদের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন, তখন জোটনেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জিপে চড়ে হাত নাড়ানোর একটি মিছিলে হাঁটা ছাড়া সে কিছুই প্রায় করে নি। অথচ বাজারি সংবাদ-মাধ্যম ও আলিমুদ্দিন সৃষ্ট গুজবের উপর, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা ও 'জোটে'র মুখ অধীর চৌধুরির আস্ফালনের উপর নির্ভর করে 'জোটে'-র বিজয়ের কল্পনার জাল বুনেছে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অভাবনীয় বিশাল জয় পেলেন এবং 'জোট', নির্দিষ্টভাবে বামফ্রন্টের বড়দা সিপিএম, যখন একেবারে পর্যুদস্ত হল সেও ভয়ানক মুষড়ে পড়ল। এরকম চিত্র রাজ্যের প্রায় সর্বত্র। সেইসব অরিজিৎদের জন্য এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ।

■ **আপেক্ষিক মূল্যায়নের সন্ধানে ঃ**

এই মহাবিশ্বে শুরু থেকেই জীবনচক্রের অনুকূলে প্রকৃতির নিজস্ব কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী বান্ধব নিয়ম ছিল। তাই বৃহৎ দুর্যোগগুলি অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে বিবর্তন ও অভিযোজন ঘটিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ বেঁচে থাকল ও বেড়ে চলল সুদীর্ঘকাল ধরে। যার কিছু নমুনা আজও পাওয়া যায় লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল ও পেরুর আমাজন অববাহিকায়, কোষ্টারিকা ও ইকুয়েদরের বৃষ্টি অরণ্য ও দ্বীপমালায়, আফ্রিকার রিফট্ ভ্যালির ও বিষুব অঞ্চলের গহন অরণ্যে কিংবা কালিমান্তান, সারাওয়াক প্রভৃতি এশিয়ার ঘন সবুজ অরণ্য-পাহাড়ে। প্রায় সবশেষে আসা সর্বভুক ও সর্বগ্রাসী অথচ নির্ভীক ও বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষের লোভ করে দিল সব কিছু তছনছ এবং বিপন্ন।

মানুষ নিজের স্বার্থেই আনল নানারকম পদ্ধতি আর নিজের স্বার্থেই এগুলি ভেঙ্গে চলল। চিন্তার জগতে কোনও কিছু চিরস্থির থাকে না। তাই নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক-জৈব-আর্থ-সামাজিক কারণেই গোষ্ঠীতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণ-প্রজাতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সমাজতন্ত্র, সমাজগণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র, পুঁজিবাদোত্তর বহুজাতিক নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন, নব উপনিবেশ প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। প্রতিটির ভিতরেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক শক্তিগুলির পরিসর আছে যা আপেক্ষিক পরিস্থিতির উপর মূল্যায়িত।

কেবলমাত্র খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, যৌনতা, প্রজনন সহ কয়েকটি জৈবনিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব, রিরাংসা সংঘর্ষ ছাড়া প্রাণী বা আদিমানব সমাজে ছিল অপার স্বাধীনতা। পরে উপরোক্ত তন্ত্রগুলি তৈরী করে ক্ষমতাসীন মানব গোষ্ঠীগুলি কায়েম করেছিল তাদের গোষ্ঠী বা শ্রেণী বা ব্যক্তির আধিপত্য, অন্যদের দমন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণী কোন কোন ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু উন্নয়নের বা জনহিতকর কাজ করে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। দেখা গেছে কোন স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসক বা ব্যবস্থাপনা অর্থনীতি, শিল্প সংস্কৃতি, পরিকাঠামো গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত কাজ করে গেছে, আবার গণসমর্থনের জোয়ারে আগত অনেক প্রগতিশীল ব্যবস্থাপনা, শাসক বা সরকার হয়ে রয়ে গেছে কাজ না করার, দুর্নীতির, স্বজনপোষণ বা জনবিরোধী নীতিনির্ধারণের উদাহরণ। তাই কোন ব্যবস্থাপনার সব যেমন সঠিক ও সুন্দর নয়, তেমনই কোন ব্যবস্থার সবকিছুই খারাপ নয়। অর্থাৎ রুশ দুমায় বামদিকে বসত বলে সমাজতন্ত্রীদের উত্তরসূরীরা সব ঠিক করেছেন এমনটা যেমন ইতিহাস বলে না, তেমনিই দুমার ডানদিকে বসা দক্ষিণপন্থীদের বংশধররা সবকিছুর ক্ষতি করেছেন এরও কোন প্রমাণ নেই। দক্ষিণপন্থার আধারে থেকে সুইজারল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, নিউজিল্যাণ্ড, কোষ্টারিকার মত পরীক্ষিত জনকল্যাণকারী সুখী শান্তিপ্রিয় ও সচ্ছল দেশ গড়ে উঠেছে। তেমনই

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবনায় চীন-রাশিয়ার মত পশ্চাৎপদ দেশ হয়ে উঠেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অতি শক্তিশালী কিংবা কিউবা-ভিয়েতনাম ঘটিয়েছে ধারাবাহিক উন্নতি। আবার একদিকে দক্ষিণপন্থা চূড়ান্ত নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে হয়েছে উগ্রজাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ অথবা ফ্যাসিবাদ। অন্যদিকে বামপন্থা অতি উগ্রতা নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ত্রাসবাদ বা নৈরাজ্যবাদে কিংবা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে।

■ সত্য রে লও সহজে ঃ

সহজবুদ্ধিতেই বোঝা যায় এই ২০১৬তে বিশ্বজুড়ে নেই কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আবহ আর ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতি। বিপরীতে বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদোত্তর মার্কিন সামরিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ন্যাটো জোট আজকে মহাশক্তিধর, সর্বগ্রাসী, সর্বশক্তিমান বহুজাতিক বৃহৎ পুঁজির কর্পোরেট সংস্থাগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অমিত শক্তিধর লগ্নী পুঁজি ও তার বিশ্বায়িত বাজার, অতি উন্নত প্রযুক্তি তার সঙ্গে প্রবল সামরিক শক্তির প্রভাবে দুনিয়াটাকে করে রেখেছে পদানত। ভারতে তাদেরই প্রতিনিধি অর্থাৎ শাসক শ্রেণী (ক্রনি পুঁজিপতি, সামন্ত প্রভু, পুঁজিবাদী কুলাক) তাদেরই রাজনৈতিক দলগুলির (কেন্দ্রে বিজেপি ও কংগ্রেস, রাজ্যে রাজ্যে অকালী, সপা, বসপা, জেডি-আরজেডি, টিএমসি, অগপ, বিজেডি, টি ডি, এ আই ডি এম কে, ডি এম কে, এন সি পি, শিবসেনা প্রমুখ) এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের (সংসদ, নর্থ ও সাউথ ব্লক, নীতি আয়োগ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আমলাতন্ত্র, সামরিক-আধাসামরিক-পুলিশ বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা, সংবিধান, ধর্মগুরু, মিডিয়া, মাফিয়া, সমাজবিরোধী প্রভৃতি) সাহায্যে বাহ্যিক গণতন্ত্রের নামে এক জনবিরোধী, শোষণ, বৈষম্য ও দমনমূলক বৃহৎপুঁজির একাধিপত্য চালাচ্ছে যেখানে সাধারণ মানুষ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা-মূল্যবোধ-সংস্কৃতি এবং প্রতিটি প্রাণ, জল, জঙ্গল, জমি, নদী, পাহাড়, খনি, উপকূল, সমুদ্র, ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, জনজাতি, গ্রাম, সমাজ সবকিছুই আক্রান্ত, বিপন্ন ও অসহায় শিকার।

বিষয়টি একভাবে ও একদিনে হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক একটি ভুল, বিপরীত যা ক্ষতিকর চিন্তা, ব্যবস্থা ও প্রয়োগ যেমন তাকে সাময়িক বাধাপ্রাপ্ত করেছে তেমনই মানুষের মস্তিষ্কজাত মণীষা, সারস্বত চর্চ্চা ও নিরলস অনুশীলন চিন্তা, ব্যবস্থা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে যুগান্তকারী উদ্ভাবন, ব্যাপক অগ্রগতি এবং চমকপ্রদ উল্লম্ফন। আধুনিক যুগের সূচনায় কনস্টানটিনোপোল, রোম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ইউরোপের রেণেসাঁ এবং ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবোত্তর শিল্প পুঁজির চরম বিকাশ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পের প্রতিটি শাখাকে প্রচণ্ডভাবে সমৃদ্ধ করে। আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণাটি সুসংবদ্ধ হয়। চিন্তার জগতে ভোলতেয়ার-রুশোদের সমাজবীক্ষা ফরাসী বিপ্লবের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। হেগেল, ফয়েরবাখ, সোপেন হাউয়াররা তার দার্শনিক ব্যপ্তি ঘটান। মতবাদের ক্ষেত্রে বাকুনিন, প্লেখানভ, ট্রটস্কি, বুখারিন, রোজা লাক্সেমবুর্গ, দিমিত্রভ, গ্রামসিরা নতুন মাত্রা যোগ করেন। মহামতি মার্কস পুঁজির বিশ্লেষণ করে অর্থনীতির গতিপথের সন্ধান শুধু নয় মানবেতিহাসের মূল্যায়ন করে সমাজ পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করেন এবং নতুন নির্ণায়ক সামাজিক শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের আগমনী ধ্বনি শোনান। তাঁর সহযোদ্ধা এঞ্জেলস্ ডারউইন ও মরগ্যানকে অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করান সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস। জার্মানীতে উপর্যুপরি ব্যর্থতা সত্ত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারী কমিউন (১৮৭১ খ্রীঃ) থেকে বিংশ শতাব্দীর রুশ বিপ্লব (১৯১৭) পর্য্যন্ত পৃথিবীর আকাশ মুখরিত ছিল ফলিত সমাজতন্ত্রের বলদর্পী পদধ্বনিতে। এর পাশাপাশি বড় ঘটনা ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, হেমার্কেট সহ শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন ও ক্রীতদাস প্রথা রদ, নির্বাচন, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার সম্পদ ও বাজার আবিষ্কার।

■ বিংশ শতাব্দীর নবতরঙ্গ ঃ

এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-'১৮) থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-'৪৫) পর্যায় জুড়ে প্রধান যে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে সেগুলি হল ঃ

(ক) ইউরোপীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির একদিকে আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও উপনিবেশ গঠন, অন্যদিকে উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধ ও সশস্ত্র গেরিলা প্রতিরোধ আন্দোলন অথবা জন আন্দোলন;

(খ) পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সঙঘর্ষ ও সাম্রাজ্যবাদী ভাগ-বাটোয়ারার যুদ্ধ;

(গ) পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সাথে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ;

(ঘ) রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠন, লেনিনবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়জয়কার। আবার পরবর্তীতে স্তালিনিয় অধিবিদ্যক, সর্বগ্রাসী ও রেজিমেন্টেড ব্যবস্থাপনা গঠন এবং অতি বৃহৎ শক্তি হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আত্মপ্রকাশ;

(ঙ) জার্মানীতে জার্মানদের যুদ্ধে হার, তদজনিত সঙ্কট, তারপর সমাজতান্ত্রিক ও সমাজগণতন্ত্রী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর হিটলার ও ফ্যাসিবাদের জন্ম ও শক্তিবৃদ্ধি। লগ্নি পুঁজির বাড়বাড়ন্ত, ব্যাপকহারে প্রতিদ্বন্দ্বী ঈহুদী নিধন, বিশ্বজুড়ে নাৎসী অক্ষ বাহিনীর ক্রমাগত আগ্রাসন, ভয়ানক যুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পতন;

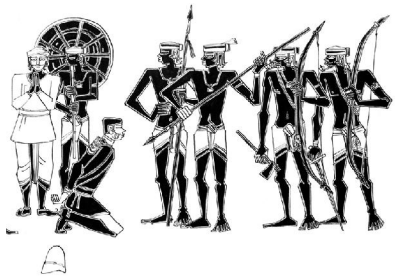

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

(চ) এরপর পরই মহাশক্তি ও বিশ্ব পুঁজিবাদের নেতা হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরণ; সামরিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে জার্মানী, জাপান ও ইতালির পতন;

(ছ) পূর্ব ইউরোপের মুক্তিত্রাতা ও বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দীপক, সাথে সাথে মার্কিনের প্রধান প্রতিযোগী ও বিরোধী হিসাবে দ্বিতীয় সামরিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে ইউ.এস.এস.আর.-এর উঠে আসা;

(জ) এশিয়ার ঘুমন্ত দানব চীনের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব;

(ঝ) হিন্দু-মুসলমান-শিখ দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, যুদ্ধ ও তেভাগার কৃষক আন্দোলনকে নিষ্ঠুর দমনপীড়নের আবহে ভারতের 'স্বাধীনতা' প্রাপ্তি অথবা ব্রিটিশের 'ক্ষমতা হস্তান্তর' তাদের তাঁবেদার ভারতীয় বড় শিল্পপতি, বড় জমিদার ও তাদের সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসকে।

■ সমাজতন্ত্রের পতন ঃ

এই পর্বেই সোভিয়েত গঠনের প্রথম পর্যায় থেকে লেনিনীয় ধারণার অতিকেন্দ্রিকতা এবং তাঁর অকালমৃত্যুর পর সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বর ও মতামতকে গুড়িয়ে নিকেশ করে; পার্টি, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সমস্ত পরিসরকে একীকৃত করে এবং সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে যে একমাত্রিক স্তালিনীয় চিন্তা ও অনুশীলনের সূত্রপাত তা প্রাথমিকভাবে উৎপাদিকা শক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটালেও একমাত্রিক অতিবৃহৎ রাষ্ট্রগঠনের ও বিশ্বজুড়ে তার উপরাষ্ট্র গঠনের নিরন্তর সাধনা, পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সিপিএসইউ ও তার তাঁবে থাকা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালকে ক্রমশ বিকৃতির দিকে ধাবিত করে। তাই একদিকে দেখা যায় বিশ্বজুড়ে সামরিক দ্বন্দ্বে, মহাকাশ যাত্রায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গোয়েন্দাগিরি, ওলিম্পিক আসরে মার্কিনকে টক্কর দিয়ে তাক লাগানো সাফল্য; অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে দুর্ভিক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, জনজাতির বিক্ষোভকে কঠোরভাবে চেপে যাওয়া বা দমন এবং হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন সীমান্তে এবং আফগানিস্তানে ফৌজ পাঠানো। স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভীয় পুঁজিবাদী চিকিৎসা তার রোগ সারাতে পারেনি। ব্রেজনেভের কঠোর শাসনে ধুকতে ধুকতে গোর্বাচভের সময় তার সলিল সমাধি, তার পরপরই তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়তে থাকে তার ইউরোপীয় উপরাষ্ট্রগুলি একবিংশ শতাব্দীর ৮০-র দশকের মধ্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ও রুশ বিপ্লবের সময় থেকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক মডেলের উত্থান আর একইসাথে পতনের সূচনা। ভারতের মাটিতে সিপিআই ও সিপিআইএম সহ প্রচলিত বামদলগুলি রুশ মডেলকেই মূলত অনুসরণ করে এসেছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক মডেলের পতনের সাথে সাথে এদের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী ছিল।

■ পুঁজিবাদের উত্থান ঃ

অপরদিকে ফরাসী (১৭৮৯-'৯৯), আমেরিকান (১৭৭৫-'৮৩ খ্রীঃ) ও রুশ বিপ্লব সহ বড় বড় ধাক্কা খেয়ে এবং দুই বিশ্বযুদ্ধ ও হিটলারি আক্রমণের শিক্ষা নিয়ে ব্রিটেন ও মার্কিনের নেতৃত্বে বিশ্ব পুঁজিবাদ নতুন পরিস্থিতিতে টিকে থাকার ও বিস্তারের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, রদবদল ও সংস্কার ঘটায়। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ—

(১) চিন্তার জগতে মূল্যবোধের অবসান, স্থিতিস্থাপকতা ও প্রয়োজনবাদ।

(২) ঔপনিবেশিক শোষণ ও আত্মসাৎ-কে আরও নিপুণ করে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র মত সংস্কার এনে কৃষি জমি ও উৎপাদনের দখল, কৃষকদের ভূমিদাস করা, ভৃত্যবৎ স্থানীয় সামন্ত শাসক সৃষ্টি, অতিমুনাফা এবং উপনিবেশগুলিতে তাঁবেদার স্বৈর শাসক বসিয়ে সরাসরি উপস্থিতি ও খরচ কমিয়ে আনা (ডিকলোনিয়ালাইজেশান)।

(৩) নব উপনিবেশগুলিতে সমস্ত বিভাজন এবং সামন্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল শৃঙ্খলগুলি (ধর্মীয় মৌলবাদ, দাসপ্রথা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জনজাতির বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ, জাতপাত, কৌমপ্রথা, পর্দাপ্রথা, পুরুষ জাত্যাভিমান, স্বৈরাচার, যুদ্ধ, দমনপীড়ন ইত্যাদি) সাধারণভাবে বাড়িয়ে তোলা এবং উপরিসৌধগত কিছু বাহ্যিক সংস্কার ও শ্রেণী সমঝোতা করে ও এক সুবিধাবাদী ভোগী দুর্নীতিগ্রস্ত এলিট তাঁবেদার শাসকশ্রেণী তৈরী করে তাদের লুঠ, শোষণের ব্যবস্থাপনাকে অটুট রাখা।

(৪) নিজেদের দেশের মাটিতে বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণ, পাশাপাশি বিরোধী মত ও কণ্ঠস্বরকে দমন ও আত্তীকরণ ঘটিয়ে উৎপাদিকা শক্তির ব্যাপক অগ্রগতি।

(৫) উন্নত সমাজতান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং ইহুদী, ইউরোপীয়, এশীয় মেধা ও এশীয়-আফ্রিকান-লাতিন আমেরিকান-স্থানীয় জনজাতির শ্রমকে আত্তীকরণ।

(৬) ডিমাণ্ড ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান, সাধারণের তাৎক্ষণিক চাহিদাপূরণ এবং জনরোষ নিয়ন্ত্রণ।

(৭) জনপ্রিয়তাবাদের (পপুলিজম) প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে গরীব-মধ্যবিত্ত সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যেও গণভিত্তি গঠন।

(৮) প্রজাকল্যাণকারী রাষ্ট্রের সৃষ্টি যেখানে কর্মসংস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবীমা, শিক্ষা, আবাসন, জীবনবীমা প্রভৃতির ব্যবস্থা, পরবর্তীতে এগুলি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চিতকরণ।

(৯) ইউনিভার্সাল সাফ্রেজ অথবা ভোটাধিকার প্রদান এবং সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় গণতন্ত্রের সৃষ্টি।

(১০) বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের জাল বিস্তার; লাতিন আমেরিকা-আফ্রিকা-এশিয়ার সমস্ত প্রাকৃতিক, শ্রম ও মেধা সম্পদ এবং বাজারের দখলদারি; অতি মুনাফা ও লগ্নী পুঁজির সুবিধাজনক প্রবাহ এবং সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের মুঠিতে আনতে বিশ্বায়ন।

(১১) দেশের মধ্যে এবং অন্যত্রও ভোগ্যপণ্যের ব্যাপক প্রবাহ, চোখ ধাঁধানো উপরিসৌধগত উন্নয়ন, বাজার অর্থনীতির বিকাশ, মুনাফা অর্জন ও ভোগবাদের প্রতি মানব জাতির আকর্ষণ বৃদ্ধি, ব্রেন ড্রেইন ও

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

শ্রম- অভিভাসনে উৎসাহদান, ভাড়াটে যুদ্ধ, তথ্য প্রযুক্তি সহ বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ।

(১২) এসবের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদোত্তর সমাজব্যবস্থা, বৃহৎপুঁজি এবং অতিক্ষমতাবান বহুজাতিক কর্পোরেটের অভ্যুদয়।

■ ধীরপ্রবাহিনী গঙ্গা ঃ

ভারতের মাটিতে ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে কেন্দ্রে কংগ্রেস, জনতা দল, বিজেপি শাসনে এবং রাজ্যগুলিতে এই সর্বভারতীয় দল, আঞ্চলিক দল ও জোটগুলির রাজত্বকালে এই অভিব্যক্তিগুলিই বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সীমিত রূপ নিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। বাহ্যিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র, পাঁচ বছর পর পর ভোট, সাংবিধানিক অধিকার, প্ল্যানিং কমিশন থেকে নীতি আয়োগ, সুপ্রীম কোর্ট, সংসদ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রভৃতিকে নিয়ে ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরে অমীমাংসিত জমির প্রশ্ন, অতিশোষণ ও অত্যাচার। উচ্ছেদ, অভিবাসন, শ্রম শোষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ, পুঁজির বিকাশ, বাজারের বিস্তার ও শ্রমের সুলভতা। ধর্মীয়-জাতপাত-জনজাতি-কৌম বিভেদ বৃদ্ধি ও সঙঘর্ষ, মহিলা-দলিত-আদিবাসী-প্রান্তিক-সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, গণতন্ত্র ও বিরোধী মতামত হরণ। উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও ইসলামি মৌলবাদ। সমৃদ্ধ-আত্মনির্ভর গ্রাম সমাজ ও অর্থনীতিকে ধ্বংস, সবকিছুর পণ্যায়ন। চিন্তার জগতে শূন্যবাদ, নেশা, বিকৃতি। সাংস্কৃতিক জগতে ভোগবাদ। হোয়াইট কালারড শ্রমিক কর্মচারী-প্রযুক্তি কর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি, পরিবারের ধ্বংস, অপরাধ বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ। গণ আন্দোলনের উপর অত্যাচার, দুর্নীতি, আমলাতন্ত্র, স্বজনপোষণ.... এইসব। অন্যদিকে এই ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক-উত্তর ও বর্তমান নয়া উপনিবেশিক শাসনকালে গত এক শতাব্দীতে রেল, সড়ক, জল, আকাশ, অন্তর্জাল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘটেছে অভাবনীয় উন্নয়ন; কৃষিতে সঙ্কট থাকলেও অতিফলনের ফলে খাদ্য সঙ্কট, দুর্ভিক্ষ ও অনাহার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে; চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, কমেছে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার এবং মহামারীগুলি এসেছে নিয়ন্ত্রণে। বেড়েছে কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয় ক্ষমতা এবং নির্বাচনের ক্ষমতা।

■ পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজত্ব ঃ

এই বিশাল সময় ও ব্যাপ্তি জুড়ে একেকটি ঘটনা পৃথক বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তথাপি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, জরুরি অবস্থা ও জরুরি অবস্থা অবসানে ভারত জুড়ে গণআন্দোলন, জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকার, জম্মু-কাশ্মীর এবং নাগাল্যাণ্ড-মণিপুরের ধারাবাহিক অশান্তি

ও আন্দোলন, অসমের জনজাতি আন্দোলন, পাঞ্জাব-হরিয়ানার কৃষি উৎপাদন, মহারাষ্ট্র-গুজরাট-নয়ডা-গুরগাঁও-বাঙ্গালুরু-চেন্নাইয়ের শিল্পায়ন, কেরলের স্বাস্থ্যব্যবস্থা— এগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের নেতৃত্বে জনবিরোধী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক গণআন্দোলনের পর ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের সরকার গঠন হয়। সমাজগণতন্ত্রী দল সিপিআইএমের নেতৃত্বে এই বিপুল জনসমর্থনপুষ্ট সরকার সূচনায় কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতিতে জনমুখী সংস্কার শুরু করেও দলের মধ্যে উদীয়মান কুলাক শ্রেণীর বাধায় অচিরেই পেছিয়ে আসে। তারপর শ্রেণী সমঝোতা করে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার এবং পুঁজি ও শিল্পপতিদের সাথে দহরম মহরম করে এক দীর্ঘ স্থিতাবস্থার রেজিমেন্টেড সরকার চালায়। যেখানে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য একের পর এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। কলকারখানা-চা বাগান সব বন্ধ হয়ে যায়। অফিসগুলিতে কর্মসংস্কৃতি ও শিক্ষার মান তলানিতে পৌঁছয়। সামান্য ক্ষেত মজুরি, উচ্চ শিক্ষা বা রুজি রোজগারের জন্য মানুষকে রাজ্য ছাড়তে হয়। পশ্চিমবঙ্গ চলে আসে নারী পাচারে শীর্ষে। অপরাধ, তোলাবাজি, সিণ্ডিকেট, চিটফাণ্ড, দাদাগিরিতে জনজীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ। অর্থনীতি বিপাকে পড়ে, সরকার হয়ে পড়ে নিষ্কর্মা, নেতারা অলস ভোগী দুর্নীতিগ্রস্ত ও গণবিচ্ছিন্ন এবং আমলা ও পুলিশ নির্ভর। দ্রুত গ্রামীণ কুলাক ও শহুরে সমাজবিরোধিরা পার্টির মধ্যে ক্ষমতা দখল করতে থাকে। জনআন্দোলনকে পুলিশ-গুণ্ডা পাঠিয়ে দমন করা হয়। ঘটে চলে মরিচঝাঁপি, করন্দা, সূচপুর, দিনহাটা, বিজনসেতু, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, গড়বেতা, নেতাইয়ের মত মর্মন্তুদ গণহত্যা, অনিতা দেওয়ান-তাপসী মালিকের ধর্ষণ-হত্যার মত নারকীয় ঘটনাবলি। সিপিআইএমের ভয়াল নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ পেতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ২০১১তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুলভাবে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যেমন বিশ্বের প্রাচীনতম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অন্যতম এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম এখানে গড়ে উঠেছে যেমন— তেভাগা, তেভাগা, তেলেঙ্গানা, পুন্নাপ্পা ভায়লার, নকশালবাড়ি, ভোজপুর, দণ্ডকারণ্য প্রমুখ, আবার ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন অন্য অর্থে অসফলতা, ভুল লাইন, বিশ্বাসঘাতকতা, বিভাজন, স্বপ্নভঙ্গেরও ইতিহাস। এতদসত্ত্বেও সে কয়েকটি রাজ্যে গণভিত্তি ধরে রাখতে পেরেছে যদিও তা নিজ ব্যর্থতায় ও বিশ্বায়িত বৃহৎ পুঁজির প্রবল আক্রমণে ক্ষয়মান। এরই মধ্যে তাদের যে দুটি মডেল কিছু সাড়া জাগিয়েছিল অর্থাৎ বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে শ্রেণী সমঝোতা ও কিছু প্রগতিশীল ও পুঁজিবাদী সংস্কারের লক্ষ্যে রাজ্যে রাজ্যে 'বামফ্রন্ট সরকার' গঠন, অন্যদিকে দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে আদিবাসীদের মধ্যে থেকে সশস্ত্র লড়াই চালানোর 'মাওবাদী' নৈরাজ্যবাদী ধারা সম্প্রতি দুটিই বিশাল ধাক্কা খেয়েছে। জনমানসে তৈরী করেছে এক রাজনৈতিক শূন্যতা। সেগুলির দখল নিতে এখন আঞ্চলিক দলগুলির পাশাপাশি 'নিরাকার' আম আদমি পার্টি, এন জি ও, প্রেসার গ্রুপ, নাগরিক সংগঠন, ছাত্র আন্দোলনগুলির ক্রম তৎপরতা।

■ ২০১১-র পরিবর্তন ঃ

২০১১-র মমতার রাইটার্স দখল আক্ষরিক অর্থেই জনজোয়ারের কাঁধে চড়ে। এক দীর্ঘ জনবিরোধী অক্ষম অত্যাচারী রেজিমেন্টেড

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

শাসনের অবসানে সেইসময় মানুষ মুক্ত বাতাস নিতে সক্ষম হল। বাম শাসনকে ফেলে দিতে কংগ্রেস-বৃহৎ পুঁজি গণি খাঁন চৌধুরী, আনন্দবাজার প্রমুখের মাধ্যমে আগেও চেষ্টা চালায়। কিন্তু কংগ্রেস নিজে দুর্বল হয়ে পড়ায়, অন্যদিকে বামফ্রন্টের সফল শ্রেণী সমঝোতা, জ্যোতি বসুর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও যোগাযোগ এবং সেইসময়কার বিপুল জনসমর্থন তাকে রক্ষা করেছে। পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে যখন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক মডেলগুলি তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্রমশ জনবিরোধী ও গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তখন বিরোধিতার ভাষা পেল নিম্ন বর্গ থেকে অত্যন্ত সংগ্রাম করে উঠে আসা এক অদম্য লড়াকু তরুণী নেত্রী। আন্দ্রে বেঁতাইয়ের বিশ্লেষণে ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি ছিলেন একেবারেই অজ্ঞাতকূলশীল। কিন্তু তার ছিল অপরাজেয় মনোভাব ও স্থির লক্ষ্য। মতাদর্শে সুবিধাবাদ, চিন্তায় দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ, আচরণে একনায়কতন্ত্র এবং অনুশীলনে কট্টর বামপন্থার মিশেলে বীরেন্দ্র সহবাগ যেমন ক্রিকেটের ব্যাকরণগুলি ছয় মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন মমতা দেবীও আনলেন তার নিজস্ব চটকদার পপুলিষ্ট ও এডহকিষ্ট ব্র্যাণ্ড। সিপিএমের শত হয়রানি, মার, অত্যাচার ও কৌশলের বিরুদ্ধে তিনি জীবনকে বাজি রেখে এক অননুকরণীয় গণআন্দোলন শুরু করলেন, ছুটে বেড়াতে লাগলেন বাংলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে, নির্যাতিতাদের পর্ণ কুটিরে। কখনও সাথে পেলেন কংগ্রেসকে, কখনও বা বিজেপিকে, আবার কখনও কাউকে না। কিন্তু তাতে তার পথে প্রান্তে, সংসদে-বিধানসভায় সিপিএম বিরোধিতার ঝড় থামল না। কংগ্রেস তাকে ব্রাত্য করে দিল, সেখান থেকেই তিনি শুরু করে দেশের মধ্যে প্রথম দেখিয়ে দিলেন তার তৃণমূলই বাংলায় আসল, কংগ্রেস সাইনবোর্ড। দু দুবার কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়েছেন আবার দুর্নীতির প্রতিবাদে পদ ছেড়েছেন। এর মধ্যে তিনি অনেক পোড়খাওয়া পোক্ত হয়েছেন, পেয়ে গেছেন এক ঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ তরুণ কর্মী এবং বাংলা জুড়ে এক অটুট ভোট ব্যাঙ্ক। রেলমন্ত্রী হয়ে বাংলাকে উপহারে ভাসিয়ে দিলেন। লোকসভা ও পঞ্চায়েত ভোটে পেলেন এর প্রতিদান, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনে জানকবুল করে মহা শক্তিধর সিপিএমকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামালেন।

■ তৃণমূল সরকারের প্রথম পাঁচ বছর ঃ

২০১১-র মে থেকে প্রথম দুবছর তার সরকার একদিকে যেমন কিছু সদর্থক কাজের চেষ্টা করে আবার অন্যদিকে প্রচুর ভুল করে। অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা, একগুঁয়েমি, অদক্ষতা সরকারকে টালমাটাল করে দেয়। পরাজিত ও জনক্রোধের লক্ষ্য সিপিএম বুঝতে পেরেও তাকে চেপে ধরতে সাহস করেনি, সময় নিয়েছে যাতে নিজের ভুলে এই 'অশিক্ষিত অসংস্কৃত উন্মাদিনী রগচটা' মহিলা নিজেই নিজের পতন ডেকে আনেন। এরপর তৃণমূল দলটা সরাসরি জড়াল সিপিএম সৃষ্ট সুকৌশলীভাবে চিটফাণ্ডের মধুভাণ্ড আত্মসাতের চক্করে। কেন্দ্র ও বিজেপিও এই সুযোগে চেপে ধরল ভাল রকম, মুকুল-মদন মোসাহেবরা তখন অপসৃয়মান। এখানেও সেই মমতাদেবীর 'ভাগ্য'। নরেন্দ্র মোদীকে জিতিয়ে আনা শিল্পপতিদের কিছুতেই জমি বিল পাশ করিয়ে না দিতে পারার অক্ষমতায় মোদীর মমতার হাত ধরা, মমতাদেবীরও নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রচ্ছন্নে মোদীকে সমর্থন, পাশাপাশি সেই হার না মানা লড়াই এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মত একের পর এক কৌশলী পদক্ষেপ। সিপিএম ও বামদের রক্তক্ষরণ হতে হতে তারা শয্যাশায়ী, তাদের বস্তা-পঁচা চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি এবং বিমান-বুদ্ধ-গৌতম প্রভৃতি অজনপ্রিয় মুখ নিয়ে ততদিনের তারা আরও বিচ্ছিন্ন। মোদী হাওয়া চুপসে গিয়ে, সারদা ইস্যু হাতছাড়া করে বিজেপি তখন ম্রিয়মান। ফলে আবার স্বমহিমায় মমতাদেবী চলে এলেন রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক, কর্পোরেট জগৎ, পুঁজিপতি ও আমলাদের পরামর্শে জ্যোতিবাবুর প্রিয় ছাত্রী মমতাদেবী তার নিজের ও সম্মিলিত কৃতিত্বে এই বন্ধ্যা বঙ্গভূমিকে যে পুঁজি ও শিল্প ছাড়া করেছেন, কৃষি-শিক্ষা-স্বাস্থ্যকে শেষ করে দিয়েছেন তার দ্রুত পুনরুদ্ধার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অর্থনীতির উন্নতিতে পারঙ্গম না হয়ে লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ ভারতে আংশিক সফল 'বোলসা ফ্যামিলিয়া', 'ক্যাশ ট্রান্সফার', 'আম্মা ক্যানটিন', 'রামা রাওয়ের দু টাকায় চাল' প্রভৃতি সোজাসুজি ও অন্তর্বর্তী নানারকম ক্ষুদ্র সুবিধা, পুরস্কার-ডোল-অনুদান ছড়িয়ে বা পাইয়ে দিয়ে গ্রাম বাংলায় ও শহরের দরিদ্র দলিত ও মুসলমানদের মধ্যে এক বিশাল উপভোক্তা শ্রেণী ও অটুট ভোটব্যাঙ্ক বানিয়ে ফেললেন। এর সাথে যুক্ত হল অশান্ত জঙ্গলমঙ্গল ও পাহাড়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে নিয়মিত যাওয়া, প্রশাসনকে নীচে নামানো, এক স্মার্ট কর্মপদ্ধতি (যা বামপন্থীদের একটেড়ে চিন্তার ও শ্লথ কর্মপদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা), রাস্তাঘাটের উন্নতি, সৌন্দর্যায়ন এবং উন্নয়নের অনুরণন ছড়িয়ে দেওয়া। যতটুকু উপরিসৌধ উন্নয়ন হল তার প্রচার ও দেখনপানা হল পাঁচশগুণ। আমাদের অর্ধশিক্ষিত পশ্চাৎপদ সমাজে তাইই সবাইকে গুলে খাওয়ানো হল যেমন বামফ্রন্ট বিদ্যুৎ জোগাতে না পেরে 'রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর গড়ব' শ্লোগান দিয়ে মিথ্যা কেন্দ্রবিরোধিতার উত্তাপে মানুষকে প্রতারিত করত আবার পয়সাও তুলত। এগুলি সবই সুবিধাবাদী পপুলিষ্ট রাজনীতির ক্ষমতায় আসা, টিকে থাকা বা ফিরে আসার খেলা। এর জন্য শুধু মমতাদেবীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আর স্বাভাবিকভাবেই তিনি বৃহৎপুঁজি ও কর্পোরেটদের জন্য পথ আরও সুগম করে দেবেন। বামফ্রন্টের বন্ধ্যাত্বর চাইতে নতুন প্রজন্মও এই তথাকথিত আধুনিকতা ও উন্নয়নের গতি ও চাকচিক্য পছন্দ করবে।

■ ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন ঃ

একদা পথের লড়াইয়ের নেত্রী ততদিনে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছেন। রাইটার্স ছেড়ে কর্পোরেট নবান্নর পঞ্চদশ তলায় সবার উপরে নিজেকে তুলে ধরেছেন। কথায় আচরণে ঔদ্ধত্যে। পরিবারতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছেন। তৃণমূল দলটিও আকণ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত। ক্ষমতায় টিকে থাকতে একদা সিপিএম যেমন কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল অংশটিকে সাথে নিয়েছিল। তৃণমূলেও সিপিএমের সেই পচাগলা অংশটির বেশী ভিড়।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

গুণ্ডামি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, মহিলাদের উপর অত্যাচার, নেশাভাঙ, পুলিশি জুলুম, বিরোধিদের দমন পীড়ন মানুষকে বিক্ষুব্ধ করল। এর উপর এল নারদা ও উড়ালপুল ভাঙ্গার ইস্যু। ফলে সাতপর্ব ব্যাপী স্নায়ুত্তেজনাময় নির্বাচন জমে উঠল। কিন্তু প্রকৃত বিরোধী কোথায়? বিকল্প কর্মসূচী ও নেতা কোথায়? সিপিএমের কোন গ্রহণযোগ্য নেতা নেই, সংগঠন নিষ্ক্রিয়। কংগ্রেসের অধীর লবি মুর্শিদাবাদে কোণঠাসা হয়ে ভাল লড়াই দিল, কিন্তু মুর্শিদাবাদের বাইরে তাদের ক্ষমতা সীমিত ও গ্রহণযোগ্যতা নেই। বিজেপি তার মান্যতা হারিয়েছে, ফলে উগ্র হিন্দুত্বে ফিরে যাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। এর পরেও একটি সুযোগ ছিল, জোটের নামে আসন ভাগাভাগিও ঠিক ছিল (বিহারের মত আগে থেকে ও সমস্ত জায়গায় করা উচিত ছিল) কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত সিপিএম নেতৃত্ব সেভাবে পথে নামলেন না। নিরাপদ গৃহে অন্তরীণ থেকে কংগ্রেস, বুর্জোয়া প্রেসের একাংশ ও নির্বাচন কমিশনকে লড়িয়ে দিলেন, নানারকম গুজব ও স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়ে, নির্বাচন কমিশনকে চাপ দিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা করলেন। অপরদিকে আরেকবার নিজেকে বাজি রেখে মমতাদেবী অক্লান্তভাবে প্রতিটি কেন্দ্রে গিয়ে মানুষের মধ্যে তাদের ভাষায় নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব নিয়ে প্রচার চালিয়ে গেলেন আর জারি রাখলেন উন্নয়নের স্বপ্ন দেখানোর ও তাৎক্ষণিক পাইয়ে দেওয়ার ম্যাজিক। মানুষ অত তাড়াতাড়ি অত্যাচারী সিপিএমকে ফিরিয়ে আনতে চাইল না, মমতাদেবীর পাশেই থাকল, ২০১১-র পর তাকে আবার ভরিয়ে দিল উজাড় করে। ২০১৬-তে মমতা ২১১টি আসন জিতে অভাবনীয় জয় পেলেন।

এরপরও বলব আসনের ব্যবধান অনেক হলেও (২১১ - ৭৭ = ১৩৪) সামগ্রিক ভোটের ব্যবধান ৩০ লক্ষের মত যা খুব বেশী নয়। এর মধ্যে ২৩টি আসনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ও পরাজিত জোটের ব্যবধানের থেকে নোটার পরিমাণ বেশী। কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি, কম আসনে দাঁড়িয়েও সিপিএমের শেষ নির্বাচনের সময়কার ভোটের হার প্রায় থেকে গেছে (২৬%), নয়জন মন্ত্রী (তাদের অনেকেই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত) ও কয়েকজন হেভিওয়েট নেতার পরাজয়, পূর্ব মেদিনীপুরে অধিকারীতন্ত্রের মধ্যেও তিনজন বামপ্রার্থীর জয়। মমতা সহ হেভিওয়েট মন্ত্রীদের জয়ের ব্যবধান অনেক কমে গেছে, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে গণরায়ের লক্ষ্যণীয় দিক রয়েছে। প্রথম দুপর্ব নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং হয়েছিল মাথায় রাখতে হবে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে সাফল্যের পর বৃহৎ পুঁজি একই কায়দায় ত্রিপুরায় বাম দুর্গ পতনে ব্রতী হয়েছে। কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারানোয়, মোদী সরকারও কেন্দ্রে তেমন কার্যকর না হওয়ায় তারা মমতা, কেজরী, নীতিশদের বিকল্প নিয়েও পরিকল্পনা করছে।

■ **অতঃকিম্ ঃ**

লক্ষ্য করার মত যে জিতে মমতা সন্ত্রাস বন্ধ করতে না বলে ঘুরিয়ে সন্ত্রাসে ইন্ধন দিচ্ছেন, বলছেন বাংলায় কোন দুর্নীতি নেই, শপথের আগেই দলদাস পুলিশ ও আমলাদের ফিরিয়ে আনলেন, কর্তব্যপরায়ণ নিরপেক্ষ পুলিশ অফিসার ও আমলাদের শাস্তি দিলেন, বিজেপির সাথে সহযোগিতার ইঙ্গিত দিলেন এবং মন্ত্রীসভায় বেশ কিছু দাগী অপরাধী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী ও কুখ্যাত আমলাকে স্থান দিলেন। ফলে মুখে দায়িত্বের কথা বললেও স্বৈরাচারের সর্বাত্মক বহিঃপ্রকাশ বেরিয়ে পড়ছে। আগামী দিনে তা আরও বাড়বে এবং স্বৈরাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীতে বাড়বে সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সঙ্কট। বিরোধী দল ও প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গানোতেও তা প্রকট।

(১) বিরোধী শক্তিকে দৃঢ়তার সাথে এই জনবিরোধী পদক্ষেপ, স্বৈরাচারী অভিব্যক্তি ও দুর্নীতির বিরোধিতা করতে হবে।

(২) তা করতে হবে মূলত রাজপথে মাঠে ময়দানে নেমে ব্যাপক প্রচার ও জনসমাবেশ ঘটিয়ে।

(৩) ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ ও কর্মসূচীগুলি নিয়ে যেতে হবে।

(৪) শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাতে সামিল করতে হবে ছাত্র-যুব নবীন প্রজন্মকে, ব্যাপক গণতান্ত্রিক মানুষকে। শ্রমিক, কৃষক, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, মহিলা, বুনিয়াদী মানুষকে।

(৫) বিকল্প উপযুক্ত/ও যোগ্য কর্মসূচী ও নেতৃত্ব সামনে নিয়ে আসতে হবে।

(৬) কংগ্রেস নয় বামফ্রন্টের মধ্যেকার ও বাইরের বামদলগুলিকে নিয়ে ন্যূনতম কর্মসূচী ভিত্তিক বামঐক্য গঠন ও আন্দোলন করতে হবে।

(৭) কংগ্রেস, 'সেভ ডেমোক্রেসী' মধ্যপন্থী অন্য দল সবাইকে নিয়ে কেন্দ্রে আধা-ফ্যাসিষ্ট মোদী সরকার ও রাজ্যে স্বৈরাচারী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন এবং নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি করতে হবে 'বাম ও গণতান্ত্রিক জোট'-এর ব্যানারে।

(৮) এই আন্দোলনগুলিকে প্রধান শত্রু বৃহৎ পুঁজি ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে চালিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে সৎ তৃণমূল ও স্বদেশী বিজেপিদেরও এই মূল ও নিয়ন্ত্রক লড়াইয়ে সামিল করতে হবে এবং আমাদের প্রাণ, জল, জঙ্গল, জমিন, পাহাড়, গ্রাম, শহর রক্ষা করতে হবে। বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে বৃহত্তর মোর্চা ও বৃহত্তর প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

(৯) অসংসদীয় গণ আন্দোলন দিয়ে বিধানসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও সরকারকে চাপে রাখতে হবে।

(১০) পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে বহুতল নয়। প্রকৃত জনমুখী, পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা হাজির করতে হবে।

(১১) ক্ষেত্র ধরার ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, আইনশৃঙ্খলা প্রভৃতির উপর জোর দিতে হবে। উত্তরবঙ্গ, পাহাড়, তরাই, ছিটমহল, চর, খাদান, জঙ্গলমহল, সুন্দরবন প্রভৃতি চ্যালেঞ্জড এলাকা এবং দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ, উদ্বাস্তু, জনমজুর, অসংগঠিত শ্রমিক, বস্তী ও ঝুপড়িবাসী প্রভৃতিদের সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।

(১২) ইস্যুর ক্ষেত্রে টেট কেলেঙ্কারী, চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারী, পার্শ্বশিক্ষক ও অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারী, সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ কেলেঙ্কারী, চা-বাগান বন্ধ ও অনাহারে মৃত্যু, ধান বিপণন,

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

আলুর সংগ্রহ মূল্য ও সংরক্ষণ, বন্ধ পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কারখানা, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার খামখেয়ালিপনা, পর্যাপ্ত পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, জলসেচ, বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা, সন্ত্রাস ও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, তোলাবাজী, সিণ্ডিকেট, গুণ্ডামি, নারী নির্যাতন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ক্ষরা, বন্যা প্রভৃতি ইস্যুকে ধরতে হবে।

(১৩) সকলের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, শুধু দু'টাকার চাল নয় খাদ্য সুরক্ষা, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, অবাধ নির্বাচন, সক্রিয় ও পক্ষপাতহীন পুলিশ-প্রশাসন, সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানীয় জল, রেশন, ন্যূনতম মজুরি, পেনশন, স্বাস্থ্যবীমা প্রভৃতি মৌলিক ইস্যুগুলি তুলে ধরতে হবে।

(১৪) নেশা, মদ্যপান, র‍্যাগিং, বাল্য বিবাহ, পণ, নারী নির্যাতন, নারী পাচার, জাতপাত-সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্র করতে হবে এবং সু ও উন্নত সংস্কৃতি প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।

(১৫) মানুষের মধ্যে এবং বিপদে ও প্রয়োজনে সব সময় মানুষের পাশে থাকতে হবে। বাম ঐক্য, বাম ও গণতান্ত্রিক জোট ও বৃহত্তর মোর্চাকে তৃণমূল স্তর অবধি অন্তত গ্রাম, পাড়া ও বুথ স্তর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

(১৬) সবসময় সরকারমুখী অথবা সরকারে থাকার চিন্তা না করে তৃণমূল স্তর থেকেই মানুষকে নিয়ে জনমুখী স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের কাজ করে যেতে হবে। সততা বজায় রাখতে হবে, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(১৭) যেখানে গ্রাম সংসদ, পঞ্চায়েত, সমিতি, জেলা পরিষদ, ওয়ার্ড, বরো প্রভৃতি স্থানে ক্ষমতায় আছেন বা প্রতিনিধিরা আছেন সেখানে কেবল মিটিং-আলোচনায় সময় নষ্ট না করে দ্রুত, আন্তরিক ও কার্যকরীভাবে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে।

■ উপসংহারের পরিবর্তে ঃ

আজকের পরিস্থিতিতে বামপন্থাকে উপযোগী ও কার্যকরী করে তুলতে হবে। অন্বেষণ ও অনুশীলন করতে হবে নতুন চিন্তা, চর্চ্চা, সংজ্ঞা নির্ধারণ ও কর্মসূচী। পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের থেকে অনেককিছু শিখেছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করেছে, আত্তীকরণ করেছে ইহুদী, জার্মান, ভারতীয় ও চৈনিক মনীষা এবং আফ্রিকার শ্রম। স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়ে অতিক্রম করেছে একেকটি সঙ্কট। বামপন্থাকেও নমনীয় হতে হবে, সবসময় মাটিতে পা রাখতে হবে, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অমায়িক থাকতে হবে। লক্ষ্যে অবিচলিত, সৎ ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাপূর্ণ এবং অনুশীলনে নিরলস হতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ ও আয়ত্ত করতে হবে।

আর মানবজাতি, সভ্যতা ও প্রকৃতির প্রধান শত্রু বৃহৎপুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে জয়ী হতে হবে। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর মোর্চা গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে মোদীজী বা মমতাদেবী এদেরই প্রতিনিধি এবং এই তিনজনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি। চীন সহ অ্যাফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার সফল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভিয়েতনামে মার্কিন পরাজয়, ইরানের সফল মার্কিন প্রতিরোধ, কিউবার ধারাবাহিক সংগ্রাম, ইকুয়েদর-ভেনেজুয়েলার সাফল্য প্রভৃতি থেকে শিখতে হবে। বৃহৎ পুঁজির অন্তর্দ্বন্দ্ব (উদা. বোয়িং বনাম এয়ারবাস, মাইক্রোসফট্ বনাম অ্যাপল্, গুগল্ বনাম ফেসবুক, নেসল্ বনাম ইউনিলিভার, কোক বনাম পেপসি...), বৃহৎ পুঁজি বনাম রাষ্ট্রের অর্ন্তদ্বন্দ্ব (উদা. ইউ. এস. এ. বনাম মাইক্রোসফট্), বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব (ইউ.এস.এ. ন্যাটো, রাশিয়া, চীনদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সাম্প্রতিক ব্রেক্সিট), ভারতীয় শাসক শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব (উদা. সরকার বনাম আদালত), বৃহৎ রাষ্ট্রীয় দলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব (উদা. কংগ্রেস বনাম বিজেপি, মোদি-অমিত শাহ্ বনাম আদবানি), ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব (টাটা বনাম আম্বানি বনাম আদানি) গুলিকেও অনুকূল মেরুকরণের পক্ষে নিতে হবে।

আধুনিক যুগের মানুষ হিসাবে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে প্রকৃতি, সভ্যতা এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির থেকে আমরা অনেক অনেক কিছু পেয়েছি। তাই দায়িত্ব বৃহৎ পুঁজি ও তার প্রতিভুদের আগ্রাসন থেকে তাদের রক্ষা করা।

অর্থনীতির হাল হকিকৎ

⊙ সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ— 'ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট' অথবা এফ.ডি.আই

● ২০১৪-র আগেই যে সমস্ত ক্ষেত্রে ১০০% এফ.ডি.আই ছিল—

কৃষি, পশুপালন ও ডেয়ারি, খনি, ওষুধ শিল্প, বিমান চলাচল, সংবাদ মাধ্যম, পেট্রোলিয়াম, নির্মাণ শিল্প, উপগ্রহ, আর্থিক সংস্থা, টেলিকম।

● ২০১৪ থেকে ২০১৬ জুন অবধি যে সমস্ত ক্ষেত্রে ১০০% এফ.ডি.আই. লাগু হল—

প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে, বাণিজ্য।

⊙ ভোগ্যপণ্য প্রস্তুত সংস্থার মুনাফা বৃদ্ধি

সংস্থার নাম	বিক্রি (কোটি টাকায়) গত একবছরে	বৃদ্ধির হার গত দু'বছরে	সংস্থার নাম	বিক্রি (কোটি টাকায়) গত একবছরে	বৃদ্ধির হার গত দু'বছরে
পতঞ্জলি	৫,০০০	(১০১১%)	নেশলে	৮,৪৮২	(—১.৫%)*
গোদরেজ	৮,৯৫৭	(৮০%)	ব্রিটানিয়া	৮,৬০৭	(৫৫%)
ইমামি	২,৬১৯	(৭৭%)	ম্যারিকো	৬,১২২	(৫৪%)
ডাবর	৮,৫৪৩	(৬০%)	হিন্দুস্থান ইউনিলিভার লিমিটেড	৩৫,৬৩৭	(৪৫%)

* ম্যাগি বিতর্কে বিক্রি ধাক্কা খায়।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

⊙ ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়নের (১৯৯১) পর পঁচিশ বছর

আইটেম	সংখ্যা/মূল্য (১৯৯১)	সংখ্যা/মূল্য (২০১৬)
ফোন	ল্যাণ্ডসেট ৫০ লক্ষ	মোবাইল ১০০ কোটি
টিভি	২ কোটি ৮০ লক্ষ	১৬ কোটি ৮০ লক্ষ
	সরকারি দূরদর্শনের সাথে নতুন উপগ্রহ চ্যানেল আসতে শুরু করেছে	৮৯০টি চ্যানেল
ফ্রিজ	১০ লক্ষ	১ কোটি ৬০ লক্ষ
দুধের দাম প্রতি কি.গ্রা.	৫ টাকা	৩০-৫০ টাকা
পেট্রলের দাম প্রতি লিটার	১০ টাকা	৬৫ টাকা
শপিং মল	১ (স্পেনসার প্লাজা, চেন্নাই)	৬৫০
কর্মসূত্রে বিদেশ ভ্রমণ	১৯ লক্ষ	২ কোটি
ক্রেডিট কার্ড	সবে সিটি ব্যাঙ্ক বের করেছে	২ কোটি ৪৫ লক্ষ
গাড়ির সংখ্যা ১০০ জন প্রতি	৫	৩২

⊙ স্বাধীনতার ৭০ বছর

● চিকিৎসা খরচের শতাংশ যা নাগরিকদের নিজের পকেট থেকে যায় ঃ

ভারত	সাব-সাহারান দেশগুলি	চীন	উত্তর আমেরিকা	বিশ্ব
৬৮%	৩৬%	৪৭%	১৬%	১৮%

● নবজাতিকার ৬৫ বছর অবধি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ঃ

ভারত	চীন	দক্ষিণ কোরিয়া	বিশ্ব
২৮%	৩৫%	৫১%	৫২%

● ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর হাতে ভারতের মোট আয় ঃ

সাল	দরিদ্রতম (১০%)	ধনীতম (১০%)
২০১১	৩.৫২%	২৯.৯৮%

● পরিবারভিত্তিক জ্বালানীর ব্যবহার (প্রতি হাজার) ঃ

	গ্রাম		শহর	
দরিদ্র পরিবার	কাঠকুটো	এল পি জি	কাঠকুটো	এল পি জি
(১০-২০ শ্রেণীতে থাকা মানুষ)	৭৬১	১৫	৩৫৩	৪৪৬

⊙ স্বাস্থ্যের অর্থনীতি—

● ভারতে বীমার আওতাভুক্ত মানুষ ঃ

গ্রাম	শহর
১৪.১%	১৮%

● সরকারি সহযোগিতামূলক বীমার আওতাভুক্ত ঃ

গ্রাম	শহর
১৩.১%	১২%

● অর্থাভাবে চিকিৎসা না করতে পারা মানুষজন ঃ

গ্রাম	শহর
৫৭.৪%	৬৮.৩%

● কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল না থাকার কারণে চিকিৎসা করতে না পারা মানুষজন ঃ

গ্রাম	শহর
১৫.৪%	০১.৩%

⊙ ভারতে জল ব্যবহার—

● জলের সংস্থান (বছরে, একক 'বিলিয়ন কিউবিক লিটার') ঃ

সারফেস ওয়াটার (বৃষ্টি, নদী, খাল, জলাশয়)	ভূগর্ভস্থ জল
৬৯০	৪৩৩

● জল ব্যবহার ঃ

কৃষিতে	গৃহস্থালীর কাজে	শিল্পে
৮৯%	৯%	২%

● ভূগর্ভস্থ জলের উপর অতিনির্ভরশীল রাজ্য (প্রথম তিন) ঃ আন্দামান নিকোবর (৪৫.০৬), মধ্যপ্রদেশ (৮০.৫১), ছত্তিশগড় (৭৯.৭৭)

● ভূগর্ভস্থ জল অতি উত্তোলনের (৮০-১০০) ফলে রিক্ত রাজ্য (প্রথম তিন) ঃ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান

সংকলন : বুনো রামনাথ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ফুটবলের তিন অঘটন

—নিলয় সামন্ত

গত মে মাসে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ (ইপিএল)-এ লেস্টার সিটি চ্যাম্পিয়ান হয়ে যে অঘটনের সৃষ্টি করেছিল, তা জারি ছিল জুলাই মাস পর্যন্ত। যখন জুলাইয়ের মাঝামাঝি লিওনেল মেসি সমৃদ্ধ আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে কোপা আমেরিকা কাপ জিতল চিলি আর তারপরে অঘটনের সমাপ্তি ঘটল ফ্রান্সের মাটিতে ফ্রান্সকেই হারিয়ে প্রথমবারের জন্য ইউরো জিতল পর্তুগাল তাদের সেরা খেলোয়াড় আহত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে মাঠের বাইরে রেখে। যা সত্যি অবাক কাণ্ডই বটে। ফুটবলে যেমন প্রয়োজন স্কিলের ঠিক তেমনই সমানভাবে প্রয়োজন টিম গেমের। দুইয়ের সংমিশ্রণেই আসে সাফল্য। তবে খেলাধুলায় অসম্ভব বলে যে কিছু নেই সেটাই আবার প্রমাণ হল এই তিনমাসে। তাইতো, একটি বিখ্যাত ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা তাদের ক্যাচ লাইনে লেখে—ইমপসবল্ ইজ নাথিং।

আমেরিকার নিউজার্সিতে যেমন ভারতীয়, বাংলাদেশী, পাকিস্তানীদের বসবাস বেশি ঠিক তেমনই ইংল্যাণ্ডের লেস্টার সিটিতে ভর্তি এশীয় আর তাদের মধ্যে সিংহভাগই হল ভারতীয় আর পাকিস্তানী। অতীতে ব্রিটেনে লেস্টারের তেমন গুরুত্ব ছিল না। গুরুত্বটা তৈরি হয় আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে যখন রোমান শ্রমিকেরা ইংল্যাণ্ডের বুক চিরে একটা যোগাযোগকারী মহাসড়ক তৈরি করে দেয়। আর কেমন একটা যোগাযোগ দেখুন এবারে লেস্টার সিটিতে কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন একজন রোমান, নাম ক্লদিও রানিয়েদি। লেস্টার সিটিতে ১৩২ বছর ধরে চলা এই ফুটবল ক্লাবটির সাফল্য বলতে এতদিন ছিল তারা ইংল্যাণ্ডকে গ্যারি লিনেকার নামে এক স্ট্রাইকার উপহার দিয়েছিল। কিন্তু এবার তারা নিজেরাই চ্যাম্পিয়ান।

ক্লাবটার মালিক হলেন তাইওয়ান বংশোদ্ভূত বিচাই শ্রীবদ্ধনপ্রভা। ভদ্রলোক একজন ভাল কোচ খুঁজছিলেন। এমন সময় তিনি পেয়ে গেলেন ক্লদিওকে। তাঁর ফুটবল বোধ আর ফুটবল সম্পর্কে ভালবাসা মুগ্ধ করে বিচাইকে। তিনি ক্লদিওকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেন। নিজের ঘর গুছোতে ক্লদিও ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড, ক্লদ ম্যাকালেলে, এর্নান ক্রেস্পো, আদ্রিয়ান মুতু,

ডামিয়েন ডাফ, রবার্ট হুথ প্রমুখকে জোগাড় করেছিলেন ১৩ বছর আগে চেলসিতে থাকতে। এবারও নিজের মনের মতো দল তিনি তৈরি করার সময় আবারও নেন সেই বর্ষীয়ান জার্মান রবার্ট হুথকে। যিনি এবারেও দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। আর ছিলেন ভার্ডি, কান্তে, ড্রিঙ্কওয়াটার, রিয়াদ, ফুচস, মর্গ্যান, স্কিমিচেলরা যাঁরা এবার লেস্টার সিটি টিমের অপর নাম খ্যাঁক শিয়ালের মতোই ধূর্ততার সঙ্গে বিপক্ষকে বোকা বানিয়েছেন। জ্যামি ভার্ডি তো প্রায় ম্যাচ প্রতি দুটো করে গোল করেছেন। আর তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেছেন নিয়মিত গোলের মধ্যে থাকা ফ্রান্সজাত আলজিরিয়ান রিয়াদ মাহরেজ।

২৯ বছর বয়সী ভার্ডি প্রথম পেশাদার ক্লাবে খেলতে শুরু করেন ফ্লিটউড ক্লাবে। যে ক্লাবটা নিজেই তার একবছর আগে পেশাদার ক্লাবের স্বীকৃতি পায়। তারপর একে একে স্টকস্ ব্রিজ পার্ক স্টিল, হ্যালিফ্যাক্স টাউন ক্লাবে খেলেন। আর এবার লেস্টারে খেলে যেমন গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন ১১ ম্যাচে টানা ২২টি গোল করে ঠিক তেমনই এবারেই তিনি প্রথম ইংল্যাণ্ডের জার্সি গায়ে দেওয়ার সুযোগ পান। ভার্ডি-রিয়াদদের নিয়মিত বলের যোগান দিতেন আর এক ফরাসি এনগোলো কান্তে। তিনি বক্স টু বক্স মিডফিল্ডার। তাঁর দাপটেই লেস্টার এবার বল পজেশন নিজেদের পক্ষে রাখতে বেশি বেশি করে সফল হয়েছেন। আক্রমণে বল জোগানোর পাশাপাশি তাঁর কড়া ট্যাকেলও বিপক্ষ ফরওয়ার্ডদের দমিয়ে রেখেছে। আর তারও পরে বল আটকানোর দায়িত্ব ছিল স্টপার রবার্ট হুথের। বর্ষীয়ান এই খেলোয়াড়কে টপকাতে এবার বেশ বেগ পেতে হয়েছে বহু নামী খেলোয়াড়কেই। এর সঙ্গে ছিল অবশ্যই ক্লদিওর চাতুরি আর তাঁর নেতৃত্বে টিমের মধ্যে একটা সক্রিয় বন্ধন। শুধু মাঠে নয়। মাঠের বাইরেও তিনি এই বন্ধন অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

লেস্টারের কিন্তু গতবছরেও অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তারা ২৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রায় অবনমনের মুখে পড়ে। শেষে ৮ ম্যাচের মধ্যে ৬টা জিতে অবনমনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। তখনই ঘুরে দাঁড়াবার কথা প্রথম চিন্তা করতে শুরু করেন বিচাই। ৩০ জুন কোচ পিয়ারসেনকে ছাঁটাই করেন তিনি। ১৩ জুলাই নিয়ে আসেন ক্লদিওকে। তারপর টানা তিন সপ্তাহ লেস্টার লিগের শীর্ষে থাকে। কিন্তু আর্সেনালের কাছে ২-৫ গোলে হেরে ছ'নম্বরে চলে আসে লেস্টার। আবার ধারাবাহিকতা দেখিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্র করে দু'নম্বরে উঠে আসে। এরপর আবার সাফল্য। তারপর ৬ ম্যাচ বাকী থাকতেই দ্বিতীয় স্থানে থাকা টটেনহ্যামের থেকে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে যায় লেস্টার।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সান্ডারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে পরের মরশুমে চ্যাম্পিয়ান্স লিগে খেলা নিশ্চিত করে লেস্টার। এরপর ভার্ডিকে ছাড়াই সোয়ান্সিকে ৪-০ গোলে হারায় লেস্টার। ২ মে টটেনহ্যাম স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসি ড্র করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে যায় লেস্টার সিটি। প্রথমবারের জন্য। যা ছিল জুয়াড়িদের কাছেও অবিশ্বাস্য। লেস্টারের পক্ষে দর ছিল ৫০০০-১। যার ফলে ২২ বছরের ভারতীয় বংশভূত লেস্টারবাসী করিশ্মা মাত্র ৩ ডলার দিয়ে বাজি ধরে ১৪,৬০০ ডলার রোজগার করে। এইভাবে লেস্টারের পক্ষে ধরা বাজির কারণে জুয়াড়ি সংস্থাগুলোর মিলিত ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ১৪ লক্ষ ডলার।

এর পরেরটা মানে কোপা আমেরিকা কাপকে ঠিক অঘটন বলা যাবে না, তবে সবাই যখন আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ান বলে ধরে নিয়েছে তখন তাদের হারিয়ে আবারও চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পরেও হেরে যাওয়া দল আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে নিয়েই সারা বিশ্ব মাতোয়ারা। ট্রফিটা নাকি তাঁর প্রাপ্য ছিল। তিনি দেশের হয়ে খেলতে পারেন সেটা প্রমাণ করা হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ওদিকে পরপর দুবছর আর্জেন্টিনাকে হারিয়েও যোগ্য সম্মান পেল না চিলি। সেদিন আমেরিকার সাঁদোনিতে কোপা ফাইনালে চিলি প্রথমেই নজর রেখেছিল মেসি আর দি মারিয়ার উপর। দুজনেই ফাইনাল পাস বাড়াতে ওস্তাদ। কিন্তু সাঞ্চেস, বিলালদে, আরাঙ্গিস, বার্গাসরা এরা প্রথম থেকেই অকেজো করে দেয় আর্জেন্টিনার মুখ্য দুই খেলোয়াড়কে। মেসি বল ধরলেই তার চারপাশে চলে আসছিলেন চিলির তিনজন করে খেলোয়াড় যাতে তিনি পাস বাড়াতে না পারেন। আর তারপরেই থাকছিল ডবল কভারিং যাতে মেসি সামনের দিকে বাধাহীনভাবে এগিয়ে যেতে না পারেন। একইভাবে তারা বোতল বন্দি করে দি মারিয়াকেও। তা করতে গিয়ে একজনকে খেসারত দিতে হয় চিলিকে। কিন্তু চিলির দশজন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেও এগারোজন আর্জেন্টিনীয় বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি চিলিয়ানদের সতর্কতার জন্য। আর তাদের গোলরক্ষক ব্রাবো। আগুয়েরার হেড প্রায় গোল হয়েই যাচ্ছিল যদি না ব্রাবো তা অসামান্য দক্ষতায় বাঁচিয়ে না দিতেন। আর টাইব্রেকারে তো ব্রাবো নিজের হাতে চিলিকে কাপ তুলে দিলেন বলা চলে। আর্জেন্টিনার মতো টিমকে আমেরিকার মতো নিরপেক্ষ দেশে যেখানে মেসির জনপ্রিয়তার কারণে সমর্থকদের সংখ্যা বেশি নির্ধারিত সময় ও তার পরে অতিরিক্ত সময় আটকে রাখা বেশ কঠিন কাজ। আর সেটাই করে দেখালো চিলি। তারপর ব্রাবোর দক্ষতায় তারা কাপও জিতে নিল।

কিন্তু ইউরোতে সমস্ত হিসেব-নিকেশ ওলট-পালট হয়ে গেল। বাঘা বাঘা টিম ইতালি, জার্মানি সব হেরে গেল। ফাইনালে দু'বারের বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্সও হেরে গেল। তারা হারল কাদের কাছে? না, যারা এর আগে একবারও ইউরো কাপ বা বিশ্বকাপের মতো কোনও বড় টুর্ণামেন্ট জেতেনি তাদের কাছে। এতদিন পর্তুগাল দেশটা বিখ্যাত ছিল ইউসোবিওর জন্য। সম্প্রতি তারা আরও এক জনপ্রিয় খেলোয়াড় বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। সি-আর-৭ মানে

সাত নম্বর জার্সিধারী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তিনিই ছিলেন পর্তুগালের অধিনায়ক। মেসির মতো তাঁর দেশের হয়ে কাপ জেতার ভাগ্য খারাপ নয় ঠিকই, কিন্তু ফাইনালে তিনি নিজে দেশকে খেলোয়াড় হিসেবে সেবা করতে পারলেন না। প্রথমার্ধের মাঝামাঝিই হাঁটুতে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয় তাঁকে। কিন্তু যোগ্য অধিনায়ক হিসেবে নিজের ব্যথা বেদনা ভুলে যেভাবে তাঁর টিমের অনামী খেলোয়াড়দের নাম ধরে ডেকে তাদের উৎসাহিত করে গেলেন তা এক কথায় অনস্বীকার্য।

খেলা হচ্ছে ফ্রান্সের মাঠে। চারিদিকে ফ্রান্সের সমর্থকে ভর্তি। তবু রোনাল্ডোর জন্য একটু উৎসাহ ছিল দর্শকদের। কিন্তু তিনি মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতেই সবাই ভাবছিল প্রতিবারের মতো এবারেও পর্তুগাল বোধহয় আর পারল না। পর্তুগীজ সমর্থকদেরও চোখে জল। ২০০৪-এ নিজেদের দেশে ফাইনাল খেলেছিল পর্তুগাল। সেবার রোনাল্ডোর বয়স ছিল মাত্র ১৯। কিন্তু সেবার তিনি দেশকে জেতাতে পারেননি। গ্রীসের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। এবারও বোধহয় তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ভেবে সবাই যখন প্রমাদ গুনছেন তখনও হার মেনে নেননি এদিনের পরিণত রোনাল্ডো। ইউরোপের নামী ক্লাবে খেলার সুবাদে তিনি জেনে গিয়েছেন খেলার শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত হাল ছাড়তে নেই। তাই তিনি ক্রমাগত চিৎকার করে সতীর্থ খেলোয়াড়দের ভুল ত্রুটি শুধরে দিতে থাকেন। এভাবে শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের খেলা। আর অতিরিক্ত সময়ে এদেরজেও আন্তনিও মাসেদো দে লোপেজ অঘটনটা ঘটিয়ে ফেললেন। অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে তিনি বেঞ্চে বসেছিলেন। মাঠে নেমেছিলেন মাত্র ৪৩ মিনিট। আর তাতেই তিনি করে দিয়ে গেলেন আসল কাজটা। এর আগে গোটা ইউরো কাপে তিনি খেলেছিলেন মাত্র ১৩ মিনিট। কিন্তু রোনাল্ডো তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে তিনি সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই গোল করতে পারবেন। তিনি সুযোগও পেলেন আর রোনাল্ডোর কথাটারও মর্যাদা দিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে দিলেন দেশকে প্রথমবারের জন্য কোনও বড় ট্রফি।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

পদ্মার পারে ফুকুসিমা হলে গঙ্গার পারের মানুষ বাঁচবে?

—বিবর্তন ভট্টাচার্য

যাঁরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন তাঁদের পরিবেশবিদ বা পরিবেশকর্মী বলা হয়। কিন্তু যারা পরমাণু শক্তি ও পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বলেন তাঁদের পরমাণু বিরোধী বলা হয়। আসলে প্রথম থেকেই এই শক্তিকে নিরাপদ বলা শুরু করেন কিছু রাষ্ট্রনায়ক ও তাঁদের তাঁবেদার বিজ্ঞানীকুল। তাই এই পারমাণবিক শক্তি ও অস্ত্রের বিরোধিতা যাঁরা করেছেন তাঁদেরকে বিরোধিতা করেই পরমাণু শক্তি বিরোধী নাম দেওয়া হয়েছে। তাতে মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্ল কিদোয়াই, সুজয় বসু—এঁরা থাকতেই পারেন। পৃথিবীতে আজ প্রমাণিত পরমাণু শক্তি কোনো বিদ্যুৎ হিসেবে নয় এবং তা সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে এই চিন্তা থেকেও পারমাণবিক চুল্লী তৈরি করা হয় না। এবং এই পরমাণু কেন্দ্রের ফলে দেশের যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে ফ্রান্স তার জলজ্যান্ত উদাহরণ।

বাংলাদেশের 'রামপাল'-এ ভারতের এন.টি.পি.সি. একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করছে ৩২০ মেগাওয়াটের। এর ফলে সুন্দরবনে অ্যাসিড বৃষ্টি, নদীর জল দূষিত, পরিবেশ দূষিত, বন ও বন্যপ্রাণী, জলজপ্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে সুন্দরবনই বিপন্ন হতে পারে, সেজন্যে বাংলাদেশে একটা আন্দোলন চলছে। তা সত্ত্বেও সেটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণ নিয়েও সাধারণ মানুষ পথে নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু পরিবেশবিদ্ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র যাতে অন্যত্র হয় তার জন্যে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

কিন্তু নীরবে যে কাণ্ড বাংলাদেশের পাবনার ঈশ্বরডিহিতে ঘটে চলেছে স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই তার খবর খুব কমই রাখেন দুই বাংলার মানুষেরা। ১৯৬১ সালে প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের দেখাদেখি অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে 'ঢাকা সাভারে প্রতিষ্ঠিত 'ইরিগা' রিসার্চ রিয়্যাক্টর এটমিক এনার্জি রিসার্চ এসটাবলিসমেন্ট থেকে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের পরিকল্পনা শুরু হয়। ২০০১ সালে বাংলাদেশে জাতীয় পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচী তৈরি করে এবং ২০০৭ সালে ২৪শে জুন সরকারিভাবে ঘোষণা করে যে বাংলাদেশে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র তৈরি হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নিশ্চয়ই মনে আছে ঠিক এই সময়েই পূর্ব মেদিনীপুরে হরিপুরে রাশিয়ার কোম্পানি 'রোষ্টম' পরমাণু চুল্লি বসানোর জন্য ভারত সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুল্লি যাতে তৈরি না হয় তার জন্য বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বসবাসকারী মানুষেরা ভিটে-মাটি বাঁচাও ও পরমাণু চুল্লি বিরোধী একটি সংগঠন তৈরি করে পথ আটকে দেয় সরকারি শক্তি কমিশনের কর্তাব্যক্তিদের। সঙ্গে যোগ দেন বিভিন্ন পরমাণু বিরোধী বিজ্ঞানীগণ ও গণসংগঠন ও বিজ্ঞান সংগঠন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও সামিল হয় এই আন্দোলনে। অংশ নেন বিশিষ্টজনেরা, বন্ধ হয় এই প্রকল্প।

কিন্তু রাশিয়াকে তার চুল্লি বিক্রি করতে হবে। 'রোষ্টম' খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে ১৯৬১ সাল থেকে পদ্মার পাড়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরডিহিতে যে ২৫৩·৯০ একর জমি পরমাণু চুল্লি বসানোর জন্য মজুত রেখেছিল তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারও তাই বজায় রাখে। মে, ২০১০ রাশিয়ার সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের কথা হয় যে ঈশ্বরডিহিতে রূপপুরে এই ২০০০ মেগাওয়াটের একটি পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হবে। দুটি রিঅ্যাক্টরের মধ্য দিয়ে এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, এক-একটি ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করবে। এর জন্য বাংলাদেশের মত একটি গরিব রাষ্ট্রকে খরচ করতে হবে ১৩ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার। আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের উৎপাদন শুরু হবে ২০২১ সালে। এই প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২রা নভেম্বর, ২০১১ সালে।

আসলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে সারা পৃথিবীতে যা হচ্ছে তার শিকার হতে চলেছে পৃথিবী সেরা জীববৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। আসলে সারা পৃথিবীতে পরমাণু চুল্লি কারবারিরা এত শক্তিশালী তাঁরা সবসময়েই পরমাণু বিদ্যুৎ অন্য সব বিদ্যুতের থেকে সেরা এবং নিরাপদ তা প্রমাণ করতে মরিয়া। বাংলাদেশে 'সেজ' চালু আছে 'ই.পি. জেড.' নামে। সেখানে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি থেকে কম মজুরিতে কাজ করে মানুষ। তাই সেই সব পোকামাকড়ের মত মানুষের দেশে যদি ফুকুসিমার মত কোনো ঘটনা ঘটে তবে আপত্তি কি? এছাড়া প্যারিস সম্মেলনের পর কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে পৃথিবীর যে কটি দেশের সমুদ্রের পাড়গুলো

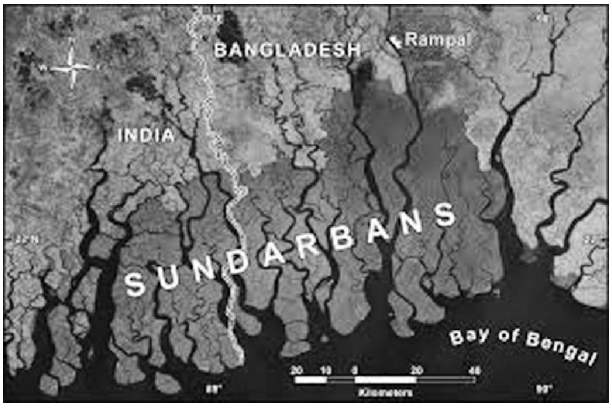

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ডুবে যাবে তবে মধ্যে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড অন্যতম আর রূপপুরে যে পরমাণু চুল্লি তৈরি হচ্ছে তা একদম পদ্মার পারে। চুল্লির বর্জ্য জল নির্গমনও হবে পদ্মায়। বাংলাদেশের রেডিও-অ্যাকটিভ ইলিশ মাছ দিয়ে কলকাতায় হবে ইলিশ উৎসব।

আর ফুকুসিমার মত জলোচ্ছ্বাস যদি রূপপুরে ঘটে তবে গঙ্গার পারের মানুষেরা কেমন থাকবেন তা ভাববার সময় এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুর থেকে রাশিয়ার চুল্লি বিক্রেতাদের বিতাড়িত করলে ওরা ২০০৭ সালেই বাংলাদেশের সঙ্গে ঐ চুক্তি সারে। ০২·৪ জি. ডব্লিউ. ই. নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে ঈশ্বরডিহির রূপপুরে। করছে রাশিয়ার রোষ্টম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশন। এই প্রজেক্টের কাজ শুরু হবে ২০২৩ সাল থেকে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় ২৮শে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি দূষণের ছাড়পত্র পায়নি। এছাড়া এই পরমাণু বর্জ্য বাংলাদেশের কোথায় ফেলা হবে তার পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে পারেনি বরাত পাওয়া রুশ সংস্থাটি। ঢাকা থেকে ২০০ কি.মি. দূরে পাবনা জেলা আর তার পাশেই ঈশ্বরডিহি উপজেলা, সবুজের সমারোহে, নির্মল পানীয় জল এখনও বর্তমান। সব বিষিয়ে যাবে

এই পারমাণবিক কেন্দ্র হলে। পাবনা পদ্মার উত্তরভাগে উত্তরবঙ্গে অবস্থিত হওয়ায় পাবনা ও তার আশপাশ শুধু নয় পদ্মা-যমুনা (ব্রহ্মপুত্র)- মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত দক্ষিণ বাংলাদেশের জেলাগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে জৈব বৈচিত্রে ভরা অগণিত নদী উর্বর ক্ষেত সুন্দরবনের অরণ্য। বিপন্ন হবে বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের একটি সামাজিক সংগঠন। ওরা এর বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিজ্ঞানের এই তেজস্ক্রিয়তাজনিত জটিল বিষয় ও প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি সাধারণ চোখে বোঝা যায় না— এই ধরনের দূষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠন একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে পরমাণু লবিও খুব শক্তিশালী। কিন্তু ফুকুসিমার পরে জাপানের মানুষদের রাস্তায় নামা দেখে পাবনা জেলার মানুষও উপলব্ধির মধ্যে ক্রমশ আনতে পারছে এই ভয়ংকর ও সর্বগ্রাসী দূষণকে।

এবার গঙ্গার পারের মানুষদের বোঝবার পালা পদ্মা যদি দূষিত হয় গঙ্গার অবস্থাও শোচনীয় হবে। তাই আর দেরী না করে পাবনার সাধারণ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। যেমন শাহবাগ আন্দোলনে আমরা দু- দেশের মুক্ত চিন্তার মানুষেরা এক হয়েছিলাম সেই রকম।

এন্ডোসালফানে কতটা ক্ষতির শিকার এদেশের মানুষ.....

—সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

এন্ডোসালফান এ দেশের মানুষের যে কতটা ক্ষতি করেছে তা জানবার জন্য আমাদের যেতে হবে ব্যাঙ্গালুরুর ফ্রিডম পার্কে। ২০১৫'র ১৮ নভেম্বর, ওই পার্কেই এক বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিতে হাজির হয়েছিলেন বিষাক্ত এন্ডোসালফানে আক্রান্ত কয়েকশো মানুষ। যাদের মধ্যে ৩২ জন ছিলেন একেবারেই শয্যাশায়ী। এন্ডোসালফান বিরোধী 'হোরাতা সমিতি'র নেতৃত্বে সেদিনের বিক্ষোভ সমাবেশের মূল দাবী ছিল ছয়টি ঃ (১) জুলাই মাস থেকে আক্রান্তদের সরকারী তরফে মাসিক বৃত্তি না পাওয়া। (২) কোন মোবাইল চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকা, (৩) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজন মত ওষুধ না পাওয়া। (৪) মানসিক রোগীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং ওষুধ না পাওয়া। (৫) ওই এলাকায় পুরুষত্বহীনতা এবং ক্যান্সারের মত অসুখে যারা অসুস্থ তাদেরকেও এন্ডোসালফানে আক্রান্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (৬) আক্রান্তদের এককালীন পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সেদিনের অবস্থান বিক্ষোভে স্ত্রী বিজয়া এবং বিছানায় শয্যাশায়ী ১০ বছরের মেয়েকে নিয়ে হাজির ছিলেন দক্ষিণ কানাড়ার পুত্তর তালুকের নেরালাকাট্টি গ্রামের জনার্দন গৌড়া। গৌড়া একজন সাধারণ শ্রমিক। গত চার মাস ধরে তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে স্টাইপেন্ডের ৩০০০ টাকা পাননি। ফলে মেয়েকে নিয়ে তাঁরা ভয়ঙ্কর সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। একই দশা ৫৮ বছরের ফতেমার।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ফতেমা পুত্তর তালুকের নেরিমোগারু গ্রামের বাসিন্দা। সেপ্টেম্বরে স্বামী আবদুল রেহমান মারা যাবার পর তিনিও তার ২৭ বছরের মেয়ে জেন্নাতকে নিয়ে অথৈ জলে পড়েছেন। এপ্রিল মাস থেকে তিনিও স্টাইপেন্ডের ৩০০০ টাকা পাননি। ওদিকে মেয়ের প্রায় প্রায়ই খিঁচুনি দিয়ে জ্বর আসে। মেয়েকে সুস্থ রাখতে প্রতি মাসে ২০০০ টাকার ওষুধ কিনতেই হয়। স্টাইপেন্ডের টাকা না পাওয়ার কারণে মেয়ের চিকিৎসা বাবদ ধার-বাকি বাড়ছিল... সে কারণে তাঁকে বাড়িটাও বিক্রি করতে হয়েছে।

আক্রান্ত দুই সন্তানের বাবা আব্দুল রাজ্জাকের কাহিনীটা আবার একটু অন্য রকম। ৩৬ বছরের রাজ্জাকও একজন শ্রমিক, পুত্তরের পাডনুরের বাসিন্দা। স্ত্রী জুবেদা ঘর সামলায়। এন্ডোসালফানে আক্রান্ত দুই সন্তানকে সামলাতেই যার দিন চলে যায়। বড় ছেলে ১১ বছরের মহম্মদ রফি শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই প্রতিবন্ধী। সে নিজে চলতেও পারে না। রাজ্জাক ও জুবেদা স্বামী-স্ত্রী কেউই প্রথমে তাঁরা সন্তানের সমস্যাগুলো ধরতে পারেনি। ১৮ মাস পরেও যখন ছেলে হাঁটতে পারছে না তখন তারা বুঝতে পারে। বড় ছেলে জন্মানোর চার বছর পরে দ্বিতীয় সন্তান রশিদ আসার পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাদের দুই সন্তান এখন তাদের ওপরেই নির্ভরশীল। রাজ্জাকের মাসে আয় ৬৫০০ টাকা। যেখানে তার দুই ছেলের পেছনেই চিকিৎসা বাবদ খরচ হয় ৭০০০ টাকা। রফি চিকিৎসার জন্য পেনশন বাবদ সরকারের কাছ থেকে পায় ১৬০০ টাকা। কিন্তু রশিদ এখনও পেনশনের যোগ্য হয়নি কারণ তার বয়স এখনও ৫'র নীচে। আশ্চর্য বিষয় তাদের দুই সন্তানই একই ভাবে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও একজন পেনশন পায় এবং সেটাও ৬ মাস ধরে বন্ধ। এমনিতেই প্রায়ই অসুস্থ থাকে তারা। গত কয়েক মাস রাজ্জাক নিজের জমানো টাকাতেই চিকিৎসা চালিয়েছে।। কিন্তু ওভাবে আর কতদিন চলবে! তাছাড়া বাচ্চাদের ফিজিওথেরাপির জন্য প্রতিদিনই প্রায় ১০ কি.মি. দূরের ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হয়। রাজ্জাকের মত বাবা-মায়েদের দাবী এন্ডোসালফানে আক্রান্তদের পেনশন ৫০০০ টাকা হওয়া উচিত। এবং যে মাসগুলোর পেনশন মেলেনি তা যেন অবিলম্বে পাওয়া যায়। এছাড়াও পুনর্বাসনের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে এককালীন ১০ লাখ দিতে হবে। এবং আক্রান্ত পরিবারদের বাসে চলা ফেরার জন্য ফ্রি পাশ দিতে হবে।

সেদিনের সমাবেশে আন্দোলনকারীদের বোঝাবার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মি: ইউ. টি খেদার উপস্থিত হয়ে বলেন, ''আমরা গত বছর (২০১৪) দক্ষিণ কানাড়াতে সার্ভে করে আক্রান্তদের চিহ্নিত করি এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে দেবার জন্য পরিচয়পত্র দেই। জেলার মন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুসারে ২৬৯৩ জন আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র ১৯৯ জন এখনও পেনশন পায়নি, কারণ কিছু ভুয়ো কেস আটকাবার জন্য তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আর একটি সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে যারা প্রকৃত আক্রান্ত তাদের চিহ্নিত করা যায়। পাশাপাশি ম্যাঙ্গালোর হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিচয় পত্রের সাহায্যে বিনাপয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গাড়িরও ব্যবস্থা রয়েছে যাতে আক্রান্তরা সহজে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারে। তিনি কথাও দেন, রাজস্ব দফতর যাতে অতিশীঘ্রই ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয় তার জন্য তিনি আবেদন জানাবেন। এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যাতে বাড়ানো হয় সে ব্যাপারেও আর্জি জানাবেন। মন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে হোরাতা সমিতির সভাপতি শ্রীধর গৌড়া বলেন, মন্ত্রী মহোদয় মিথ্যে বলছেন... আমি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কপি দিয়ে প্রমাণ দিতে পারি আক্রান্তদের মধ্যে ১৬০০ জন ক্ষতিপূরণ পায়নি। তাছাড়া বেসরকারী হাসপাতালগুলো চিকিৎসা করতে চাইছে না। এবং হাসপাতালে পৌঁছবার গাড়িও সহজে পাওয়া যায় না।

আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ দেবার মত বিষয়টিও সরকার মেনে নেয় ২০১৫'র এপ্রিলে কর্নাটক হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর। যদিও হাইকোর্ট ক্ষতিগ্রস্থদের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধে দেবার কথা বলেছিল মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়ার সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো দিতে অসমর্থ হয়। হাইকোর্ট বলেছিল, সরকারের উচিত অন্ততঃ ৩০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্তদের মাসিক ভাতা হিসেবে দেওয়া। এবং এর পাশাপাশি আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছিল; যেমন ডে-কেয়ার সেন্টার, স্টাফ নার্স, ডাক্তার, রুগী আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ি, মোবাইল হাসপাতাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এসব কোন কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি, শুধুমাত্র ভাতা ছাড়া। সরকারি ভাবে বেলথানগাডি তালুকের কোক্কাডা ও পুত্তর তালুকের আলাস্কারুতে কেবলমাত্র দুটি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু হয়। যেখানে সরকার হাইকোর্টের কাছে কম করে পাঁচটি সেন্টার চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আসলে সরকার কোর্টের নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হয়েছে। পেনশন দিতে দেরী হয়েছে। সরকারি ব্যর্থতার পাশাপাশি আবার উল্টো চিত্রও রয়েছে। সুল্লা তালুকের গুট্টিগারু গ্রামে এক ডাক্তারবাবু রয়েছেন যে স্ব-উদ্যোগেই নিজের গাড়ি নিয়ে আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করে বেড়ান।

সরকারের সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে রাজ্যের ৪০০০-৪৫০০ মানুষ এন্ডোসালফানে আক্রান্ত। অক্ষমতার মাত্রার নিরিখে ভাতা নির্ধারণের জন্য সরকার বারংবার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করেছে। এবং যারা ২৫%-৬০% ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জন্য ১৫০০ টাকা এবং যারা ৬০%'র বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জন্য ৩০০০ টাকা ভাতা নির্ধারিত করেছে। কিন্তু ১৮ নভেম্বর প্রায় ৬০০ জন আক্রান্ত নিঃশব্দ প্রতিবাদ জানিয়েছিল কারণ তারা পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে ভাতা পাচ্ছিলেন না। আক্রান্তদের ভাতা না পাওয়ার জন্য রাজস্ব বিভাগ, সামাজিক সুরক্ষা দপ্তর এবং পেনশন ডিরেক্টরেট এই তিন দপ্তর দায়ী।

আক্রান্তদের পক্ষ থেকে মি. শ্রীধর গৌড়া, (যার নিজের দৃষ্টিশক্তিও একটু একটু করে ঝাপসা হয়ে আসছে) বলেন, ''সরকার আক্রান্তদের দাবীকে অগ্রাহ্য করছে। ফলে আক্রান্তরা ঋণ নিয়ে চিকিৎসা করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারের অনীহাই আমাদের বাধ্য করেছে ন্যায় পাওয়ার লক্ষ্যে ফ্রিডম পার্কে আসতে। আক্রান্তরা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

অন্ততঃ পাঁচ মাস ধরে কোন ভাতা পাচ্ছে না। দাবী জানাবার পরে কয়েকজন পেয়েছে সেটাও জুন মাসের''। তিনি বলেন গত দু'বছর ধরে তারা প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন ন্যায় পাওয়ার জন্য। এবং হাইকোর্টের নির্দেশের পরও সরকারের স্বদিচ্ছা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। ''কতদিন আর এই অন্ধকারের মধ্যে আমরা বেঁচে থাকব।''

কিন্তু কেন? কিভাবেই বা এন্ডোসালফানে আক্রান্ত হল মানুষগুলো? সময়টা ১৯৮৩ সাল। হ্যাঁ তখন থেকেই প্রতি বছর কর্নাটক কাজু উন্নয়ন বোর্ড আকাশ থেকে এন্ডোসালফান স্প্রে করা শুরু করে দক্ষিণ কানাড়ার পুত্তর, বেলথানগাডি, বান্টোয়াল তালুক, উত্তর কানাড়া এবং উডুপির কাজু বাগানগুলোর ওপর। প্রথম দিকে অবশ্য এন্ডোসালফানের প্রভাব সেভাবে কেউ বুঝতে পারেনি। বছর ১০-১৫ যেতেই ওইসব তালুকের গ্রামগুলোতে শুরু হয় ত্বকের অসুখ, চোখের সমস্যা, ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগ। কিন্তু এন্ডোসালফানের ভয়ঙ্কর রূপটা প্রকট হল যখন দেখা গেল ওই অঞ্চলের বেশির ভাগ সদ্যজাত শিশুই শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধতা নিয়ে জন্মাচ্ছে। একজন, দু'জন করে বংশ পরম্পরায় অসুখগুলো ছড়াতে শুরু করলো। যখন মানুষ বুঝতে পারল ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। কর্নাটক জুড়ে এন্ডোসালফান ব্যবহারের বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন। ইতিমধ্যে পাশের রাজ্য কেরল ২০০৬'র ৩১ অক্টোবর নিষিদ্ধ করে দেয় এন্ডোসালফানের ব্যবহার। খালি তাই নয়, তারা আক্রান্তদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান দেবারও ব্যবস্থা করে। কিন্তু কর্নাটকে এন্ডোসালফান প্রস্তুতকারকদের লবি এতটাই সক্রিয় ছিল যে তারা নিষিদ্ধ না করার জন্য সমস্ত রকম কলকাঠি নাড়িয়ে যাচ্ছিল। যে কারণে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার এন্ডোসালফানের পক্ষে কথা বলছিলেন। অবশেষে ২০১১'র ১৭ ফেব্রুয়ারী কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি. এস. ইদ্দিয়ুরাপ্পা এন্ডোসালফানের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বর্তমানে সারা পৃথিবীর ৬০টিরও বেশি দেশে এন্ডোসালফানের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ভাবতে ভয় হয়, শুধু এক এন্ডোসালফানের দাপটেই এ দেশের একটি রাজ্যের এতগুলো মানুষের জীবন আজ বিপন্ন। বাদবাকি কীটনাশকের প্রভাবে তাহলে কি ঘটতে চলেছে...! আগামী প্রজন্ম...সভ্যতা আমরা রক্ষা করতে পারবো তো?

রেজারেকশন — *দীপাঞ্জন রায়*

জৈব খাদ্যবৈচিত্র্য ফিরে পেতে একসঙ্গে পথ চলা।

উড়কি ধানের মুড়কি/বিন্নি ধানের খই....

সেই কবেকার কোন ধূসর অতীত থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নাম-না-জানা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না পেরোনো কৃষকেরা ধানের আদিম প্রজাতি থেকে নানান উদ্ভাবনী পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে, এক একটা করে বৈশিষ্ট্যকে সযত্নে বাছাই করে নতুন নতুন অজস্র জাতের ধান তৈরী করেছেন—কখনো বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করে তোলার জন্য আবার কখনো বা রসনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কিম্বা শুধুই নান্দনিক প্রেরণায়। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই, যার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ধান জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে, ১৯৬৫ সাল পর্যন্তও প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির দেশীয় ধানের সন্ধান পাওয়া যেত। এর মধ্যে কোনো কোনো ধান জন্মাত সুন্দরবনের নোনা মাটিতে, কোনটা শুকনো খটখটে সেচবিহীন জমিতে, কোনটার শীষ ছিল আবার এতটাই উঁচুতে যে সহজেই দক্ষিণবঙ্গের জলাজমিগুলোতে ফলতে পারে। সুগন্ধি চালের মধ্যে ছিল গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি, কালোনুনিয়া, কালোভাত; সুন্দর সরু চালের মধ্যে সীতাশাল, রূপশাল, বাঁশকাঠি; সুস্বাদু ভাতের জন্য কয়া, বকুলফুল, মধুমালতী, ঝিঙেশাল, চামরমণি; অপরূপ খই তৈরী হত কনকচুর, বিন্নি, ভাসামানিক বা লক্ষ্মীচূড়া ধান থেকে; মুড়ির জন্য রঘুশাল, লাল ঝুলুর, চন্দ্রকান্ত, মুর্গিবালাম আর পায়েসের ছোটদানার চাল হিসেবে তুলসীমঞ্জরী, শ্যামা, তুলসীবকুল আর বৌপাগলি। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা এইসব দেশীয় ধান মানুষের, মাটির আর পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের জন্য ছিল সহায়ক।

''বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল''

অবস্থাটা আমূল পাল্টে যেতে শুরু করলো ''সবুজ বিপ্লবের'' সূচনা থেকে, গত শতাব্দীর ষাটের দশক নাগাদ। বেশি উৎপাদনশীলতার লোভ দেখিয়ে তথাকথিত উচ্চফলনশীল বীজ,

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশকের এবং ভূস্তরের জলের যে যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করা হলো, আজ তার পেছনে বহুজাতিক রাসায়নিক কোম্পানিগুলোর মুনাফা অর্জনের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, শুধু ভারতেই নয় পৃথিবীর যেখানে যেখানে এটা লাগু করা হয়েছিল, সেখানেই। তেমনি স্পষ্ট হয়ে গেছে মানুষ আর পরিবেশের ওপর এই পদ্ধতিতে চাষের ভয়ংকর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো। যত নিবিড়ভাবে ''সবুজ বিপ্লব''কে গ্রহণ করা হয়েছে ততই চাষের খরচ তত বেড়েছে হুহু করে, ফসল বিক্রি করে ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক, মাটিতে বিভিন্ন ম্যাক্রো আর মাইক্রো এলিমেন্টের ঘাটতি আর জৈব উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জমির উর্বরতা কমে গেছে মারাত্মকভাবে, পাম্প দিয়ে ক্রমাগত জল তোলার ফলে মাটির নিচের জলস্তর নেমে গেছে সংকটজনক স্তরে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ফসলের চাষের পরিবর্তে একটা দুটো ফসলের চাষের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক ফসলের ওপর ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের আক্রমণ বাড়িয়েছে, কীটনাশকের যথেচ্ছ, অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারে অনেক বন্ধু কিম্বা নিরীহ পোকাও পরিণত হয়েছে ক্ষতিকর পেস্ট-এ। রাসায়নিক সারের প্রয়োগ জমিতে আগাছার উপদ্রব-ও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি যে উৎপাদনশীলতাকে সামনে রেখে নতুন কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হল, কিছু বছর পর সেই উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি শুধু থমকেই যায়নি, পাঞ্জাবের মত রাজ্যের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই তার নিম্নগতি আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। এরই পাশাপাশি, অনেকটাই নীরবে, ''উচ্চফলনশীল'' ফসলের দাপটে, বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ আর জলবায়ুর উপযোগী, বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ-স্বাদ-সুগন্ধ যুক্ত, ভিটামিন, মিনারেলস আর বিভিন্ন খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ দেশীয় ধানের অসংখ্য প্রজাতি হয়ত চিরতরেই হারিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে আজ খুব বেশি হলেও ২০০ প্রজাতির বেশি ধান হয় না, তার মধ্যেও অনেকগুলো দ্রুত অবলুপ্তির পথে। একজন কৃষিবিজ্ঞানী এই ঘটনার তুলনা করেছেন বিপুল গণহত্যার সঙ্গে । অথচ তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ভারতে এক লক্ষ প্রজাতির বেশী ধান চাষ হত।

অন্যদিকে রাসায়নিকের সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ব্যবহারের ফলে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে কৃষক আর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর। এ বিষয়ে আমাদের দেশে যে সামান্য গবেষণামূলক কাজ হয়েছে তাতেই খাদ্যশস্য, শাকসব্জি, পানীয় জল, মোষের দুধ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কীটনাশকের সন্ধান মিলেছে। পাঞ্জাবের চারটি গ্রামের মানুষের রক্তের নমুনার মধ্যে ১৫ ধরনের বিভিন্ন কীটনাশককে সনাক্ত করা গেছে। পাঞ্জাব দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আর পিজিআই চন্ডিগড়-এর এক যৌথ গবেষণায় জানা গেছে পাঞ্জাবের তুলো চাষের কেন্দ্র ভাটিন্ডায় রাসায়নিকের

যথেচ্ছ ব্যবহারে ক্যান্সারের প্রকোপ মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। অবস্থাটা এতটাই খারাপ যে প্রতিদিন প্রায় ১০০ ক্যান্সার রুগী ওখান থেকে চিকিৎসার জন্য ট্রেনে করে রাজস্থানের বিকানীরের একটি ক্যান্সার কেন্দ্রে যান—স্থানীয় মানুষেরা ট্রেনটিকে ''ক্যান্সার ট্রেন'' নামে ডাকেন। এসবের ফলেই সারা পৃথিবী জুড়ে বিত্তশালী মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে বিষমুক্ত খাদ্যের স্বতন্ত্র আয়োজন করতে উদ্যত হয়েছে। ফলে নানান দেশে জৈব চাষের আবার কিছুটা হলেও প্রচলন বাড়ছে, কিন্তু খুবই সীমিত দায়রায়, মূল উদ্দেশ্য তার প্রথম বিশ্বের (এবং কিছুটা তৃতীয় বিশ্বেরও) বড়লোকদের খাবার প্লেটে রাসায়নিক বিষমুক্ত খাবার তুলে দেওয়া। সাধারণ মানুষের তা আয়ত্তের বাইরে। একইভাবে আজ যে জিন মডিফায়েড ক্রপ বা জিএম শস্যের বিপদ সম্পর্কে পৃথিবী জুড়েই অসংখ্য বিজ্ঞানী আর সচেতন মানুষ মুখর, সেই জিএম শস্য প্রথম বিশ্বের অনেক দেশেই নিষিদ্ধ হলেও ভারতে আবার নতুন করে কোম্পানিগুলোকে এর পরীক্ষা নিরীক্ষার ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম	খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য	কীটনাশকের উপস্থিতি
১)	দুধ	ডি.ডি.টি. ও এইচ.সি.এইচ.
২)	খাদ্যশস্য	ডি.ডি.টি. ও এইচ.সি.এইচ.
৩)	শাকসব্জি	এন্ডোসালফান, ক্লোরপাইরিফস, কুইনলফস, মোনোক্রোটোফস, মিথাইলপ্যারাথিয়ান, সাইপারমেথ্রীন
৪)	ফল	এন্ডোসালফান, মালাথিয়ান, ডাইমিথোয়েট
৫)	তুলো ও ডাল	এন্ডোসালফান, ফেনিট্রিয়োথিয়ন, কুইনলফস, ফেনভোলেরেট, সাইপারমিথ্রীন,ডেল্টামিথ্রীন, আল্ফামিথ্রীন
৬)	পশু খাদ্য	ডি.ডি.টি., এইচ.সি.এইচ., মালাথিয়ন, এন্ডোসালফান, ডাইকাফল

সূত্র ঃ এন্টোমোলজি বিভাগ, পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লুধিয়ানা

''কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে—তবে''

এইরকম নানা হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে বর্ধমানের আউশগ্রাম ব্লকের কিছু কৃষক এক আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে জিএম বীজ, পেট্রো-রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তুলে এনে চাষ করারও বিপক্ষে তারা। ইতিমধ্যেই তাঁরা হারিয়ে যেতে বসা পর্যাপ্ত খাদ্যগুণ-সমৃদ্ধ দেশী ধানের অনেকগুলি বীজকে পুনরুদ্ধার করেছেন।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

শুধুমাত্র জৈব সারের প্রয়োগে সম্পূর্ণ বিষমুক্ত উপায়ে সেই দেশী ধানের উৎপাদন করাও শুরু করেছেন। শুধু চাল-ই নয়, খই-মুড়িসহ নানা চালজাত খাবার এবং ডাল-সবজিসহ আরও অন্যান্য জৈব খাদ্যসম্ভার তাঁরা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিতে চাইছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু গবেষক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসহ সাধারণ মানুষ এই সাহসী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রেজারেকশন এই সমগ্র উদ্যোগটিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরো ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তে কৃষিজাত খাদ্যসামগ্রীর আউটলেট খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নয়, কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষকরা যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পান ও সাধারণ মানুষ যাতে বিষমুক্ত খাদ্যসামগ্রী ন্যায্যমূল্যে পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা ঃ

১) আগামী ৩ মাসের মধ্যে বর্ধমানের আউশগ্রাম ব্লকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি জোগাড় করে কৃষকদের সম্মিলিত উদ্যোগে একটি ধান-সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা। কৃষকরা যে বীজগুলি সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে আগামী আমন চাষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে সেগুলিকে উৎপাদন করা। সেই চাল প্রস্তুত করা ও সংরক্ষণের জন্য ওই জমিতে একটি চাতাল নির্মাণ, পুকুর-খনন ও গো-ডাউন নির্মাণ জরুরী।

২) ইতিমধ্যে কলকাতার রাসবিহারী মোড় ও হুগলীর উত্তরপাড়া বাজারে রেজারেকশন-এর দুটি আউটলেট চলছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ও বেলঘরিয়ায় আরও দুটি আউটলেট খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩) এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ও প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে/প্রতিষ্ঠানে আলোচনা-চক্র, প্রদর্শনীর আয়োজন করা। কৃষকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ও সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সহজবোধ্য প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করা।

এই সমস্ত উদ্যোগে আমরা আপনাকে, আপনাদের আমাদের সঙ্গে চাই—শুধু ক্রেতা হিসেবে নয়, এর প্রচারে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে, ঘরোয়া/প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা সভা আয়োজন করে, আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে এবং সার্বিকভাবে উদ্যোগটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে।

আপনার যেকোনো প্রশ্ন, মতামত, পরামর্শের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ঃ

যোগাযোগ ঃ + ৯১ ৯৪৭৭১৭৩০৮২, + ৯১ ৮৩৭৫৮৮২৮০৪, + ৯১ ৯৭৪৮৮৬৮৬৯৭

ই-মেল ঃ resurrection.eco@gmail.com

এই মুহূর্তে যেসমস্ত রেজারেকশন কেন্দ্রগুলো চলছে ঃ

* ৪১ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৬ (রাসবিহারী মোড়, কালীঘাট মেট্রোর গায়ে) প্রতি সোম থেকে শনি, দুপুর ২টো - রাত ৮টা

* উত্তরপাড়া মাদার ডেয়ারী, (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের পাশে), (সকাল ৬-১০টা, সন্ধেবেলা ৫.৩০-৯টা)

এই মুহূর্তে আমাদের কাছে যে চালগুলি আছে ঃ

তুলাইপাঞ্জি ঃ লম্বা সরু হালকা সুগন্ধি চাল

কালোনুনিয়া ঃ লম্বা সরু অতীব সুগন্ধি (আতপ) চাল, পায়েসের জন্য, ফ্রাইড রাইস-এর জন্য ব্যবহৃত হয়

জেসমিন রাইস ঃ লম্বা সরু অতীব সুগন্ধি বাসমতির সমতুল্য চাল; বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস বানানোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী

চামরমণি ঃ সুস্বাদু, লম্বা সরু (সেদ্ধ) চাল

কবিরাজশাল ঃ লম্বা, ভেষজ গুণসম্পন্ন চাল, (এতে জিঙ্ক ও আয়রন-এর পরিমাণ অন্যান্য চালের তুলনায় বেশি)

মোহনশাল ঃ মাঝারি-লম্বা সরু চাল

গোবিন্দভোগ ঃ সুগন্ধি, ছোট দানাদার, পায়েসের জন্য বিশেষ উপযোগী

তুলসীমঞ্জরী ঃ মাঝারি লম্বা সুগন্ধি চাল

কালোভাত ঃ অতীব সুগন্ধি মাঝারি লম্বা ভেষজ গুণসম্পন্ন চাল

বহুরূপী ঃ রোজকার ভাত খাবার উপযোগী চাল

কেরালা সুন্দরী ঃ রোজকার ভাত খাবার উপযোগী চাল

দেরাদুন গন্ধেশ্বরী ঃ লম্বা সরু সামান্য গন্ধযুক্ত চাল

দুধেশ্বর ঃ লম্বা সরু সামান্য গন্ধযুক্ত চাল

কনকচূড় ধানের খই।

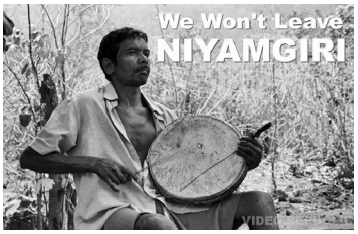

(কৃতজ্ঞতা : অভ্র চক্রবর্তী)

● রিও ওলিম্পিকে পদকপ্রাপ্তি (প্রথম পাঁচ ও ভারত)

ক্রমসংখ্যা	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১.	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪৬	৩৭	৩৮	১২১
২.	গ্রেট ব্রিটেন	২৭	২৩	১৭	৬৭
৩.	চীন	২৬	১৮	২৬	৭০
৪.	রাশিয়া	১৯	১৮	১৯	৫৬
৫.	জার্মানী	১৭	১০	১৫	৪২
৬৭.	ভারত	০	১	১	০২

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি সফল সমীকরণ

—সূচনা সেন

পশ্চিমবঙ্গ ও বাল্য বিবাহ ঃ ২০০৬ সালে নতুন রূপে 'প্রহিভিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট (পিসিএমএ) ভারতে আসে। এই আইন বলে মেয়েদের ও ছেলেদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ২১ বছর। কিন্তু এই আইন সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে বাল্য বিবাহের ঘটনা যথেষ্ট বেশী ঃ ২০০৭-'০৮ সালের 'ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল হাউসহোল্ড অ্যাণ্ড ফ্যামিলিটি' সার্ভে-৩ (ডিএলএইচএস-৩)-র তথ্য অনুযায়ী আমাদের রাজ্য সারাদেশে বাল্য-বিবাহের অভ্যাসে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই অভ্যাস গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরের বস্তি অঞ্চলেও যথেষ্ট প্রচলিত। এমনকি কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলেও ২৫%। এরও বেশি মেয়েদের বিয়ে হয় ঐ বয়সের আগে।

ডিএলএইচএস-৪ (২০১২-১৩) অনুযায়ী সারা রাজ্যে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে বিবাহিত মেয়েদের শতকরা হার ৩২.১%, গ্রামাঞ্চলে এই হিসাব ৩৫.৩% এবং শহরাঞ্চলে ২১.৩%। বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, নদীয়া আর পুরুলিয়া জেলায় বাল্য-বিবাহ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

সেনসাস ২০১১ অনুযায়ী এই রাজ্যে ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হওয়া মহিলাদের শতকরা হার ৪০.১৪%, যেখানে সারা দেশে ঐ হার ৩০.২১%।

বাল্য-বিবাহ এই রাজ্যে একটি প্রচলিত অভ্যাস। এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের এটি বেশী প্রভাবিত করে। নাবালিকাদের ওপর যৌন নিপীড়নের এটি একটি বৈধ ব্যবস্থা। বাল্য বিবাহের সঙ্গে যুক্ত আছে শিশু শ্রম, পাচার ও সর্বোপরি মেয়েদের অব-ক্ষমতায়ণের বিষয়টি। অন্যান্য সংযুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের শারীরিক সমস্যা, প্রসবের সময় মৃত্যু, শিশু মৃত্যু, অসুস্থ অপরিণত শিশুর জন্মদান ও সর্বোপরি মেয়েদের অশিক্ষা বা অসম্পূর্ণ শিক্ষা।

বাল্যবিবাহ রোধে সরকারী উদ্যোগ ঃ

পিসিএমএ ২০০৬ গৃহীত হওয়ার পর শিশু বিকাশ নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে নানা উদ্যোগ ঘোষিত হয়। যার মুখ্য উদ্দেশ্য বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ। এগুলো বেশির ভাগই ঘোষণার স্তরে থেকে যায়। মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় কিছু উদ্যোগ শুরু হয়, বেশ কিছু রঙিন কাগজ ছাপা হয়, যা কোনোভাবেই সমস্যাটির ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে না।

এর নানা কারণ আছে ঃ বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের কাছে বাল্যবিবাহ একটি প্রথা, যা না মানলে সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। এটি একটি প্রথাগত অভ্যাস বা ঐতিহ্য যা বহু যুগ ধরে চলে আসছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা একে পোষণ করে চলেছে। তাদের কাছে এই প্রথা ভঙ্গ তাদের ক্ষমতার ভিত্তিতে আঘাত হানতে পারে— তাই প্রতিরোধ সর্বাত্মক। সর্বোপরি দারিদ্র্য। এই কারণে অপরিণত মেয়েদের বিয়ে অধিকাংশ সময়েই পাচার, শিশুশ্রম, যৌন দাসত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

এমত অবস্থায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে এই সমস্যার আশু সমাধান ও তৎসঙ্গে বহু মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলার রাস্তা, যা তাদের ভোটব্যাঙ্ককেও প্রভাবিত করতে পারবে, খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে। ২০১৩ সালের এপ্রিল-মে মাস নাগাদ প্রথম 'কন্যাশ্রী' গ্রহণের উদ্যোগ শুরু হয়। তখনো নামকরণ হয়নি। ইউনিসেফের সহযোগিতায় একাধারে বেস-লাইন ষ্টাডি শুরু হয়। অন্যদিকে শিক্ষা, শিশু বিকাশ নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ইত্যাদি দপ্তরের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক শুরু হয় কিভাবে এই প্রকল্প মাঠে নামতে পারে সে বিষয়ে। একটি পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। এবং ২০১৩ সালের ১লা অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বিপুল জন-সমাবেশে, বলা চলে ছাত্রী সমাবেশে, কন্যাশ্রী প্রকল্প উদ্বোধন হয় নেতাজী ইনডোর ষ্টেডিয়ামে।

মুখ্যমন্ত্রী তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, মেয়েরা আমাদের ঘরের সম্পদ— এরাই ভবিষ্যতে দেশ চালাবে সুতরাং যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে এদের আত্মশক্তি বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে। তিনি মা-বাবাদের বলেন বাল্য অবস্থায় এদের বিয়ে না দিয়ে এদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর

সুযোগ দিতে। তিনি বোতাম টিপে ১০,০০০ মেয়ের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে ৫০০ টাকা করে কন্যাশ্রী প্রকল্পের বার্ষিক অনুদান হিসেবে অর্থ হস্তান্তর করেন। বহু মন্ত্রী-আমলা সর্বোপরি জনমানসের স্বপ্নের বাংলা সিরিয়াল ও টলিউডের নায়ক-নায়িকাদের মঞ্চে তুলে, তাদের দিয়ে গান গাইয়ে এই প্রকল্পের সূচনা করেন।

কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়— কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়ণ, বাল্যবিবাহ রোধ, আপন্ন সময়ে তারা যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে ও সর্বোপরি তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

এই প্রকল্পে মেয়েরা যদি ১৩-১৯ বছর বয়সী হয় তবে তাদের শর্তসাপেক্ষে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। শর্তগুলো হ'ল ঃ তার পরিবারের বার্ষিক আয় ১,২০,০০০ টাকা বা তার কম হতে হবে, মেয়েটিকে সরকার স্বীকৃত/বেসরকারী বিদ্যালয়, এই রাজ্যের মুক্ত বিদ্যালয়, অথবা সমতুল্য বৃত্তিমূলক/কারিগরী সংস্থায় পাঠরতা থাকতে হবে, অবিবাহিতা থাকতে হবে, কলেজ/বৃত্তিশিক্ষা কেন্দ্র/খেলাধুলা শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাধীন থাকতে হবে অথবা জুভেনাইল জাষ্টিস অ্যাক্ট ২০০০-এ নথীভুক্ত কোনো হোমের আবাসিক হ'তে হবে। ৪০ শতাংশের বেশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা জুভেনাইল জাষ্টিস অ্যাক্ট ২০০০-এ নথীভুক্ত হোমের আবাসিকদের ক্ষেত্রে আয়ের কোনো ঊর্দ্ধসীমা প্রযোজ্য নয়।

প্রকল্পটি দুটি ভাগে বিভক্ত ঃ কন্যাশ্রী$_{১}$ (কে$_{১}$) সহায়তা— এটি ১৩ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সের মেয়েরা এক বা একাধিক বার পেতে পারে। ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত এই সহায়তার পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৫০০ টাকা। ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছর থেকে এই পরিমাণ বাড়িয়ে বার্ষিক ৭৫০ টাকা করা হয়। কন্যাশ্রী$_{২}$ (কে$_{২}$) বা এককালীন সহায়তা। ১৮ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত বয়সী মেয়েরা এই সহায়তা পাবে। পরিমাণ এককালীন ২৫০০০ টাকা।

কন্যাশ্রী প্রকল্প একটি সম্পূর্ণ অন্তর্জাল নির্ভর প্রকল্প। আবেদন পত্র জমা, তা অনুমোদন ও টাকা নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত পুরো কাজটাই কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করে করা হয়। এমনকি অভিযোগ জমা দেওয়া, নিজেদের ২০-সংখ্যার পরিচয়-সংখ্যা দিয়ে আবেদন পত্রের অবস্থা জানা, পরিচয়পত্র ও কন্যাশ্রী প্রকল্প পাওয়া মেয়েদের জন্য সংশাপত্র দেওয়া— পুরোটাই অনলাইন-নির্ভর। সরকারী ওয়েবসাইট-www.wbkanyashree.gov.in-অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সহজ ব্যবহারযোগ্য এবং স্বচ্ছতাসম্পন্ন।

আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্যারাটে, উশু, তাইকুণ্ডু ইত্যাদি প্রশিক্ষণ, হাতের কাজ শিক্ষা, ডব্লিউ বি সি এস বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সহায়তা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন জেলাভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পের জনপ্রিয়তা বিশ্বের দরবারেও বার বার স্বীকৃত হয়েছে ও সমাদৃত হয়েছে। দেশীয় ও বৈদেশিক নানা স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও আমলাদের অফিসের দেওয়াল ভরিয়ে তুলেছে। এই বছরেও এই প্রকল্পটি ই-গভর্নেন্স বিভাগে আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জের ডব্লিউ এস আই এস-২০১৬ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

গত আর্থিক বছরে ১০০০ কোটি টাকারও বেশি এই প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে এবং ৩৪ লক্ষেরও বেশি মেয়ে এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

শেষ কোথায় ঃ

মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের এই প্রকল্প সরকারী প্রয়োগকারীদের হাত ধরে তর তর করে এগিয়ে চলেছে। ১৬০০০ স্কুল/কলেজ ও অন্যান্য সংস্থা এই প্রকল্পের আওতাধীন থেকে তৃণমূল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। ব্লক ও মহকুমা স্তরে একজন করে সরকারী কর্মী এই প্রকল্প দেখভালের জন্য আছেন, ২০টি জেলায়, আর দার্জিলিংকে জিটিএ ও নন-জিটিএ হিসেবে ভাগ করে ২১টি ডিষ্ট্রিক্ট প্রজেক্ট মনিটারিং ইউনিট (ডি পি এম ইউ)-তে একজন নোডাল অফিসার ও তিনজন কর্মী কাজ করছে। রাজ্য স্তরে ষ্টেট প্রজেক্ট মনিটারিং ইউনিট (এস পি এম ইউ) গঠিত হয়েছে। সর্বোপরি ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টার (এন আই সি) ওয়েব সহায়ক হিসেবে কাজ করে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে পছন্দের প্রকল্প, তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা রচনা করেছেন এমনকি লোগোটাও তার আঁকা। জেলা ও রাজ্য স্তরে সর্বত্র চাকরী বাঁচাবার তাগিদেই মন্ত্রী, আমলা থেকে চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীরাও প্রাণপণে ভালো ও নতুন কিছু করে দেখানোর জন্য ছুটে চলেছেন। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন ১৪ই আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত কন্যাশ্রী দিবস। ঐ দিনটিকে আরো রঙিন করে তুলতে জেলায় জেলায় ও রাজ্যে সবাই নানা অনুষ্ঠান করে চলেছে। টাকা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কন্যাশ্রীর টাকা অর্থ দপ্তর আটকাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সঙ্কেত রয়েছে।

সম্পূর্ণ রাজ্যের অর্থে চলা এই প্রকল্পের বর্তমান বছরের ব্যয় বরাদ্দ ১০৫০ কোটির কাছাকাছি পৌঁছবে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ওই প্রকল্পকে আর একটু বাড়িয়ে কন্যাশ্রী-প্লাস প্রকল্পে টাকা ঢালতে চাইলেও ঋণ না নেওয়ার যুক্তিতে কেন্দ্র তা বাতিল করে দিয়েছে। অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে বর্তমান তৃণমূল সরকারের ভোটব্যাঙ্ক এর লালন এবং সমৃদ্ধির বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই আর্থিক সহায়তার (কণ্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার বা সিসিটি) সাথে দেদারে বিলোচ্ছে সাইকেল, জুতো ও স্কুল-ব্যাগ। এই অর্থভারের চাপ আর কতদিন রাজ্য সরকার বহন করতে সক্ষম হবে? কিভাবেই বা সক্ষম হবে? তার কোন উত্তর আমাদের কাছে নেই। বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের গ্রামীণ মূলত দলিত, পশ্চাদপর ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকল্পের জনপ্রিয়তা প্রবল। আগামীদিনে এই প্রকল্প তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে, অথবা নতুন রূপে বিকশিত হয়ে ২০২১ বিধানসভার প্রচারেও আলোড়ন তুলবে, না কি স্থিতাবস্থা বা সীমাবদ্ধতার ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে একসময় আলোড়ন তোলা আরো অনেক প্রকল্পের মত হারিয়ে যাবে, সেকথা ভবিষ্যতই বলবে।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

‘বান্ধবী আছে আকাশের মতো নারী’

—সুদক্ষিণা বসু

সামাজিক বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতায় নারী আলাদা হয়ে যায় পুরুষের থেকে। সিমোন দ্য বুভ্যায়ার সেই কিংবদন্তীপ্রতিম কথা আমাদের সবার কাছেই পরিচিত— নারীত্ব একটি নির্মাণ। মানুষ ‘নারী’ হয়ে ওঠে। আবার নারীবাদেরই একটি গোত্র বলছে শারীরিক গঠনকাঠামো ছাড়া নারী ও পুরুষে বস্তুত কোনও প্রভেদ নেই। নারীর অনুভূতি ও লেখালেখিকে যাঁরা আলাদা করে দেখতে চান, তারা মূলত প্রথম গোত্রের সমর্থক। নারীর ভাষা ও লেখাকে পুরুষ অধিকৃত ভাষা ও সাহিত্যজগত থেকে আলাদা করে এনে গোত্রায়ন করা শুরু হয়েছিল নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ থেকে। এই তরঙ্গের নারীবাদী কেট মিলেট তাঁর গ্রন্থ ‘সেক্সুয়াল পলিটিক্স’-এ ‘ফ্যালোসেনট্রিক লিটারেচার’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। মিলেট দেখিয়েছিলেন সমাজে শক্তিকেন্দ্রের ও ক্ষমতা উৎসের মূলে রয়েছে পুরুষ। ভাষা ও সাহিত্যেও তাই, মিলেট দেখালেন লেখক কখনও কখনও পিতৃতন্ত্রের কঠোর অনুশাসক হয়ে ওঠেন। তাঁর রচনায় সমাজবিধি লঙ্ঘনকারী নারীকে পিতার মতোই শাস্তি দেন। যদি নারী তার নিজস্ব যৌনবোধ দ্বারা চালিত হয়, তাহলে শাস্তির পরিণাম কখনও গিয়ে দাঁড়ায় মৃত্যুতেও। আর এই অনুশাসনের ভয়ে নারী নিজস্ব যৌনতার কথা বলে ওঠে না কখনও, মিলেট, দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যানুসারেই, জোর দিলেন বৈকল্পিক সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যনির্মাণে, যা লেখা হবে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে। এরই ফলশ্রুতিতে তৈরি হল গাইনোসেন্ট্রিক লিটারেচার বা গাইনোসেন্ট্রিউজম। যার লক্ষ্য ছিল নারীর ভাষা ও ভাবনার উন্মোচন।

বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পূর্বে নারীকণ্ঠে সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যভাবনারই অনুরণ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের নারী ঘরগেরস্থালি সন্তানস্নেহ এবং সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে কথা বলেছে। প্রেমের অনুভূতির কথাও প্রথমে দাম্পত্য ও পরে পূর্বরাগ হিসাবে আমরা পেয়েছি। কিন্তু কবিতায় নারী তার যৌনতার কথা বলছে— এ বিষয়টি পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকদিন। এখানেও আবার নারী হেজিমনির বাইরে যেতে পারেনি। পুরুষকে বিষয় বা সাবজেক্ট হিসেবে রেখে তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন নিজেকে, নিজের শরীরকে বিষয় বা অব্‌জেক্ট রূপে। তবে আপাতত আমরা সে পুরুষের প্রতি ছদ্মবিরোধিতা এবং ছদ্মপার্থক্যের বিষয়টি স্থগিত রাখব।

নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গের শেষার্ধে ফরাসি নারীবাদী নামে পরিচিত হয়েছেন জিলিয়া ক্রিস্তেভা, লুসি ঠরিগারে ও এলেন সিক্সু— এই ত্রয়ী। এঁরা মূলত ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে নারীবাদী ভাবনাকে প্রয়োগ করেছিলেন। লাঁকার ভাষাতত্ত্বের ধারণা অবলম্বন করে জুলিয়া ক্রিস্তেভা মানবমনের ভাষাবোধ উন্মেষের সময়ের ভিত্তিতে দুটি স্তরের কথা বলেছেন— প্রথমটি সেমিয়টিক্স ও দ্বিতীয়টি সিম্বলিক। (লাকাঁ বলেছিলেন ইমাজিনারি, সিম্বলিক ও রিয়েল— এই তিন স্তরের কথা)। ক্রিস্তেভার মতে মানুষ তাঁর জন্মের পর থেকেই প্রি-ভার্বাল ও প্রি-অয়দিপাল অবস্থায় থাকে ‘সেমিয়াটিক্স স্টেজ’এ। এই সময় সে অনেক বেশি মাতৃলগ্ন, মেয়ের ভাষা ও অবস্থানের সঙ্গে জড়িত। আস্তে আস্তে সে প্রবেশ করে ভাষাজগতে। প্রবেশ করে সিম্বলিকের জগতে যেখানে সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েডের সম্পর্কহীন বন্ধনে সে অভ্যস্ত হতে থাকে। সে তখন ‘প্রতিভা পাটিল ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি’ বাক্যটিতে কোনও স্ববিরোধ খুঁজে পায় না। এবং ধরেই নেয় ‘সতী’ বিশেষণটির কোনও পুংলিঙ্গ নেই এমনকি তাঁর অভিধান তাকে ‘রাখালবালিকা’ নামে কোনও শব্দ উপহার দেয় না। এইভাবেই এই পিতৃতন্ত্রশাসিত ভাষাজগত তাঁর কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়, যা আদতে একটি চাপানো বিষয়। তাঁর তলায় অব্যক্ত থেকে যায় তাঁর সেমিয়টিক্স, তাঁর চেতনার সত্যকার পরিচয়। ক্রিস্তেভা মনে করেন, মুক্তির নিগড়ে বাঁধা এই সিম্বলিক স্তরের ভাষা, যার নাম তিনি দিয়েছেন ফেনোটেক্সট, তাকে অতিক্রম করে গড়ে তুলতে হবে জেনোটেক্সট। তাঁর মতে অসংলগ্ন অবদমিত মেয়েদের ভাষাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আদর্শ হল কবিতার ভাষা। এ থেকে এলেন সিক্সু তৈরি করেছেন এক্সিরে ফেমিনিন শব্দযুগ্মকটি। যদিও ক্রিস্তেভা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন মালার্মের মতো পুরুষকবির পক্ষেও সম্ভব পুরুষশাসিত ভাষাজগত অতিক্রম করে নারীভাষায় কথা বলা।

নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গে, বিশেষত আশির দশক থেকে পর্নোগ্রাফি, বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত নারীশরীর ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে নারীবাদীদের মধ্যেই বিরোধিতার ঝড় ওঠে। দ্বিতীয় তরঙ্গের বিশিষ্ট নারীবাদী জারমেইন গ্রিয়ার, এবং তাঁর পাশাপাশি অ্যান্ড্রিয়া রিটা জোয়ার্কিন, রবিন মরগ্যান, ডরশন লিডহোল্ড প্রমুখ নারীবাদীরা স্পষ্টতই

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থানটিকে স্পষ্ট করে বলেন পর্নোগ্রাফিতে নারীকে ভোগ্য পন্য করে পুরুষের যৌন হিংস্রতাকে উসকে দেওয়া হয়। ফলে বিজ্ঞাপন বা পর্নোগ্রাফিতে নারীশরীরের বলা ভাল নারীমাংসের ব্যবহার নারীর অপমান। এর বিপরীতে দাঁড়ান 'সেক্স পজিটিভ ফেমিনিষ্ট'-রা। তাঁরা মনে করেন এই সেই ক্ষেত্র যেখানে নারী যৌনতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষকে। এরা মনে করেন প্রত্যেকটি মানুষের নিজের মত যৌনতা বোধ থাকে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ স্বার্থরক্ষায় একমাত্র বিবাহিত ও হেটেরোসেক্সুয়াল বা বিসমকামী যৌনতাকে স্বীকার করে, এভাবে সে নারীর উপর অধিকার কায়েম করে নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই 'সেক্স পজিটিভ ফেমিনিষ্ট'-রা সমকাম, হস্তমৈথুন ও নানা ধরনের বিকল্প যৌনতাকে স্বীকার করেন। পর্নোগ্রাফিতে সে পরিসর থাকে বলে এঁরা পর্নোগ্রাফিকে সমর্থন করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সুসি ব্রাইট, প্যাট্রিক ক্যালিফিয়া, গেইল রুবিন, অ্যানি স্প্রিংকিল, বেটি ডডসন প্রমুখরা। আশির দশকে এই মুক্ত যৌনতার ও পর্নোগ্রাফি বিরোধী নারীবাদীদের সংঘাত এতই তীব্র হয়ে ওঠে, যে একে অভিহিত করা হয়েছে 'ফেমিনিষ্ট সেক্স ওয়ার' বলে।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অথবা বিষয়বস্তুর দিক থেকে আশির দশকের শুরুতে এভাবেই সমকামী যৌনতাকে নারীবাদী আন্দোলনের বলয়ে ঢুকে পড়তে দেখেছি। বিসমকামী ও বিবাহিত যৌনতা যে অনেকক্ষেত্রে নারীর উপর ক্ষমতা কায়েম করারই অস্ত্র— এই যুক্তিতে পাশ্চাত্য কেন, প্রাচ্য দেশেও বিবাহকে নারীবাদীরা দেখেছেন পন্যের বিনিময়ের অনুষ্ঠান হিসাবে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আমরা সেভাবে নারীর সমকামিতার কথা পাই না। না পাওয়ার জন্য আমাদের অবাক লাগে বৈকি। কারণ সমকামী যৌনতার একটা উৎস যেমন মানুষের স্বভাবের ভেতরে নিহিত থাকে, তেমনই আরেকটি উৎস হয় পরিবেশগত অবদমন। বাঙালি নারী অনেকদিন থেকে গৃহরুদ্ধ, তাঁর পুরুষের সঙ্গে সহজ মেলামেশায় প্রতিবন্ধকতা অনেকদিনের। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই সমকামী যৌনতা তৈরি হবার একটা ক্ষেত্র থেকে যায়। উর্দু লেখিকা ইসমত চুঘতাই এর বহুবিখ্যাত গল্প 'লেপ' এর কথা আমাদের মনে পড়ে যায়, সেখানে মুসলিম অন্তঃপুরে এক অভিজাত রমনী বিকল্প ও বিসমকামী যৌনতার অভাবে তাঁর পরিচারিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন সমকামী যৌনতার সম্পর্কে। বাংলা গল্প উপন্যাসে হয়ত সে খোঁজ আমরা পাই কিন্তু কবিতায় এক নারী তার সমকামী যৌনতার কথা বলছে— এ দৃষ্টান্ত খুবই কম। দুটি গ্রন্থের আলোচনা আমরা এ প্রসঙ্গে করব— একটি রমা ঘোষের লেখা 'কালো মেয়ের ডানা' ও অন্যটি সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরব্য রজনীর মেয়ে বা মেয়েদের

ব্রতকথা'। দুটি কবিতার গ্রন্থই সম্পূর্ণত রচিত হয়েছে সমকামী প্রেমের কবিতা দিয়ে, তবে এখানেও রয়েছে পুরুষের দ্বারা প্রবঞ্চিত হবার ক্ষোভ, সংযুক্তার গ্রন্থে কবিতার 'আমি' চেষ্টা করেও সঙ্গী সাকিনাকে ফেরাতে পারেনি পুরুষ প্রেমের কাছে ফিরে যাওয়ার অনিবার্য পরিণতি থেকে।

.....

বস্তুত নারী ও প্রকৃতিকে অনেকদিন ধরেই মানব সংস্কৃতিতে একীকৃত করে দেখার চলনাটি রয়েছে। নারী ও প্রকৃতি উভয়ই প্রত্যক্ষত প্রাণের জন্ম দেয়। কর্ষিত হয় উভয়েই, উভয়ে আগ্রাসন ও দখল করার বদলে লালন ও সৃজনের প্রতি আগ্রহী। নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ফ্রাঁসোয়াজ দোব্যান তাঁর 'ফেমিনিজম অথবা মৃত্যু' গ্রন্থে আমাদের সামনে ইকো-ফেমিনিজম এর ধারণাকে উপস্থাপিত করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মারি হ্যালি তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন 'গাইন-ইকোলজি'। ১৯৭০ থেকে ৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নারিবাদীদের এই শাখায় প্রকৃতি ও নারীর বৈশিষ্ট এবং তাদের বিপন্নতাকেও একসূত্রে দেখবার একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই তত্ত্বে বলা হচ্ছে পুরুষ তার স্বার্থে নারীকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই প্রকৃতিকেও দমন করে। বাঁধ দেয়, গাছ কাটে, বহুতল নির্মাণ করে, ফলে প্রকৃতির স্বভাবজ ভারসাম্য নষ্ট হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের পণ্য উৎপাদনের জন্য সবার আগে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে পাহাড়ি নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। পৃথিবীর আকাশে, বাতাসে মাটিতে জলে মেশে বিষ, নষ্ট হয় নদীর গর্ভ, ঋতুচক্র। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষের মন ও শরীর। নিসর্গ মানবীবাদীরা বলেন পুরুষের একধরনের আগ্রাসন ও জয়ের আকাঙ্ক্ষা নারী ও প্রকৃতি উভয়কে অধিকার করার পেছনে সক্রিয়। গায়ের জোরে দখল করার এই নীতির বদলে তাঁরা চান নারীর লালন প্রবৃত্তি যা অন্যের সম্পদ গায়ের জোরে দখল ও ভোগ করার পরিবর্তে সম্পদের সৃজন ও লালন করতে পারে।

দ্বিতীয় তরঙ্গের দুজন নারীবাদীদের কথা আমাদের এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। একজন বেটি ফ্রিডান— তার বইটির নাম দ্য ফেমিনিন মিস্টিক এবং দ্বিতীয়জন জারমেন গ্রিয়ার, তার গ্রন্থের নাম দ্য ফিমেল এনাখ। ফ্রিডান পঞ্চাশের দশকের আমেরিকান গৃহবধূদের প্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন নারীকে রূপ সৌন্দর্যে মোহিণী করে প্রতিষ্ঠা করেন সাহিত্যিকরা আর এই মিথকে বিশ্বাস করে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে মেয়েরা হারিয়ে ফেলে নিজস্ব আইডেন্টিটি।

গ্রিয়ার তাঁর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'দ্য ফিমেল এনাখ' গ্রন্থে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারীশরীরের সৌন্দর্যের বানানো এক গপ্‌পো খাড়া করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। একটি মেয়ে সেই নিরিখে তাঁর নিজের মূল্যমান মাপতে শেখে, সে ভয় পায় আরেকরকম

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ক্যাসট্রেশন বা লিঙ্গচ্ছেদের। তাই তাঁর গ্রন্থের প্রচ্ছদে দেখি কর্তিত হস্ত নারীটরসো ঝুলছে হ্যাঙার থেকে। গ্রিয়ার এও বলেছেন অসমকামিতা পুরুষের অস্ত্র। পুরুষের যৌন কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে নারী তার অস্তিত্বকে পুরুষের যৌনতাকর্ষনের ক্ষমতায় মাপতে শেখে, এবং সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তার লক্ষ। নারীবাদী সচেতনতা সম্পন্ন প্রথম যুগের কবি কবিতা সিংহ নারীকে বলেছিলেন শরীর থেকে নগ্নতার নির্মোক খুলে ফেলতে।

.....

যে সমধর্মিতার ভিত্তিতে ব্রাদারহুড কথাটি বহুল প্রচলিত সেইরকমই একটি শব্দ তৈরি হয়েছে সিস্টারহুড সেখানে একটি মেয়ে অন্য মেয়েকে তার প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সূত্রে অনেক সহজে বুঝতে পারে ও তার সঙ্গে সংযোগ করতে পারে। আমরা দেখেছি উভয়ক্ষেত্রেই একধরনের পুরুষ প্রবঞ্চনা এই নারী যুগলকে তৈরি হওয়ার পিছনে সক্রিয় ছিল। ফলত নারীর প্রতি নারীর সহমর্মিতা, এই রকম ঠকে যাওয়ার ভিত্তিসূত্রে স্থাপিত হয়েছে বিকল্প নারীর এক নিজস্ব দুনিয়া নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষায় এই প্রবন্ধে আলোচিত সম্পর্কদুটির উদ্ভবের পিছনে দায়ী।

যৌনতার যে উল্লেখগুলি আমরা পাই, তাও বুঝতে হবে ওই পিতৃতন্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও চর্চিত ট্যাবুগুলিকে ভাঙবার উল্লাসেই রচিত। নারীবাদীদের একটি গোত্র সমকামী নারীবাদীরা ফরাসি নারীবাদীদের উদ্ধৃত করে বলেন যে নারীর প্রকৃত সেমিয়টিক্সই অবদমিত। মাতৃসংলগ্ন সেমিয়টিক্সই তার প্রকৃত— তাই তার প্রথম ভালোবাসা যেহেতু মা'র প্রতি— তাই নারীর প্রতি নারীর সমকাম স্বাভাবিক বরং বিসমকাম একটি চাপিয়ে দেওয়া ধারণা যা সহজেই খুলে পড়ে।

.....

মনোবৃত্তি বা প্রবণতার দিক থেকে সমকামী— এমন নারীর কথা আমরা পাইনি। অথচ সমাজে প্রবৃত্তিগতভাবে সমকামী মেয়েদের অস্তিত্ব তো রয়েছেই। তবে ঐ নিরবধি কাল, এবং বিপুলা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মনের ঝর্ণা কলমের থেকে প্রবাহিত স্রোতকে আরও গতিময়, সংস্কারহীন মুক্ত ও বহতা দেখতে পেয়ে এটুকু আশা তো করাই যায় যে এই মনের খেদও আমাদের একদিন মিটে যাবে।

[কৃতজ্ঞতা ঃ **তৃতীয় পরিসর**]

ভারতের নারীশক্তির বিকাশ

- রিও ওলিম্পিকে পি.ভি.সিন্ধুর রুপো ও সাক্ষ্মী মালিকের ব্রোঞ্জ জয়। দীপা কর্মকারের সফল প্রদুনোভা ভল্ট সহ চতুর্থ স্থান অধিকার।
- দু'পা ছাড়াই অরুণিমা সিংহের দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয়।
- সঙঘমিত্রা কলিতার সাহিত্যে পুলিৎজার পুরস্কার জয়।
- ক্রপ্তি দেশাইয়ের নেতৃত্বে 'ভূমাতা রণরঙ্গিনী ব্রিগেডের' মহিলাদের প্রথম আহমদনগরের শনি শিংনাপুর মন্দিরে প্রবেশ।
- বণিতা ভট্টের নেতৃত্বে 'স্বরাজ্য মহিলা সংগঠনে'র মহিলাদের প্রথম নাসিকের ক্রম্বকেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ।
- ক্রপ্তি দেশাইরা অনেক আন্দোলন করে মুম্বাইয়ের হাজি আলি দরগায় নারীর প্রবেশের পুনরাধিকার পেলেন। এবার শিক্ষিত প্রগতিশীল কেরলের সবরীমালাই মন্দিরে নারী কবে প্রবেশাধিকার অর্জন করবে?

- ২১৬৮ বছরের পুরনো রেকর্ডকে ভেঙ্গে দিলেন আধুনিক বিশ্বের সেরা অ্যাথলিট 'দ্য ফ্লাইং ফিস' মার্কিন সাঁতারু **মাইকেল ফেলপস্**। পরপর পাঁচটি ওলিম্পিকে অংশ নেওয়া ফেলপস্ রিওতে ২২তম সোনাটি (১৩টি ব্যক্তিগত এবং নয়টি দলগত) জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ওলিম্পিকে তো বটেই প্রাচীন গ্রীক ওলিম্পিকের ১২টি ইভেন্টে সেরা হওয়া গ্রীক স্প্রিন্টার লিওনাইডাসের রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন। ফেলপস্-র চারটি ওলিম্পিকে মোট পদক ২৮ (সোনা ২৩ রুপো ৩ ব্রোঞ্জ ২)।
- পরপর তিনটি ওলিম্পিকে ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্টে এবং ৪০০ মিটার রিলেতে মোট ন'টি সোনা পেয়ে অনন্য নজির গড়লেন জামাইকার বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী দ্রুততম মানুষ **উসেইন বোল্ট**।
- ভারতে অনুষ্ঠিত টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপে **ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পুরুষ** ও **মহিলা দল** ট্রফি জিতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখল।

ছবিতে বাসন্তী

—নীলাঞ্জন পতি

আলোকচিত্রে পুরুলিয়া

—সাম্পান পাঠক

পুরুলিয়া... নামটা শুনলেই গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে। না জানি কি আছে সে দেশে। কেমন তার রূপ, তার পরিবেশ, তার জীবন যাত্রা। জ্বী এর দেশ পুরুলিয়া, রাঙ্গা তার মাটি, পাথুরে, রুক্ষ। বছরের বেশির ভাগ সময়টায় গায়ে ফোস্কা পরা গরম থাকে, মাটি ফেটে ফুটিফাটা, শুকনো নদী নালা, তবু মানুষগুলোর মনে যেন এতো কষ্টের ছাপ পরে না, কি সুন্দর তাদের ব্যবহার, তারা খুব অল্পেতেই খুশি। কোনো কোনো গ্রামের নারী-পুরুষ মাইলের পর মাইল হেঁটে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিকিয়ে তবে গ্রাসাচ্ছাদন করে তো কোথাও বা জল বয়ে পা দিয়ে রক্ত বেরোনোর জোগাড়। কিছু গ্রামে স্কুল আছে, তাও নাম কা ওয়াস্তা, শিক্ষক মেলে না। তাই তাঁরা নিজেরাই নিজেদের স্বল্প জ্ঞানের আলোয় কচি কাঁচাদের আলোকিত করেন কোনো সান্ধ্য স্কুলের আঙিনায়। এই সকল মানুষ ও তাঁদের জীবন এবং কিছু গ্রামের ছবি রইল এখানে।

ছবিতে বাসন্তী — নীলাঞ্জন পতি

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

রহিত ভেমুলার শেষ চিঠি

['আমি চলে গেলে তার জন্য আমার বন্ধু বা শত্রুদের বিব্রত কোরো না'—আত্মঘাতী গবেষক রহিত ভেমুলার শেষ চিঠি।

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিল রহিত ভেমুলা সহ পাঁচ গবেষক, প্রত্যেকেই 'আম্বেদকর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' বা 'এ এস এ' সংগঠনের সদস্য। সেই থেকে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকছিল ওরা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর এস এস)-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর অভিযোগের ভিত্তিতে এবং বিজেপি নেতা বঙ্গারু দত্তাত্রেয়র হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল বলে অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পাঁচ দিন আগে তারা বিহিত চাইতে গেলে এবিভিপি-র সঙ্গে এদের মারপিট বাধে। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের কিছু ছাত্র সদস্য ওই পাঁচ গবেষকের সঙ্গে রিলে অনশন আন্দোলনও শুরু করেছিল। এরই মাঝে ১৭ জানুয়ারি '১৬ রোববার রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে রহিত ভেমুলা আত্মহত্যা করে। বলা ভাল তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে তাঁকে সংঘ পরিবার হত্যা করে। রহিতের আত্মহত্যা সংক্রান্ত নোটটি (সুইসাইড নোট) ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হল। অনুবাদ করেছেন **গুণধর বাগদি**।—সম্পাদকমণ্ডলী]

সুপ্রভাত,

তুমি যখন এই চিঠিটা পড়ছো, তখন আমি আর কাছে পিঠে নেই। রাগ কোরো না আমার উপর। জানি আমি, তোমাদের কারোর কারোর আমার প্রতি সত্যিই দরদ ছিল, আমাকে ভালবাসতে, আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে। কারোর প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। আমার চিরকালের সমস্যা হল আমি নিজে। আমার আত্মা আর আমার দেহের মধ্যে ফারাক বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। আর আমি হয়ে উঠছি এক দৈত্য। আমি সব সময় লেখক হতে চেয়েছি। কার্ল সাগানের মত, বিজ্ঞান লেখক। অবশেষে এই একমাত্র চিঠি যা আমি লিখে উঠতে পারলাম।

আমি ভালবাসতাম বিজ্ঞান, ভালবাসতাম নক্ষত্র, প্রকৃতি। তারপরেও কিন্তু আমি মানুষ ভালবাসতাম এটি না জেনেই যে মানুষ দীর্ঘকাল হল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে প্রকৃতি থেকে। আমাদের

অনুভবগুলিও হাত-ফেরতা। ভালবাসা আমাদের নির্মিত। বিশ্বাসগুলি রাঙানো আমাদের। আমাদের নিজস্বতার প্রমাণ হল কৃত্রিম শিল্পকলা। আঘাত না খেয়ে ভালবেসে যাওয়া খুব কঠিন হয়ে গিয়েছে।

মানুষের মূল্য দাঁড়িয়ে আছে তার আপাত সত্তায় এবং আশু সম্ভাবনায়। একটি ভোটে। একটি সংখ্যায়, একটি জিনিসে। কখনই তাকে একটি মন হিসাবে নেওয়া হয় না। নক্ষত্রের কণা দিয়ে গড়া এক মহান সৃষ্টি বলে নেওয়া হয় না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, কী পড়াশুনা, কী রাস্তাঘাট, কী রাজনীতি, কী বাঁচা-মরায়।

আমি এই ধরনের চিঠি এই প্রথম লিখছি। প্রথম লেখা শেষ চিঠি। আমাকে যদি কিছু বুঝতে না পার ক্ষমা করে দিও।

হতে পারে আমি ভুল—বুঝতে ভুল করলাম এই পৃথিবীকে। ভুল বুঝলাম ভালবাসা, যন্ত্রণা, জীবন, মরণ। তাড়াহুড়ো ছিল না কোনও। কিন্তু সবসময় আমি দৌড়ে গেলাম। একটি জীবন শুরু করতে হবে যেভাবেই হোক। আর কিছু মানুষের কাছে জীবনটাই হল এক অভিশাপ। আমার জন্মটাই হল আমার প্রাণসংশয়ী দুর্ঘটনা। আমি কখনওই ছোটবেলার একাকীত্ব থেকে বেরতে পারিনি। বেরতে পারিনি আমার অনাদরের শৈশব থেকেও। এই মুহূর্তে আমি আহত নই। দুঃখিত নই। কেবল শূন্য নিজের প্রতিই কোনও দরদ নেই। এটি দুর্বিষহ। আর তাই আমি এই কাজ করছি।

জানি চলে গেলে লোকে আমায় বলবে ভীতু। বলবে স্বার্থপর অথবা বোকা। কে কী বলল, তাতে আমার কিস্যু এসে যায় না। মৃত্যু-পরবর্তী গালগল্পে, ভূত-প্রেত-এ আমার বিশ্বাস নেই। যদি কিছু বিশ্বাস থেকে থাকে, তা হল, আমি নক্ষত্রে যাত্রা করতে পারি। এবং অন্য দুনিয়াগুলিকে জানতে পারি।

যারা আমার চিঠিটা পড়ছ, যদি তোমরা আমার জন্য কিছু করতে চাও, তাহলে আমার সাত মাসের ভাতার (ফেলোশিপ) টাকা, এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা পাওনা রয়েছে, দয়া করে দেখো, তা যেন আমার পরিবার পায়। চল্লিশ হাজার টাকার মতো রামজিকে দেওয়ার কথা। সে কখনও ফেরত চায়নি। কিন্তু ওটার থেকে তাকে সেটি দিয়ে দিও।

আমার শেষকৃত্য যেন খুব মসৃণ ও নীরব হয়। যেন আমি এসেছিলাম আর চলে গিয়েছি। আমার জন্য কান্নাকাটি কোরো না। জেনো, বেঁচে থাকার চেয়ে মরে গিয়ে আমি বেশি সুখী।

'ছায়া থেকে নক্ষত্রে।'

উমা আম্মা, এই কাজে তোমার ঘরটা ব্যবহার করলাম, দুঃখিত।

এ এস এ পরিবারের সকলে, তোমাদের সকলের আশাভঙ্গ করলাম, দুঃখিত। তোমরা আমাকে খুব ভালবাসতে, তোমাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করি।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

আর শেষ বারের জন্য, জয় ভীম।

ওহ্ আমি ভুলেই গিয়েছি, রীতিমাফিক কথাগুলি বলতে। আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়।

কেউ আমাকে উসকানি দেয়নি। কারোর কোনো কথা বা কাজ আমাকে এই কাজে ঠেলে দেয়নি।

এটি আমার সিদ্ধান্ত এবং কেবলমাত্র আমি নিজে এর জন্য দায়ী। আমি চলে গেলে তার জন্য আমার বন্ধু বা শত্রুদের বিব্রত কোরো না।

কানহাইয়া কুমারের ভাষণের অংশ

[জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জে এন ইউ) ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া কুমার জে এন ইউ ক্যাম্পাসে এক সমাবেশে গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ যে ঐতিহাসিক বক্তব্য পেশ করেছিলেন যার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাকে কারাদণ্ড দেন এবং যার প্রতিবাদে দেশ ও বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, তার নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হল। মূল বক্তব্যটি ছিল হিন্দিতে। ভাবানুবাদ করেছেন গুণধর বাগদি।—সম্পাদকমণ্ডলী]

...তারাই এরা যারা তেরঙ্গা পতাকা পুড়িয়েছিল। তারাই সাভারকার-এর ভাবশিষ্য যারা ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছিল। তারাই এরা যারা, হরিয়ানায় বিমান বন্দরের নাম পাল্টে দিয়েছে। যেখানে বিমান বন্দরটি ভগৎ সিং-এর নামে নামাঙ্কিত ছিল। খাত্তার সরকার এখন সেটি একজন সংঘি-র (যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সঙ্গে যুক্ত) নামে নামাঙ্কিত করেছে।

আমি যেটি বলতে চাই তা হল আমরা আর. এস. এস.-এর কাছ থেকে দেশপ্রেমের শংসাপত্র পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা আর.এস.এস.-এর কাছ থেকে জাতীয়তার শংসাপত্র পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা এই দেশেরই মানুষ। আমরা এই দেশকে ভালবাসি। আমরা এই দেশের আশি শতাংশ গরিব জনতার জন্য লড়ি। আমাদের কাছে, এটিই দেশকে পূজা করা।

আমাদের বাবাসাহেবের (আম্বেদকার) উপর পূর্ণ আস্থা আছে। আমাদের ভারতের সংবিধানের উপর পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা এটি জোরের সঙ্গেই বলতে চাই যে কেউ যদি এই সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ জানায়, এমন কি সংঘিরাও, আমরা সহিষ্ণু থাকব না।

আমাদের, ভারতীয় সংবিধানে পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু যে সংবিধানের শিক্ষা ঝাণ্ডেওয়ালান (দিল্লির আর. এস. এস.-এর প্রধান কার্যালয়) ও নাগপুর (আর. এস. এস.-এর সদর দপ্তর) দিয়ে থাকে তাতে আমাদের আস্থা নেই। আমাদের মনু স্মৃতির উপরও আস্থা নেই, নেই আস্থা এই দেশের জাতপাতের ধ্যানধারণার উপরও।

সংবিধান ও বাবাসাহেব আম্বেদকার নিয়ে যা বলা হয় সেটিই সঠিক পদ্ধতি। সেই বাবাসাহেব আম্বেদকারই মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। সেই আম্বেদকারই বাক্ স্বাধীনতার কথা বলেছেন এবং আমরা সংবিধানকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে চাই, আমরা আমাদের অধিকার ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে চাই।

কিন্তু এটি লজ্জার ও দুঃখের যে এ.বি.ভি.পি. (আর.এস.এস.-এর ছাত্র সংগঠন) তাদের কতিপয় গণমাধ্যমে কর্মরত বন্ধুদের সাহায্যে সুনিপুণভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

গতকাল, এ.বি.ভি.পি.-র যুগ্ম সম্পাদক বলেছিলেন যে তারা বৃত্তির (স্কলারশিপ) জন্য লড়ছে। এটি কি পরিহাসকর কথা নয়। তাদের সরকার, তাদের মন্ত্রী, ম্যাডাম মনু স্মৃতি ইরানি, বৃত্তি বন্ধ করে দিচ্ছেন। এবং তারাই আমাদের দোষারোপ করছে যে আমরা বৃত্তির জন্য লড়াই করছি। তাদের সরকারই উচ্চ শিক্ষায় ১৭ শতাংশ বাজেট কমিয়ে দিয়েছে।

আমাদের ছাত্রাবাস গত চার বছর যাবৎ তৈরি হয়নি, যেখানে কোন ওয়াই ফাই নেই। ভেল ছাত্রদের যাতায়াতের জন্য একটি বাস দিয়েছে কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই বাসের তেল বাবদ কোন টাকা দিচ্ছে না। এবং এ.বি.ভি.পি-র লোকেরা দেব আনন্দের স্টাইলে বলছে যে তারা বাড়ি তৈরি করবে, ওয়াই ফাই আনবে এবং বৃত্তিরও বন্দোবস্ত করবে।

দেশের মূল সমস্যাগুলির উপর বিতর্ক যদি সংঘটিত হয় তারা উন্মোচিত হবে। জে.এন.ইউ.-র ছাত্র হিসাবে আমরা গর্বিত কেন না আমরা আলোচনা করি, বিতর্ক করি দেশের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে। আমরা এই দেশের নারীর মর্যাদা, দলিত, উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরি। এবং কি আশ্চর্য, তাদের স্বামী (সুব্রামনিয়ান স্বামী) বলেন জিহাদিরা জে.এন.ইউ.-তে বসবাস করে, এই জে.এন.ইউ. ছাত্ররাই হিংসা ছড়ায়।

জে.এন.ইউ.-র পক্ষ থেকে আমি আর.এস.এস. প্রচারকদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি আমাদের ডাকুন বিতর্ক সভার আয়োজন করুন। আমরা হিংসার ধারণা নিয়ে বিতর্ক করতে চাই। আমরা এ.বি.ভি.পি.-র স্পর্শকাতর শ্লোগানগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাই,

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

তাদের শ্লোগান যেগুলি তারা তোলে। তারা কপালে রক্তরঞ্জিত তিলক ধারণ করে, বুলেট সহযোগে আরতি করে। তারা কাদের রক্ত ছড়ায়? তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে নিজেদের এক করে ব্রিটিশদের মতই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মেরেছে। তারা, দরিদ্ররা যখন খাবার চায়, বুলেট ছোড়ে। সাধারণ মানুষ যখন ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে মরণাপন্ন হয়ে তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলে, তারা গুলি ছোড়ে। তারা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বুলেট ছোড়ে, নারীরা যখন সমান অধিকারের দাবি তোলে তারা তাদের উদ্দেশ্যেও গুলি ছোড়ে।

তারা বলে হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়। তারা বক্তব্য রাখে যে নারীরা সীতার মত হয়ে অগ্নিপরীক্ষা দেবে। এই দেশে গণতন্ত্র আছে এবং গণতন্ত্র সকলকে সমানাধিকার দেয়—একটি ছাত্রের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা শ্রমিক, গরিব বা ধনী আম্বানি বা আদানি হোক। এবং আমরা যখন নারীদের সমানাধিকারের কথা বলি, তারা আমাদের দোষারোপ করে বলে যে আমরা দেশের সংস্কৃতি ধ্বংস করছি।

আমরা শোষণের সংস্কৃতি, জাতপাত অস্পৃশ্যতার সংস্কৃতি, মনুবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চাই। আজ পর্যন্ত সঠিক সংস্কৃতি কি তা সংজ্ঞায়িত হয়নি। সমস্যায় পড়ে দেশের মানুষ যখন গণতন্ত্রের কথা বলে, যখন তারা নীল অভিবাদনের সঙ্গে লাল অভিবাদন জানায়, যখন জনতা আম্বেদকারের সঙ্গে কার্ল মার্ক্সের কথা বলে, যখন আসফাকউল্লার (স্বাধীনতা সংগ্রামী) কথা বলে, তারা সহ্য করতে পারে না। এটিই তাদের ষড়যন্ত্র। তারা ছিল ব্রিটিশের দালাল। আমি তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে চ্যালেঞ্জ করছি। আমি বলি কি আর.এস.এস.-এর ইতিহাস ব্রিটিশের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করার ইতিহাস। এই বিশ্বাসঘাতকেরাই আজ জাতীয়তার শংসাপত্র দিচ্ছে।

বন্ধু, আমার মোবাইল ফোনের কল তল্লাশ করে দেখুন, আমার মা ও বোনের উদ্দেশ্যে কদর্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা কোন্ ভারতমাতার কথা বলছেন? যদি আমার মাতা ভারতমাতার অংশ না হয়, তাহলে আপনার ভারতমাতার ধারণা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মা একজন অঙ্গওয়াড়ি কর্মী, আমার পরিবার চলে তাঁর মাসিক ৩,০০০ টাকা আয়ে এবং তারা তাঁকেই গালি দিচ্ছে। আমি লজ্জিত যে এই দেশের মায়েরা দরিদ্র। দলিত কৃষকরমণীরা তাদের ভারতমাতার অংশ নয়। অথচ আমি আমার দেশের এই মায়েদেরই ঊর্দ্ধে তুলে ধরি। আমি এই দেশের পিতাদেরও ঊর্দ্ধে তুলে ধরি। আমি এই দেশের মা ও বোনেদের ঊর্দ্ধে তুলে ধরি। আমি ঊর্দ্ধে তুলে ধরি দলিত, জনজাতি ও শ্রমজীবীদের। আমি তাদের বলব ক্ষমতা থাকলে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বল। বল 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ', বল 'সুখদেব জিন্দাবাদ', বল 'আসফাকউল্লা জিন্দাবাদ', বল 'বাবাসাহেব আম্বেদকার জিন্দাবাদ'। তাহলেই আমি বিশ্বাস করব যে তোমরা এই দেশের প্রতি বিশ্বস্ত।

এখন আম্বেদকারের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা নিয়ে নাটক করছে। ওদের সাহস থাকলে আম্বেদকার যে ইস্যুগুলির কথা বলেছিলেন সেগুলি তুলে ধরুক, জাতপাতের সমস্যা এদেশের অন্যতম বৃহত্তম সমস্যা। যখন জাতপাতের কথাই বলছ, প্রতিটি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ চালু কর। বেসরকারি ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ চালু কর। এই সব প্রশ্ন তুলে ধরলেই আমি বিশ্বাস করব যে তোমাদের এই দেশের প্রতি আস্থা আছে।

গতকাল, আমি এক দূরদর্শনের বিতর্কে অংশ নিয়ে বলি আমরা কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছি। এই দেশে ফ্যাসিবাদ যেভাবে আসছে সেখানে সংবাদ মাধ্যমকেও ছাড়বে না। গণমাধ্যমকে আর.এস.এস.-এর অফিস থেকে লিখিত বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে যেমন ভাবে জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেস অফিস থেকে করা হত।

কতিপয় গণমাধ্যমের বন্ধু আমায় বলেছিলেন যে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জে.এন.ইউ) চলে করদাতাদের টাকায়, ভর্তুকি দিয়ে। হ্যাঁ, এটি ঠিক যে জে.এন.ইউ. চলে ভর্তুকিতে। কিন্তু আমি যে প্রশ্নটি তুলতে চাই; কিসের জন্য তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়? বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আছে তো আমাদের সমাজের যূথবদ্ধ অভিজ্ঞান চুলচেরা বিশ্লেষণ করার জন্য। চুলচেরা বিশ্লেষণকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে তো দেশ বলে কিছু থাকবে না। এটি হয়ে উঠবে ধনীদের শোষণ ও লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্র।

আমরা যদি জনগণের সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও অধিকারগুলি আত্তীকরণ করতে না পারি, জাতি ও দেশ গড়ে উঠবে কিভাবে। আমরা দৃঢ়ভাবে এই দেশের পক্ষে, আমরা আম্বেদকার ও ভগৎ সিং-এর স্বপ্নের পক্ষেই আছি। আমরা সমানাধিকারের পক্ষে, আমরা বেঁচে থাকার অধিকারের পক্ষে। রোহিতকে (ভেমুলা) প্রাণ দিতে হয়েছিল এইসব অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য।

কিন্তু এইসব সংঘীদের বলে দিতে চাই—"ঠিক তোমাদের সরকারকে"। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাচ্ছি—আমরা জে.এন.ইউ.তে রোহিত ভেমুলার ঘটনা ঘটতে দেব না। আমরা রোহিতের আত্মোৎসর্গ ভুলব না। আমরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছি। আমরা ভারতের, প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশের, সমস্ত পৃথিবীর গরিব ও শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিই। আমরা বিশ্ব মানবতার ভাবনা তুলে ধরি, আমরা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ভারতের মানবতাকেও ঊর্দ্ধে তুলে ধরি।

মানবতার বিরুদ্ধবাদীদের আমরা চিহ্নিত করেছি। এটিই আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে বৃহত্তম ইস্যু। আমরা জাত সমস্যার অন্তরায় মনুবাদের মুখকে চিহ্নিত করেছি। যা ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অশুভ আঁতাতের মুখ। আমরা ওই মুখগুলি উন্মোচিত করে যাব। আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার যুদ্ধে এগোতে হবে, এবং সেই স্বাধীনতা আমাদের সংবিধান থেকেই আসবে, সংসদ থেকে আসবে, এবং আমরা সেই লক্ষ্য পূরণ করব।

বন্ধুগণ, আমি আবেদন রাখতে চাই মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষেই দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে সংবিধানের পক্ষে, দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে। এই জন্য, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং দেশ বিভাজনকারী শক্তি যারা সন্ত্রাসবাদীদের জায়গা করে দেয় তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই জারি রাখতে হবে।

একটি শেষ প্রশ্ন তুলে আমি আমার বক্তব্যে ইতি টানতে চাই। কাসব কে? আফজল গুরু কে? কারা সেই ব্যক্তিবর্গ যারা নিজের শরীরে বোমা বেঁধে হত্যা কাণ্ড চালায়? বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এসব প্রশ্ন যদি উত্থাপিত না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়বে? যদি আমরা ন্যায়বিচারের ধারণাকেই সংজ্ঞায়িত করতে না পারি, যদি আমরা হিংসাকে সংজ্ঞায়িত করতে না পারি, কী চোখে হিংসাকে আমরা দেখব? হিংসা কেবল বন্দুক দিয়ে কাউকে হত্যা করাই নয়। জে.এন.ইউ. প্রশাসন যখন দলিতদের সাংবিধানিক অধিকারকে অস্বীকার করে হিংসা সেখানেও নিহিত আছে। এটিই হল প্রাতিষ্ঠানিক হিংসা।

এরা ন্যায়বিচারের কথা বলে। কে নির্ধারণ করবে ন্যায়বিচার কী? ব্রাহ্মণ্যবাদ দলিতদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেয় না। ব্রিটিশরা কুকুর এবং ভারতীয়দের রেস্তোরাঁতে ঢুকতে দিত না। সেটিই ছিল তখনকার ন্যায়বিচার। আমরা সেই ন্যায়বিচারকে চ্যালেঞ্জ করেছি এবং আজকে আমরা এ.বি.ভি.পি. এবং আর. এস. এস.-এর ন্যায়বিচারকে চ্যালেঞ্জ করছি কেন না তাদের ন্যায়বিচারে আমাদের ন্যায়বিচার স্থান পায় না। আমরা তাদের অন্যায়বিচার ও আরোপিত স্বাধীনতার ধারণা মানব না। আমরা সেই স্বাধীনতাকেই গ্রহণ করব যেখানে সব নাগরিক সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করেন। আমরা সেই ন্যায়বিচারকেই গ্রহণ করব যেখানে সকলের সমানাধিকার আছে।

বন্ধুগণ, পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। কোন অবস্থাতেই জে.এন.ইউ.এস.ইউ. (জে.এন.ইউ. ছাত্র সংগঠন) কোনরকম হিংসা সমর্থন করে না। সমর্থন করে না কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসের ঘটনা অথবা ভারত বিরোধী কার্যকলাপ। আমি পুনরুল্লেখ করতে চাই যে জে.এন.ইউ.এস.ইউ কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ওঠানো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগানকে কঠোরভাবে নিন্দা করে।

আমি আপনাদের সঙ্গে একটা জিনিস ভাগ করে নিতে চাই। এটি এ.বি.ভি.পি.-র সঙ্গে জে.এন.ইউ. প্রসাসনের সম্পর্কের বিষয়। হাজারটা ঘটনা জে.এন.ইউ. ক্যাম্পাসে ঘটে চলেছে। যত্নসহকারে এ.বি.ভি.পি.-র তোলা শ্লোগানগুলি শুনুন এখন। তারা আমাদের বলছে 'কমিউনিস্ট কুকুর', তারা আমাদের বলছে আফজল গুরুর কুকুর বলে। তারা আমাদের বলছে 'জিহাদিদের শিশু'। যদি সংবিধান আমাদের নাগরিকের অধিকার দেয়, তাহলে এটি কি আমাদের নাগরিক অধিকারের উপর আক্রমণ নয়, তারা যখন আমাদের পিতামাতাকেও কুকুর বলছে? আমরা এই প্রশ্ন এ.বি.ভি.পি. ও জে.এন.ইউ. প্রশাসনকে করতে চাই। আমরা জে.এন.ইউ. প্রশাসনকে জিজ্ঞেস করতে চাই কার জন্য, কার সঙ্গে ও কিসের ভিত্তিতে তারা এসব ঘটনার প্রশ্রয় দিচ্ছেন? এটি পরিষ্কার যে জে.এন.ইউ. প্রশাসন প্রথমে সভা করার অনুমতি দেয় এবং পরে নাগপুর থেকে ফোন পেয়ে তা প্রত্যাহার করে।

প্রথমে অনুমতি দেওয়া এবং পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘটনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমতঃ, তারা প্রথমে ফেলোশিপের কথা ঘোষণা করবে এবং পরে বলবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। আর.এস.এস. ও এ.বি.ভি.পি.-র এই প্রথাতেই দেশ চালাতে চাইছে।

জে.এন.ইউ. দীর্ঘজীবী হোক ('লং লিভ জে.এন.ইউ.')। জে.এন.ইউ. দেশের সর্বত্র যেখানে যত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংগঠিত হচ্ছে তার পাশে সক্রিয়ভাবে থাকবে, গণতন্ত্রের কণ্ঠকে শক্তিশালী করতেই থাকবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্তমনের লড়াইকে চালিয়ে যেতে হবে। আমরা সংগ্রামে রত থাকব এবং বেইমানদের পরাস্ত করে জয় ছিনিয়ে আনব। এই কথাগুলি বলে আমি আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছি এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে আবেদন জানাচ্ছি।

জয় ভীম, লাল সেলাম।

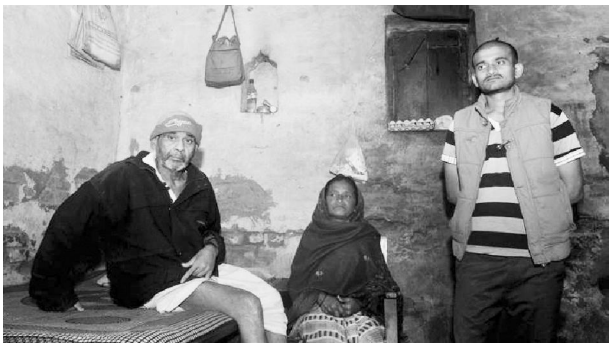

মেধাবী দলিত ছাত্রনেতা রোহিত ভেমূলার প্রাণ বিসর্জন সমস্ত দেশের ছাত্রসমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে। যে যেরকমভাবে পারছেন প্রতিবাদ করছে। হর্ষকুমার কুগে একটি জনপ্রিয় নাটক লিখেছেন 'নক্ষত্রদা ঢুলু (তারার কণা)'। কিরণ মরাশেট্টিহালি একক অভিনয় দিয়ে সর্বত্র মঞ্চস্থ করছেন।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন

—নির্ম্মলেন্দু নাথ

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল ১৭ শতাংশ। ষাট বছর বাদে এই সাক্ষরতার হার দাঁড়ায় ৭৪ শতাংশ। বিগত ষাট বছর যাবৎ বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন ও দুটি শিক্ষানীতি সত্ত্বেও সাক্ষরতার হার কানাডা, নরওয়ে বা সুইডেন-এর কাছাকাছি পৌঁছায়নি। ঈপ্সিত লক্ষ্যে না পৌঁছানোর প্রধান কারণ হল আমাদের দেশে শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন। বর্তমান প্রবন্ধে শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন বলতে কী বোঝায়, এর কারণসমূহ এবং অপচয় ও অনুন্নয়ন হ্রাসের উপায় সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা হবে।

ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি সর্বপ্রথম অপচয় ও অনুন্নয়নের সমস্যাটিকে চিহ্নিত করেন। বিদ্যালয়ে ভর্তির পর শিক্ষার্থীরা যদি প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলি অর্জন করার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে তখন তাকে অপচয় বলে উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণিতে যখন শিক্ষার্থী দীর্ঘসময় ধরে থেকে যায় তখন তাকে অনুন্নয়ন বলে চিহ্নিত করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে 'অপচয়ের' প্রসঙ্গে হার্টগ কমিটি দেখায় যে ১৯২২ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ১০০ জন শিশুর মধ্যে মাত্র ১৮ জন ১৯২৭ সালে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে। হার্টগ কমিটির প্রতিবেদন-এ আরো দুটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বাকি ছাত্রদের মধ্যে হয় কিছু অংশ অনুত্তীর্ণ হয়েছে নতুবা বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম শ্রেণিতেই এই অপচয়ের পরিমাণ

এখানে আমরা যারা সই করেছি এবং যারা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান হিসাবে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করছি, ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া কুমারকে দেশবিরোধিতার অভিযোগে গ্রেফতারের ঘটনায় শোকাহত একইসাথে আশ্চর্য। কানহাইয়া 'অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশনে'র সাথে যুক্ত এবং তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং অবস্থান সুবিদিত, কিন্তু কোনভাবেই তাকে দেশবিরোধিতার অভিযোগে কালিমালিপ্ত করা যায় না। এর আগে একবারই জে.এন.ইউ.-র ছাত্র সংসদের সভাপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তা হয়েছিল ১৯৭৫-৭৭-র জরুরি অবস্থার সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি সেই অপস্মৃতিকে মনে করাচ্ছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানাচ্ছি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের যাতে ছাত্রছাত্রীদের হয়রান না করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ও কাজকর্ম যেন কোনভাবেই ব্যাহত না হয়।

—অধ্যাপক কে. এন. পানিক্কার, অধ্যাপক সি. পি. ভামব্রি, অধ্যাপক অনিল ভাট্টি, অধ্যাপক উৎসা পটনায়েক, অধ্যাপক প্রভাত পটনায়েক, অধ্যাপক জয়া হাসান, অধ্যাপক অঞ্জন মুখার্জী।

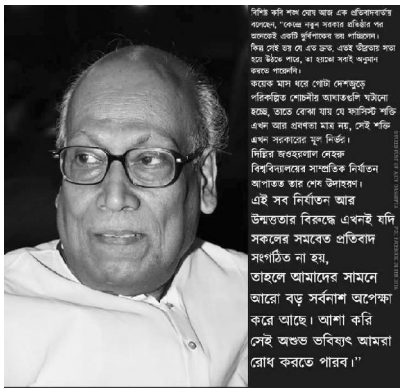

কেন্দ্রে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর অনেকেই একটি দুর্বিপাকের ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ভয় যে এত দ্রুত, এতই তীব্রতায় সত্য হয়ে উঠতে পারে, তা হয়তো সবাই অনুমান করতে পারেননি।

কয়েক মাস ধরে গোটা দেশজুড়ে পরিকল্পিত শোচনীয় আঘাতগুলি ঘটানো হচ্ছে, তাতে বোঝা যায় যে ফ্যাসিস্ট শক্তি এখন আর প্রবণতা মাত্র নয়, সেই শক্তি এখন সরকারের মূল নির্ভর। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক নির্যাতন আপাতত তার শেষ উদাহরণ। এই সব নির্যাতন আর উন্মত্ততার বিরুদ্ধে এখনই যদি সকলের সমবেত প্রতিবাদ সংগঠিত না হয়, তাহলে আমাদের সামনে আরো বড় সর্বনাশ অপেক্ষা করে আছে। আশা করি সেই অশুভ ভবিষ্যৎ আমরা রোধ করতে পারব।

—কবি শঙ্খ ঘোষ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সর্বাধিক। অপচয়-এর এই বিষয়টা এখনও প্রাসঙ্গিক। ভারত সরকারের 'সিলেকটেড এডুকেশনাল স্ট্যাটিসটিকস্' ২০০৩-০৪-এর প্রতিবেদন-এ দেখা যায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৪৭ জন শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। অর্থাৎ ৫৩ জন শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণিতে আসার আগে

পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সরকারকৃত বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে শহরের বিদ্যালয়গুলির তুলনায় গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে অপচয়-এর পরিমাণ বেশি। আবার এটাও গুরুত্বপূর্ণ বালিকা ও তফশীলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশী।

'অনুন্নয়ন' বা শিক্ষার মান সম্পর্কে হার্টগ কমিটি ১৯২২ সালে অনুসন্ধান করে। প্রতিবেদন-এ দেখা যায় যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ রয়েছে। হার্টগ কমিটির প্রতিবেদন-এর প্রায় নব্বই বছর বাদে বিষয়টি এখনও প্রাসঙ্গিক। ২০১৪ সালে ভারত সরকারের অ্যানুয়াল স্টাটাস অফ্ এডুকেশন রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া প্রতি ১০০ জন পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র ৫৩.৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণির বইপত্র ভালভাবে পড়তে পারে। ঐ রিপোর্ট-এ এটাও দেখা গেছে নীচু ক্লাসের পড়ুয়াদের মধ্যে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি সঠিকভাবে পড়ার হার ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে কমে গেছে। প্রতিবেদন-এ দেখা যায় নীচু ক্লাসের পড়ুয়াদের মধ্যে ২০১০ সালে মাত্র ৬৫.৮ শতাংশ পড়ুয়া সংখ্যাগুলি সঠিকভাবে পড়তে পারে।

ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে অপচয় ও অনুন্নয়নের পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। প্রাথমিক অপচয়ের কারণগুলি অনুসন্ধান করা হবে তারপর অনুন্নয়নের কারণগুলির উপর আলোকপাত করা হবে। অপচয়ের প্রধান কারণসমূহ হল চারটি। এগুলি হল অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও অন্যান্য। অপচয়ের অন্যতম সাধারণ কারণ হল জনসমষ্টির দারিদ্র্য। ফলে অনেকক্ষেত্রেই তারা প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। অনেকক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণিতে অকৃতকার্যতার জন্য পিতামাতারা তাদের পড়াশুনা চালাতে দেন না। সামাজিক বিষয়ের মধ্যে আসে লিঙ্গ অসমতা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, শিশুশ্রম, জাতপাত ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। বহুক্ষেত্রে নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিক্ষাগত বিষয়গুলোর মধ্যে আসে যথাযথ পঠন পাঠনের সুযোগ-সুবিধা, উপযুক্ত পাঠক্রম, উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি। এই তিনটি কারণ ছাড়া অনেক সময় দুর্বল স্বাস্থ্য, পিতামাতার মৃত্যু, অপুষ্টিজনিত ব্যাধি, অনিয়মিত উপস্থিতি প্রভৃতি কারণেও শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বিদ্যালয়ের প্রতি উদাসীনতা, অনীহা, বিদ্যালয় পরিবেশে সামঞ্জস্যবিধানের অক্ষমতার কারণেও অনেক সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে।

অনুন্নয়নের কারণসমূহ হল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অবাস্তব এবং অনাগ্রহমূলক পাঠক্রম, উপস্থিতির হারে অসমতা, ভ্রান্ত শিক্ষা পদ্ধতি, ভ্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতি, ভর্তির ভ্রান্ত পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, অপর্যাপ্ত সম্পদ, দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ইত্যাদি। উপরে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ তবে আলোচনার জন্য কেবলমাত্র ভ্রান্ত শিক্ষা পদ্ধতি ও ভ্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা হবে।

ভ্রান্ত শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে যা বলা দরকার তা হল শিশুর মন হল সাদা কাগজের মত। তাই যদি শিক্ষক যথার্থ পদ্ধতিতে পাঠদান করেন তাহলে শিক্ষার্থীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলবে। তার পাঠে আগ্রহী হবে ও কৃতকার্য হবে। সাধারণত শিক্ষকরা বোর্ড ব্যবহার করেন ও বক্তৃতা দেন। যাতে নতুনত্ব কিছু থাকে না। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনই বেশি গুরুত্ব পায়। এর বিপরীতে মনোবিজ্ঞানীরা খেলাভিত্তিক বা সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতিকে নির্দেশ করেন। বর্তমানে অনুসৃত পরীক্ষা পদ্ধতিও অনেকে বলেন সঠিক নয়। এখানে শিক্ষার্থীর সারা বছরের কৃতিত্ব বা পারদর্শিতাকে মাপা হয় না। মাত্র কয়েকঘন্টায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। ফলে পরিমাপগত ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা থেকেই যায়।

উপরে বর্ণিত অপচয় ও অনুন্নয়ন হ্রাসের উপায় সম্পর্কে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা যেতে পারে। এগুলি হল আকর্ষণীয় বিদ্যালয় পরিবেশ, পাঠ্যক্রমের পুনর্গঠন, ভর্তির পদ্ধতি পরিবর্তন, বিদ্যালয়ের সময় ও ছুটির সময়ের সংগতিবিধান, দুর্বল শিশুদের জন্য সংস্কারমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্কের উন্নয়ন, মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ, স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রমুখ। এগুলির প্রধান দু-তিনটি বিষয় সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে।

বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। সমাজের সমস্যাগুলি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এবং বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি সমাজের মাধ্যমে উপলব্ধি ও সমাধান করা প্রয়োজন। যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত অনুপস্থিতি বা অন্য কোন সমস্যা দেখা যায় তবে শিক্ষককে কালবিলম্ব না করে তার অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। বিদ্যালয়কে সমাজের কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলা দরকার, যেখানে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সার্থক সমন্বয়সাধন সম্ভবপর হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যাতে ব্যক্তির চাহিদা ও আশাআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রদত্ত শিক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং এই শিক্ষা যাতে সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষা যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে সেদিকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশন এ বিষয়ে গুরুত্ব

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

আরোপ করেছে।

যে-কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ১৯৬০ সালে থিওডোর সুলজ পশ্চিমী দেশগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক নানাবিধ তথ্যের সাহায্যে তুলে ধরেন। প্রায় ৩০ বছর বাদে ১৯৯০-এ রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে মানব উন্নয়নের সূচকের যে ধারণা দেওয়া হয় তাতে শিক্ষাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত করা হয়। এই উভয় পরিপ্রেক্ষিতে যে-কোন দেশের উন্নয়নের আলোচনায় শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা এসে পড়ে। বর্তমান প্রবন্ধে এই শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার অবহেলিত দিকটিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনাটি কেবল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা স্তরে কীভাবে এই অপচয় ও অনুন্নয়ন তা পরবর্তী কোন আলোচনায় করা যাবে।

মেডিক্যালে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা ও কিছু প্রশ্ন

—সনাতন মুর্মু

মেডিক্যালে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা (ন্যাশনাল এন্ট্রান্স এলিজিবিলিটি টেস্ট সংক্ষেপে নিট) চালু করতে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় ঘোষণা করেছে। সারা দেশে ক'বছর ধরে মেডিক্যাল শিক্ষায় সুযোগ পেতে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু ছিল তা এক এক রাজ্যে একেক রকম হত। এছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবেও একটি পরীক্ষা চালু ছিল অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল সায়েন্স সহ কিছু কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য। সারা দেশে অভিন্ন মেডিক্যাল পরীক্ষা চালু করা নিয়ে মামলা দায়ের হয়, বিতর্কও চলে। ফলে যে ব্যবস্থা এতদিন চালু ছিল তার বিরুদ্ধে যাঁরা সরব হয়েছিলেন এবং অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু করতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন তাঁদের পক্ষে রায় দিয়ে শেষপর্যন্ত সর্বোচ্চ আদালত দেশে একটিমাত্র অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছে। এবং সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ও মেডিক্যাল কাউন্সিল অব্ ইণ্ডিয়া। উল্টোদিকে কয়েকটি রাজ্য সরকার, বেসরকারি ও সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং এই রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা ও তাঁদের অভিভাবকরা সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই রাজ্যের তরফেও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে এ বছর যাতে রাজ্য পরিচালিত সংস্থা মারফৎ প্রবেশিকা পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুরোধে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারি করে এ বছরের জন্য রাজ্য সংস্থা পরিচালিত ব্যবস্থা দ্বারা প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে ছাত্রদের ভর্তি করতে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু বেসরকারি কলেজগুলির ক্ষেত্রে অভিন্ন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি করতে হবে। রাজ্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে চান তাঁদের সর্বভারতীয় পরীক্ষা ক্যানসেল করে বসতে হবে।

অভিন্ন প্রবেশিকা সর্বভারতীয় স্তরে চালু হলে প্রধান সমস্যায় পড়বে মাতৃভাষায় যাঁরা পড়াশোনা করছেন তাঁরা। কারণ পরীক্ষা হবে ইংরেজি মাধ্যমে। বাংলা মাধ্যমে, ধরা যাক, যে সমস্ত ছাত্ররা পড়াশোনা করছেন, তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসা বেশ কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এ রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের অনুমোদিত যে পাঠক্রম (সিলেবাস) পড়ানো হয় তা সর্বভারতীয় স্তরে সেন্ট্রাল বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিল সিলেবাস আপডেট করলেও তা কখনওই সিবিএসই-র সিলেবাসের সঙ্গে এক নয়। সেক্ষেত্রেও অভিন্ন সিলেবাস সারা দেশে চালু হলে তবেই মাতৃভাষায় পাঠ নেওয়া শিক্ষার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। অন্যান্য কিছু রাজ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অথচ অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে সিবিএসই সিলেবাসকে কেন্দ্র করে। সুতরাং সিবিএসই সিলেবাসে যাঁরা পড়াশোনা করছেন তাঁরা বাড়তি সুবিধা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

পাবেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরাই সংখ্যাধিক্য এবং কাউন্সিলের অনুমোদিত সিলেবাসে তাঁরা যেহেতু পড়াশোনা করেছেন তাঁদের পক্ষে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়াটা বেশ কঠিন হয়ে উঠবে। যে সমস্ত বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত ছাত্ররা প্রবেশিকা পরীক্ষায় কিছুটা ভাল ফল করলেও দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্ররা (যাঁদের পিতামাতার সামর্থ্য নেই তাঁদেরকে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ করে পাঠ তৈরির সুযোগ করে দেওয়ার) পড়বে অকূল পাথারে।

এমনিতে আমাদের রাজ্যে নিয়ম আছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাঁরা সফল হন তাঁদের থেকে ৫ শতাংশ এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্র থেকে উত্তীর্ণ ১৫ শতাংশ ছাত্রদের মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ আছে। অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে সুযোগ থাকবে না তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেডিক্যাল-এ পড়ুয়ারা এমনিতে একধরনের এলিট শ্রেণিতে পরিণত হত, বর্তমানে ১০০ শতাংশই এলিট হয়ে উঠবে। মেধাটা আর মাপকাঠি হয়ে উঠবে না। অর্থ এবং অর্থই হবে মেডিক্যাল শিক্ষার নির্ধারক। যদিও মেডিক্যাল কাউন্সিল অব্ ইণ্ডিয়া (এমসিআই) নিট-এর পক্ষেই জোরালো সওয়াল করেছে। তাদের অভিযোগ নিট এতদিন না হওয়ার ফলে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজগুলি ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ক্যাপিটেশন ফি নিচ্ছিল। সেক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে অর্থ হয়ে উঠেছিল ছাত্র ভর্তির মানদণ্ড। এতে করে মেডিক্যাল পড়াশোনার মানও নাকি পড়ে যাচ্ছিল। ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে মেডিক্যালে পড়া বন্ধ হলেই নাকি মেডিক্যাল শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে, এমনই অভিমত এমসিআই-এর।

এমনিতে আমাদের দেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা অপ্রতুল। ফলে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজই দেশে মেডিক্যাল পাঠক্রম চালুতে মূল ভরসা। আমাদের দেশে একসময় কর্ণাটক রাজ্যে কিংবা দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যে সমস্ত প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ গজিয়ে উঠেছে সেখানে ছাত্রদের ভর্তি হতে হলে মোটা টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিতে হত। এখনও দিতে হয়। সরকারের বা এমসিআই-এর বক্তব্য এখন অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে মেধার ভিত্তিতেই প্রাইভেট কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তি করতে হবে। যদিও একশ শতাংশ মেধাতালিকা থেকে নেওয়া হবে বলে মনে হয় না এবং মেধাতালিকায় থেকেও ছাত্রদের নানা কারণ দেখিয়ে ন্যূনতম হয়ত ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে ডাক্তার বনতে হবে। ওই বিপুল পরিমাণ টাকা টিউশন ইত্যাদি ফি হিসাবে নেওয়া হবে। এটিও ঘটনা যে শিক্ষায় বেসরকারিকরণ এখন সরকারই ঠিক করে দিচ্ছে। মেধাতালিকা বাদ দিয়ে প্রাইভেট কলেজ যে ম্যানেজমেন্ট কোটা রাখবে সেক্ষেত্রে বর্তমানে একজন ছাত্রকে ৪০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষ টাকাও দিতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তা আরও বাড়তে পারে। জানি না সরকার মানে কেন্দ্রীয় সরকার কি পারবে এই বিষয়টি রুখতে? বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে যে সমস্ত প্রাইভেট কলেজ মেডিক্যাল শিক্ষা দান করবে তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণটা কীভাবে রাখবে? এসব বিষয়ে ধোঁয়াশা আছে। সেই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ভুয়ো বা নিম্নমানের না তো? সুতরাং অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু হলেই মেডিক্যাল পাঠক্রমের উন্নয়ন ঘটবে এবং সবকিছু স্বচ্ছ হয়ে উঠবে ভেবে নিলে ভুল হবে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে পণ্য করে তুলে কতিপয় উচ্চবিত্ত ও ধনীর দুলালদের জন্য তুলে দিতে চাইছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষা আর আপামর জনতার জন্য নয়, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাও অর্থ নির্ভর। অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু করলে অভিন্ন সিলেবাস তৈরির দিকেও নজর দিতে হবে। অন্যান্য পরিকাঠামো ও সুযোগ সুবিধা সকলে যাতে সমানভাবে পায় সেদিকেও নজর দিতে হবে।

নপরাজিত মণিপুর

দেশের সর্বোচ্চ আদালত আফস্পা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর মণিপুরের বীরাঙ্গনা **আইরম শর্মিলা** চানু তার দীর্ঘ ১৬ বছরের অনশন ভেঙ্গে আফসপার সম্পূর্ণ রদের দাবীতে গণ আন্দোলনে অংশ নিতে চেয়েছেন। তার হাত থেকে মশাল তুলে নিয়ে আফস্পা প্রত্যাহার ও ইনার পারমিট পুনরায় চালুর দাবীতে অনশন শুরু করেছেন 'উইমেন এগেনসট্ ক্রাইম'-র নেত্রী মানবাধিকার কর্মী দু'সন্তানের জননী ৩২ বছর বয়স্কা **আরম্বাম ওংবি কোনথৌজাম রোবিতা লেইমা**। এছাড়াও জোরালো আইনী ও গণ আন্দোলন শুরু করেছে ৩৭ বছর বয়সী ভূয়ো সঙঘর্ষে স্বামী হারানো **নীনা নিনগমবমের 'এক্সট্রা জুডিসিয়াল এক্সিকিউশন ভিকটিম ফ্যামিলিস্ (ই ই ভি এফ এ এম)'** এবং '**আপুনবা নুপি লুপ**', '**আপুনবা মণিপুর কানবা লুপ**' সংগঠনগুলির মহিলারা।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ডাক্তারি শিক্ষা নিয়ে মেয়েকে লেখা চারু মজুমদারের চিঠি

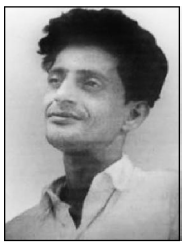

[আমাদের পাঠক্রমে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কন্যা আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা চিঠি পড়েছি। এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান বিপ্লবী নেতা চারু মজুমদারের কন্যা ডাঃ অনিতা মজুমদারকে লেখা একটি চিঠির পুনঃপ্রকাশ করা হল।]

বিপ্লবী হতে হলে নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয়। তবেই তো একটা মানুষের পরিবর্তন হয়। সে নতুন বিপ্লবী মানুষে পরিণত হয়।

তোমাদের এখন শেখার সময়। এখন নিশ্চয় শিখতে হবে। এখন শেখা বলতে শাসক শ্রেণি কী কী বোঝে আর আমরা কী বুঝি। শাসক শ্রেণি বোঝে যে শিক্ষা এমন হোক যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে এবং সেই শিক্ষা মারফতে তারা তোমাদের উপযুক্ত করে তুলতে চায়, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসাবে। তাই তারা শিক্ষাকে বাস্তব কাজ থেকে আলাদা করে রাখে এবং শিক্ষার ভেতর দিয়ে তারা তোমাদের জনতা বিরোধী আত্মচিন্তাকে প্রধান করে তোলে। তাই চেয়ারম্যান বলেছেন 'The more you read, the more you become foolish'। কারণ যতো পড়বে ততো বাস্তব কাজ থেকে তুমি যাবে দূরে সরে এবং যতো পড়বে ততো তুমি হবে জনবিরোধী, আত্মম্ভরী এবং আত্মকেন্দ্রিক; স্বার্থপরতা বেড়ে যাবে এবং বাস্তব কাজ থেকে বিচ্যুত থাকায় জনতার সেবার পক্ষে তুমি হবে ততো অনুপযুক্ত। তাহলে আমরা শিক্ষা বলতে কি বুঝি? আমরা জানি জ্ঞানের তিনটি সূত্র,

১) উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম
২) শ্রেণি সংগ্রাম
৩) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংগ্রাম।

জ্ঞানের তিনটি সূত্র সত্যি সত্যি তোমরা পাবে যদি তোমরা উৎপাদনের সাথে যুক্ত হও। আজকের সমাজে তোমাদের সে সুযোগ খুবই কম। তাই আজকের যুগে তোমাদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিৎ—

১) মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ, মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারা আয়ত্ত করার শিক্ষা
২) ভারতবর্ষের সংগ্রামের ইতিহাস
৩) আমাদের জীবনে দৈনন্দিন কাজের সমস্যা।

এইগুলোকে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যয়ন করতে হবে। এই শিক্ষাই খাঁটি শিক্ষা এবং এগুলো থেকেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নির্ধারিত হবে। ডাক্তারি যদি শিখতেই হয় তাহলে শিখতে হবে এই ভারতবর্ষের মানুষকে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত করার জন্য। এই ভারতবর্ষ হচ্ছে কৃষকের দেশ কাজেই কোটি কোটি কৃষকের জীবনে আধুনিক বিজ্ঞান এবং মনুষ্য সমাজের সমস্ত আরোগ্য পদ্ধতি নিয়ে যেতে হবে, যাতে তারা রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারে। এই সংগ্রামে তুমি হবে সৈনিক এবং তোমার লক্ষ হবে ব্যাপক কৃষক জনতাকে যাতে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারো—কয়েকটি বিশেষ রোগের বিশেষজ্ঞ হবার জন্য নিশ্চয় নয়। আমরা যা কিছু করবো, যা কিছু শিখবো সবই জনতার জন্য, তার মানে আমাদের দেশ কৃষকের জন্য। এই কৃষককে চেনা, কৃষককে বোঝা, কৃষকদের সাহায্য করার নামই হল দেশপ্রেম, যে দেশপ্রেমের জন্য জীবন দেওয়া প্রত্যেকটি মানুষের একটি পবিত্র কাজ। দৈহিক পরিশ্রম করতে যারা ভয় পায় তারা কিছু করতে পারে না। আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা হল সামন্তশ্রেণীর দান। শ্রমিক শ্রেণির দর্শন শেখায় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে। ভীরুতা, কাপুরুষতা ধনিক শ্রেণির দান—কারণ তারা ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। তাই ধনিক শ্রেণির সাহিত্যে কাপুরুষতার প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ যেহেতু সকলে মিলেই সিদ্ধ হতে পারে এবং সফল হতে পারে চরম ত্যাগস্বীকারে, তাই শ্রমিক শ্রেণির দর্শন শেখায় মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসের অধিকারী হতে।

ভবিষ্যতের মানুষ হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি কর। মনকে বিপ্লবী বানাতে হয় প্রথম। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। আর সংগ্রাম করতে হয় নিজের সাথে। বারবার ব্যক্তিস্বার্থ বড় হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিস্বার্থ শোষণভিত্তিক সমাজের দান। স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষের চরিত্র পরিবর্তনের সংগ্রাম। সামাজিক মানুষ হওয়া সাধারণ নয়। এই লড়াই শুরু হয়েছে মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবে। বিরাট জয়ের সম্ভাবনা আমাদের সামনে। তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর।

[কৃতজ্ঞতা ঃ **'এবং জলার্ক'** ও **শুভজিৎ ভট্টাচার্য্য**]

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদ

—*বিবর্তন ভট্টাচার্য্য*

['স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' আহুত অলোচনাচক্রে প্রদত্ত; ২৭-০৮-২০১৬]

বহু বছর আগে 'উৎস মানুষ' পত্রিকার একটি আড্ডার বিষয় ছিল ''ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের দ্বন্দ্ব''— এই আড্ডার বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানমনস্কতার পাঠ। এমন বহু কাজ আমরা করি তার আগে ও পিছে চিন্তা করা সত্ত্বেও শুধু দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ভুল করে ফেলি। এছাড়াও রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুলিয়ে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া আর তার সাথে যুক্ত কর্পোরেট মিডিয়া সব মিলিয়ে মানুষের যুক্তি বুদ্ধিকে নিধন করবার যে ভয়ংকর চক্রান্ত তা রোধে আজকের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

এই সভায় যে সব প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট মানুষেরা উপস্থিত তাঁদের কাছে আমি কিছু বহুল আলোচিত বিষয় আবার উপস্থাপন করতে চাই।

আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা যাঁরা এই বিজ্ঞানমনস্কতার পাঠ দেওয়ার জন্য প্রায় সারাটা জীবন অতিবাহিত করলাম তারা কেন এই ভাবনা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারিনি।

প্রথমত, আমরা লক্ষ্য করেছি, অত্যন্ত অন্ধভাবে (ডগম্যাটিক) যুক্তিবাদকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে বাবা ও ধর্মগুরুদের সমালোচনা করে নিজেরাই যুক্তিবাবাতে পরিণত হয়েছি। কারণ বিজ্ঞানমনস্কতার আন্দোলন
পাশে এব
মানুষ ছো
তারা আ

অনে
পরাজিত
জীবনযাপ
বিশ্বায়নে
আরো অ
মিডিয়া।
সাধারণ
সুন্দরভা
সংস্কৃতির

ষড়ানন পাণ্ডা

দায়বদ্ধতাকেও গুলিয়ে দেওয়া যাবে। তাই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সেই উক্তি ''আমরা অদৃষ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি আর শিক্ষিত এই ভান করে ক্লিষ্ট দেহে দিন কাটাচ্ছি।''

এবার বলি বিজ্ঞানমনস্কতার আন্দোলন কীভাবে এগোনো সম্ভব। ১৯৯০ সালের একটি ঘটনা বলি। মাজদিয়া লাইনে 'বহিরগাছি' রেলস্টেশন, শোনা গেল বহু মানুষ সেখানে যাচ্ছেন নারকেল, ফুল, বাতাসা নিয়ে। বিষয় 'নলকূপ পুজো'। ওখানে এমন একটি নলকূপ খনন করেছে 'সি. এ. এস. এ' নামক একটি জার্মান সংস্থা, যে জল খেয়ে মানুষের বিভিন্ন পেটের রোগ সেরে যাচ্ছে। রানাঘাট স্টেশন থেকে অনেক কষ্টে গেদে লোকালে পৌঁছলাম আমরা। প্রায় ২৫০ লোকের পিছনে লাইন দিলাম প্ল্যাস্টিকের একটি ৫ লিটারের জ্যারিকেন হাতে। জল তো পেলাম এবার এর বি. ও. ডি. পরীক্ষা করব কোথায়? তখনও আর্সেনিকের কথা পশ্চিমবঙ্গে আলোচনাতেই নেই। তাই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগকে দিয়ে পরীক্ষাটি করানো গেল বটে, তাতে তো জল নিরাপদ তাই পেটের রোগ হচ্ছে না এইটুকু বুঝলাম। কিন্তু অন্য বিষয়গুলি?

এছাড়া ঐসময় আমরা এইটুকু জেনেছিলাম যে ঐ কলটিতে ৩০টি পাইপ ও তিনটি ফিল্টার আছে। প্রায় চারবছর পরে বুঝতে পারলাম ঐ কলটার নাম মার্ক-টু। আর্সেনিক রোধে সরকার এই কল বসানো শুরু করল। তাতেও অবশ্য আর্সেনিক মহামারী রোধ করা যায়নি। আমার বক্তব্য হল আমরা সেই সময় গিয়ে মাইক নিয়ে প্রচার করিনি ঐটি অলৌকিক নলকূপ নয়। আমরা শুধু এইটুকু বলেছি হয়তো ঐ জলস্তরে শুদ্ধ জল পাওয়া যাচ্ছে, তাই পেটের রোগের সমস্যা হচ্ছে না। তবে এই হুজুগ বেশিদিন থাকবে না। এরপর ১৯৯৮ সালে 'অলৌকিক নলকূপ' নাম দিয়ে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে একটি খবর পাঠাই তাতে বহিরগাছির বহু মানুষ আমাদের ধন্যবাদ জানায়। আসলে অসুবিধাটা হল বর্তমান প্রজন্ম 'মার্ক' বাদে বিশ্বাসী তাই কীভাবে 'মার্ক' বৃদ্ধি পাবে তাই নিয়ে ব্যস্ত। ওদের তাই পাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই পড়বার সময় এবং ইচ্ছে দুটোই নেই। এরপর মোবাইল, টিভি, ইন্টারনেট, ওয়াটাস অ্যাপ কত কিছু। এরফলে লাইব্রেরিগুলো মৃতপ্রায়। আবার আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের কথা না বলে পারছি না। তিনি বহু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ছাত্রদের বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে। তিনি বুঝলেন রসায়নের রস

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বোঝাতে রাস্তায় নামতে হবে। লক্ষ্য করলেন গবেষণাগারে যাওয়ার থেকে মানুষের কাছে চিড়িয়াখানায় যাওয়া ও পশুপাখি দেখা ও তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানার দারুণ আগ্রহ।

তিনি তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে একটি বই লিখে ফেললেন কিন্তু সেই বইয়ের একদম কাটতি হল না। পরে একজন ইন্সপেক্টর হঠাৎ ঐ বইটি 'টেক্সট বুক কমিটি'র অনুমোদনের জন্য পাঠালেন ও ঐ বইটি অনুমোদিত হল। ব্যস প্রায় সমস্ত বই বিক্রি হয়ে গেল। আসলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর অন্য বই পড়বার চর্চাও কমে গেছে এই জন্য পাঠচক্রে জোর দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। পরীক্ষামূলকভাবে 'বিজ্ঞান দরবার' এবং কিছু বিজ্ঞান সংগঠন ২০১০ সাল থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এরফলে কঠিন বিষয়গুলির সরল উপস্থাপন মানুষকে মুক্তচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করবে। এবং সংগঠিত মানুষকে নিয়ে এলাকার পৌরসভা, পঞ্চায়েত যাতে ঐ একই কাজ করে তার ব্যবস্থা নিতে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে। যেমন— মাটির নীচের জল তোলার বিপদ, ডি. জে. সাউন্ড বন্ধ অথবা পুকুর ভরাট ও গাছ কাটা রোধে আমরা এলাকায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি ঠিক একই নিয়মে।

ভালো কাজে ভালো মানুষের অভাব— এটা আগেও ছিল এখনও আছে। আর একটি বিষয় হল প্রায় সব মানুষ ও রাজনৈতিকদের দেখি তাঁরা সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী কিন্তু যখন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে বলতে শুনি একটি ছোট্টো রাজনৈতিক দল দেশের অভ্যন্তরীণ বিপদ তখন মনে হয় ২০ জন সঠিক বিজ্ঞানমনস্ক যুবক ২০ হাজার মত্ত মানুষকে রুখতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় একা একা শান্তিনিকেতন তৈরির গল্প তো আমাদের সবার জানা। আর সংখ্যার বিচারে বিরাট দলের বিরাট বিরাট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন যখন প্রায় শেষ তখন তাদের দর্শনহীনতার কথা বারবার মনে করিয়ে দেয়। খুব তত্ত্বের খুব পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ধারাবাহিকতার ও অপরের সমালোচনা না করে সঠিক লক্ষ্যে নিজেদের কাজে সঠিক মনোনিবেশ। তবে এগোবে এই চর্চার। সাথে চাই নিজেদের সততা, সৎ প্রচেষ্টা এবং আপোষহীন লড়াইয়ের মানসিকতা। আর সবসময়েই মানুষের মধ্যে থেকে তাদের যুক্ত করে উদ্যোগগুলি নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উৎসাহের সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, বিমল মাইতি

এই আরোপিত অমানিশা কাটিয়ে উঠব বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যুক্তিবাদের সাহায্যে —

এই প্রত্যয়ই শোনা গেল শনিবার ২৭ আগষ্টের দুপুর থেকে বিকেল অবধি কলকাতার বেঙ্গল মোশন পিকচার্স ইউনিয়ন হলে (জর্জভবন)। সেখানে এক আলোচনা সভায় এক হয়েছিলেন বিভিন্ন যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা। ছিলেন লেখক, সাংবাদিক, আলোকচিত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, পত্রিকা সম্পাদক, মানবাধিকার কর্মীরাও। অনুষ্ঠানের আয়োজক ''স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন''। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের জন স্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল এবং পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের অগ্রজ প্রাণপুরুষ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু।

আলোচনায় অংশ নেন তৃণমূল স্তরে কাজ করা প্রবীণ বিজ্ঞান সংগঠক ষড়ানন পান্ডা, অরুণ সেন, বিজন ভট্টাচার্য, প্রবীর বসু, বিবর্তন ভট্টাচার্য, জয়দেব দে, নির্মলেন্দু নাথ, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ ঘোষ, সুনীত দে, বিমল মাইতি, জয়ন্ত মাঝি, পিনাকী প্রসাদ চক্রবর্তী, নিলয় সামন্ত, সমর রায়, লক্ষ্মীকান্ত দাস, লক্ষণচন্দ্র বেরা, নন্দা মুখোপাধ্যায়, অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পায়েল পাল, শিলা দে সরকার, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ সেন, সাম্পান পাঠক, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র নাথ রায়, ডাঃ অভিজিৎ নন্দী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

একদিকে আগ্রাসী ধর্মীয় মৌলবাদ ও পুনরুত্থানবাদ অন্যদিকে বৃহৎ, একচেটিয়া ও ক্রনি পুঁজি লালিত নিও-লিবারেল এবং কর্পোরেট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিকূলতা নিয়ে সভায় আলোচনা করেন অংশগ্রহণকারীরা। কি করে এই সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করা যায়

বিবর্তন ভট্টাচার্য্য

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

এবং মানুষের কাছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সভ্যতার সুফলগুলি পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়েও খোলামেলা মত বিনিময় করেন অংশগ্রহণকারীরা। কেউ কেউ বলেন এক্ষুনি হয়ত ঝড় উঠবে না, কিন্তু বাতি জ্বালানোর কাজটি আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যাতে ঝড় উঠলে সেটিকে দাবানলে পরিণত করা যায় এবং সঠিক দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

সভা থেকে সংহতি, বিনিময়, সমবায় এবং সমন্বয়ের ওপর জোড় দেওয়ার ডাক দেওয়া হয়। স্থির হয়, যৌথ উদ্যোগ ও যৌথ অনুশীলন এবং চলমান নিজস্ব পকেটে নিজস্ব উদ্যোগগুলির পাশাপাশি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে সমমর্মী সংগঠনগুলির সঙ্গে এক হয়ে কাজ করার— যাতে এর কার্যকারিতা এবং প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। এর সাথে ধারাবাহিক প্রচার এবং সহমর্মী সংগঠনগুলির নিয়মিত যোগাযোগ ও বছরে অন্তত দু'বার বিশ্লেষণাত্মক বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগুলি অনুষ্ঠিত হবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্রামে, শহরে, শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন কাজের এলাকায়। বক্তারা কুসংস্কার, মানবতাবিরোধী বিষয়গুলিতে একযোগে নিষ্ঠা এবং সততা নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। নিজেদের ও নিজেদের পরিবারের মধ্যে এবং নিজের নিজের

জয়ন্ত মাঝি

এলাকাতে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে জোড় দেওয়ার কথা বলা হয়। সিদ্ধান্ত হয় কাজের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হবে দরিদ্র, পশ্চাদপর, প্রান্তিক, দুর্গম এবং প্রতিবন্ধী অঞ্চলগুলিতে। বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের সাথে সাথে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনমুখি ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের উপরেও জোর দিতে হবে। এবং সামগ্রিক কাজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য, দিশা ও অভিমুখ যাতে স্থির এবং জনমুখী থাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' প্রকাশনাকে প্রিন্ট, সোশাল ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে জনপ্রিয়ভাবে প্রচার চালাতে হবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সেতু গড়তে হবে। বক্তারা এটিকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করার উপর গুরুত্ব দেন। তাদের কি করে আরও উন্নত, আধুনিক, বাহুল্য বর্জিত ও সহজ করে সুলভে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে বলেও মতামত উঠে আসে সভা থেকে। এক এক বার এক একটি বিষয়ের ওপর এবং বিশেষ সংখ্যার ওপর জোড় দেন বক্তারা। 'যাতে অনেক বিষয়ের ভিড়ে আসল লক্ষ্য হারিয়ে না যায়' উঠে আসে সেই মতও। অন্যান্য মুখপত্র ও ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি না করে এক একটি মুখপত্র/ম্যাগাজিনকে একেকটি বিষয় ও পাঠকগোষ্ঠীর উপর মনযোগী হতে অনুরোধ করা হয়। উদাহরণ— বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মানবাধিকার, জৈব চাষ, পরিবেশ, ক্রীড়া, ভ্রমণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়গুলি বা সেগুলিরও উপবিভাগগুলির উপর তারা কাজ করতে পারেন। অন্যদিকে পাঠকগোষ্ঠী হিসাবে স্কুলছাত্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতিদের নির্বাচিত করে তাদের মধ্যে অল্প দামে পৌঁছে দিতে হবে। সভা শেষ হয় সকলের শুভেচ্ছা, সুন্দর মতের আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েই।

[সংকলক ঃ জয়দেব দে ও শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়]

ভারত ডব্লিউ এইচ ও-র ঠিক করে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রায় কতটা পৌঁছেছে (এমডিজি) ঃ

বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	সময়সীমা	অর্জন (শতাংশ)
পাঁচ বছরের নীচে শিশুমৃত্যু হার কমানো	২/৩	২০১৫	৫৮
হাম টীকাকরণ	১০০ শতাংশ	,,	৭৪
মাতৃত্বকালীন মৃত্যু	৩/৪	,,	৬৬
প্রশিক্ষিত সেবিকার মাধ্যমে প্রসব	১০০ শতাংশ	,,	৬৭
পরিবার পরিকল্পনা সহায়তা	১০০ শতাংশ	,,	২১
এইচ আই ভি সংক্রমণ	১০০ শতাংশ	,,	৫৭
টিবিতে মৃত্যু আটকানো	১০০ শতাংশ	,,	৫০
বিপজ্জনক জল ব্যবহার বন্ধ করা	১০০ শতাংশ	,,	৭৭
মাঠেঘাটে মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করা	১০০ শতাংশ	,,	২২

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ডাল

—স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয়দের খাদ্য তালিকায় ডাল বা পালস্ একটি অন্যতম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর উপাদান। ডালে প্রচুর প্রোটিন থাকায় এবং সস্তা ও সহজলভ্যতার কারণে এক সময় বলা হত 'গরীবের মাংস'। যদিও কৃষিতে জমি ও অন্যান্য সঙ্কট, বিশেষ করে বিদেশী নির্ভর সবুজ বিপ্লবের পর কেবলমাত্র কয়েক ধরনের অর্থকরী ফসল চাষ, মজুত, বিক্রি নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ী-দালালদের ফাটকাবাজি-দাম নিয়ন্ত্রণ এবং কিছু ব্যবসায়ী লবির প্রভাবে সরকারের বিদেশ থেকে ডাল আমদানি নীতি কৃষকদের ডাল চাষে নিরুৎসাহিত করেছে। ডালের দামও অস্বাভাবিক জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে গরীবদের হাত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অনেকে অল্প ডাল কিনে জল মিশিয়ে লপসি বানিয়ে খাচ্ছেন।

আমাদের দেশে অসংখ্য ধরনের ডাল উৎপাদন হত। ডালে প্রোটিনের ভাগ ২০-২৫%। যা গমের চাইতে দ্বিগুণ, চালের তিনগুণ এবং ডিম, মাছ ও মাংসের চাইতে বেশী। কিন্তু প্রোটিনের গুণগত মানের দিক থেকে আমিষ খাদ্য আরও ভাল। ডালে এসেনসিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির মধ্যে মেথিওনিন ও সিসটিনের পরিমাণ কম। লাইসিনের পরিমাণ বেশী। ভিটামিনের, বিশেষত রাইবোফ্ল্যাবিন ও থায়ামিনের পরিমাণ ভাল। অঙ্কুর উদগমনিত ডালে (জারমিনেটেড) এই ভিটামিনগুলি সহ ভিটামিন 'বি' ও 'সি'-র মাত্রা বেড়ে যায়। ডাল জারালে (ফার্মিনেটেড) খাদ্যগুণের পরিবর্তন হয়।

কাঁচা অবস্থায় আবার ডালে কিছু পুষ্টি-বিরোধী দ্রব্য (অ্যান্টি নিউট্রিশন ফ্যাক্টর), যেমন ফাইটেটস্, ট্যানিন্ ইত্যাদি থাকে যেগুলি সাধারণভাবে ফোটানোর সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায়। খেসারির ডালে বিটা অক্সালিন অ্যামাইনো অ্যালানিন নামে এক ধরনের পদার্থ থাকে যার জন্য খেসারির ডাল বেশী খেলে ল্যাদিরিজম নামক এক স্নায়বিক রোগ হয় যার পরিণতিতে চলাফেরার ক্ষমতা চলে যেতে পারে। ডালে কয়েক ধরনের অলিগোস্যাকারাইড শর্করা বেশী থাকার জন্য বেশী ডাল খেলে পেট ফাঁপতে পারে।

সোয়াবিন এক ধরনের উৎকৃষ্ট ডাল যা খাদ্য তালিকায় নানাভাবে রাখা যায়। সোয়াবিনের তেলও তৈরী হয়। সোয়াবিনে উন্নত মানের প্রোটিনের ভাগ অত্যন্ত বেশী (৪৩%)। কিন্তু মেথিওনিম কম থাকে। খনিজ পদার্থও পর্যাপ্ত (০৪%)। তবে স্নেহজাত পদার্থ অর্থাৎ ফ্যাটের পরিমাণ বেশী (২০%)।

৯৩ বছরেও সুস্থ ও সক্রিয়

কেরলের নবতিপর সবচাইতে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি. এস. অচ্যুতানন্দনের, যার কাঁধে ভর করে এবারও এল.ডি.এফ. বিধানসভা নির্বাচনে জিতল, সুস্থ ও সক্রিয় থাকার উপায় ঃ

* ভোর সাড়ে চারটেয় শয্যাত্যাগ
* ৩০ মিনিট যোগাসন, ১৫ মিনিট ব্যায়াম, ২০ মিনিট হাঁটা
* ১০ মিনিট সূর্যস্নান
* প্রাতঃরাশ ঃ তিনটি ইডলি বা একটি ধোসা, ডাবের জল
* দুপুরের খাওয়া ঃ সামান্য ভাত, কিচেন গার্ডেনে তৈরী সব্জি সেদ্ধ, কোন তেল বা নুন নয়।
* দুপুরে এক ঘন্টা দিবানিদ্রা
* নৈশাহার ঃ তিনটি ছোট কলা ও কয়েক টুকরো পেঁপে, ডাবের জল
* ঘুমোনোর আগে ২০ মিনিট পায়চারি
* নৈব নৈব চ ঃ মাছ, মাংস, চা, কফি, অ্যালকোহল, কোল্ড ড্রিঙ্কস, তামাক, বাইরের খাবার

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কয়েকটি বহুল প্রচলিত ডালের খাদ্যগুণ প্রকাশ করা হল ঃ

ডালের নাম	শক্তি (কিলো ক্যালরি) ১০০ গ্রামে	প্রোটিন (গ্রাম)	ফ্যাট (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.)	আয়রন (মি.গ্রা.)	ভিটামিন-এ (মি.গ্রা.)	ভিটামিন-বি$_১$ (মি.গ্রা.)	ভিটামিন-বি$_২$ (মি.গ্রা.)	নিয়ামিন (মি.গ্রা.)	ফোলিক অ্যাসিড (মি.গ্রা.)	ভিটামিন-সি (মি.গ্রা.)	ফাইবার (গ্রাম)
* মুসুর ডাল (লেনটিল)	৩৪৩	২৫.১	০.৭	৬৯	৭.৫৮	২৭০	০.৪৫	০.২০	২.৬	৩৬	—	০.৭
* মুগ ডাল (গ্রীন গ্র্যাম)	৩৪৮	২৪.৫	১.২	২৫	৩.৯০	৪৯	০.৪৭	০.২১	২.৪	১৪০	—	০.৮
* ছোলার ডাল (বেঙ্গল গ্র্যাম)	৩৭২	২০.৮	৫.৬	৫৬	৫.৩০	১২৯	০.৪৮	০.১৮	২.৪	১৪৭.৫	১	১.২
* মটর ডাল (পীস ড্রাই)	৩১৫	১৯.৭	১.১	৭৫	৭.০৫	৩৯	০.৪৭	০.১৯	৩.৪	৭.৫	—	৪.৫
* অরহর ডাল (রেডগ্র্যাম)	৩৩৫	২২.৩	১.৭	৭৩	২.৭০	১৩২	০.৪৫	০.১৯	২.৯	১০৩	—	১.৫
* রাজমা	৩৪৬	২২.৯	১.৩	২৬০	৫.১০							৪.৮
* মাসকলাই বা উরাদ ডাল (ব্ল্যাক গ্র্যাম)	৩৪৭	২৪	১.৪	১৫৪	৩.৮০	৩৮	০.৪২	০.২০	২	১৩২	—	০.৯
* সোয়াবিন	৪৩২	৪৩.২	১৯.৫	২৪০	১০.৪০	৪২৬	০.৭৩	০.৩৯	৩.২	১০০	—	৩.৭

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সকলের জন্য স্বাস্থ্য

অবস্থাটা এরকম— পয়সা নেই? তাহলে ডাক্তার নেই, ওষুধও নেই।

ওষুধ কিনবেন? একই ওষুধ পাওয়া যায় নানা নামে, নানা দামে। ডাক্তার যদি দামি ব্র্যান্ডের ওষুধ লেখেন সেটাই আপনাকে কিনতে হবে।

পরীক্ষানিরীক্ষা করাবেন? কোথা থেকে করাবেন তা ডাক্তার বলে দেবেন, যত দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হয়তো তত বেশি কমিশন ঢুকবে ডাক্তারের পকেটে।

স্পেশালিস্টকে রেফার করা হয়েছে? সেখানেও হয়তো কাট-মানি-র গল্প।

কিন্তু যদি এমন হত?

* অসুস্থ হলে কোন ডাক্তার দেখাবেন সেটা ঠিকই করা আছে। অথচ তার জন্য কোনো খরচ নেই।

* কোন সমস্যায় ডাক্তার কী পরীক্ষা করাবেন তা চিকিৎসার নির্দেশিকায় লিখিতভাবে আছে।

* কোথা থেকে পরীক্ষা হবে, তাও আগে থেকে স্থির করা আছে, তাতেও কোনো খরচ নেই।

* ডাক্তার ওষুধ লিখবেন প্রামাণ্য চিকিৎসা-বিধি মেনে। আপনি ওষুধ পাবেন বিনামূল্যে।

* বিশেষ প্রয়োজনেই বিশেষজ্ঞকে সুপারিশ করা যাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞও ঠিক করা আছে।

* হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা, প্রাথমিক থেকে সবচেয়ে ওপরের স্তর— কোনো স্তরেই কোনো খরচ নেই।

* নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত খরচ জোগায় সরকার প্রধানত প্রত্যক্ষ কর থেকে।

এই ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল হেলথ্ কেয়ার বা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা। সোজা কথায় বলা হয় সবার জন্য স্বাস্থ্য।

আজকের অবস্থায় যেখানে স্বাস্থ্য একটা পণ্য, গাঁটের কড়ি ফেলে যেখানে চিকিৎসা কিনতে হয়, সেখানে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' মরীচিকা মনে হতে পারে। কিন্তু সঙ্গের মানচিত্রটায় দেখুন— পৃথিবীর এই মানচিত্রটায় রঙিন দেশগুলোতে সবার জন্য স্বাস্থ্য বাস্তব।

সবচেয়ে প্রথম দেশের সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নেয় ছোট্ট একটি দেশ নরওয়ে, ১৯১২ সালে।

তারপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৭ সালে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' লাগু করে, ১৯৬৯ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চলের মানুষও শহরাঞ্চলের মানুষের সমান সুবিধা পেতে থাকেন।

"একজন রাশিয়ান অসুস্থ হলে সরকার তার জন্য কিছু করে। বাস্তবে সরকার ইতিমধ্যেই করে রেখেছে— সোভিয়েত রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ব্যক্তিমানুষের স্বাস্থ্য সামগ্রিকভাবে সমাজেরই দায়িত্ব। ...বাস্তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর একমাত্র দেশ যা তার চৌহদ্দির মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত পুরুষ, মহিলা ও শিশুর রোগ-প্রতিরোধ ও রোগ-চিকিৎসার জন্য এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গঠন ও পরিচালনা করছে।"— এমনটাই লিখেছিলেন ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রতিনিধি স্যার আর্থার নিউসহোম ও জন অ্যাডামস কিন্সবারি ১৯৩৩ সালে সোভিয়েত চিকিৎসাব্যবস্থা দেখার পর, 'রেড মেডিসিন ঃ সোসালাইজড হেলথ্ ইন সোভিয়েত রাশিয়া' নামক তাঁদের রিপোর্টে।

তারপর সবার জন্য স্বাস্থ্যের পথে যে দেশগুলো চলছে—

১৯৩৮ নিউজিল্যান্ড ও জাপান	১৯৪১ জার্মানি
১৯৪৫ বেলজিয়াম	১৯৪৮ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার নাম— ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিস বা এন. এইচ. এস.।

এন. এইচ. এস-এর তিনটে মূল নীতি হল ঃ

* মেটানো হবে সবার প্রয়োজন
* বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা
* পরিষেবা রোগীর প্রয়োজনমাফিক, খরচ করার ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল নয়।

এন. এইচ. এস.-এর লক্ষ্য হল ঃ

* স্বাস্থ্য পরিষেবার সব কাজের কেন্দ্রে থাকবেন রোগীরা।
* রোগী, স্থানীয় মানুষ ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে ও প্রয়োজনে অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রদান করা হবে।
* একসাথে রোগীর স্বার্থে কাজ করা হবে।
* রোগীকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর প্রতি সহমর্মিতা ও মর্যাদা প্রদান।
* চিকিৎসার উচ্চতম মানের প্রতি দায়বদ্ধতা।
* প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।
* জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

এরপর ১৯৫০-এ কুয়েত ও চীনে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' বাস্তব হয়। ১৯৫০ সালের আগস্টে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্য কংগ্রেসে চারটে মূল নীতি গ্রহণ করে ঃ

১। সমস্ত শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যের জন্য চিকিৎসা-ব্যবস্থা।

২। রোগ-চিকিৎসার চেয়ে রোগ-প্রতিরোধে বেশি গুরুত্বদান।

৩। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীন চীনা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন।

৪। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কাজকর্মকে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা।

চীনের পর 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' চালু হয়—

১৯৫৫ সুইডেন	১৯৫৭ বাহরিন
১৯৫৮ ব্রুনেই	১৯৬০ কিউবা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

১৯৬০ সালে শোষণমুক্ত কিউবার মন্ত্রী চে গুয়েভারা লেখেন— ''স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও সমধর্মী সংস্থাগুলোর আজকের কাজ হল যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মানুষের কাছে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, রোগ-প্রতিরোধ কর্মসূচি শুরু করা, জনসাধারণকে স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে অভ্যস্ত করা''— অন রেভলিউশনারি মেডিসিন।

কিউবা-র সংশোধিত সংবিধানের ৫০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় ঃ

প্রত্যেকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে। এই অধিকারকে নিশ্চিত করতে সরকার গ্রামীণ মেডিক্যাল সার্ভিস নেটওয়ার্ক, পলিক্লিনিক, হাসপাতাল, রোগ-প্রতিরোধ ও বিশেষজ্ঞ রোগ-চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয় ও হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, বিনামূল্যে দাঁতের চিকিৎসা দেয়, স্বাস্থ্য প্রচার ও স্বাস্থ্যশিক্ষা অভিযান চালায়, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করে, রোগের মড়ক ঠেকাতে সাধারণ টীকাকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। এই কর্মকাণ্ডে সমগ্র জনসাধারণ অংশ নেয় এবং সামাজিক সংস্থা ও গণসংগঠনগুলোর মাধ্যমে পরিকল্পনা করে।

কিউবার পর 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' ঃ

১৯৬৬ কানাডা ও নেদারল্যান্ডস	১৯৬৭ অস্ট্রিয়া
১৯৭১ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী	১৯৭২ ফিনল্যান্ড ও স্লোভেনিয়া
১৯৭৩ ডেনমার্ক ও লুক্সেমবার্গ	১৯৭৪ ফ্রান্স
১৯৭৫ অস্ট্রেলিয়া	১৯৭৭ আয়ারল্যান্ড

১৯৭৮-এর ৬-১২ সেপ্টেম্বর কাজাখ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকের রাজধানী আলমা-আটায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ঘোষণা করে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য। সেই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে ভারতও।

আলমা-আটার পর সবার জন্য স্বাস্থ্যের পথে চলা দেশগুলো এরকম ঃ

১৯৭৮ ইতালি	১৯৭৯ পোর্তুগাল
১৯৮০ সাইপ্রাস	১৯৮৩ গ্রিস
১৯৮৬ স্পেন	১৯৮৮ দক্ষিণ কোরিয়া
১৯৯০ আইসল্যান্ড	১৯৯৩ হংকং ও সিঙ্গাপুর
১৯৯৪ সুইজারল্যান্ড	১৯৯৫ ইজরায়েল ও তাইওয়ান
২০০০ শ্রীলঙ্কা	২০০১ থাইল্যান্ড
২০০৪ আয়ারল্যান্ড	২০০৯ পেরু

২০০০ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে আরও ১৫ বছর কেটে গেল, সবার জন্য স্বাস্থ্য এখনও বাস্তবায়িত হয়নি ভারতে।

২০১০-এর অক্টোবরে দেশের যোজনা কমিশন সর্বজনীন স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে এক উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে। ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি-র নেতৃত্বাধীন এই উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল তার সুপারিশ পেশ করে ২০১১ সালে। বিস্তৃত সেই সুপারিশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে তুলে ধরছি—

* স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় জিডিপি-র ১.৪% থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ২০১৭-এর মধ্যে অন্তত জিডিপি-র ২.৫% এবং ২০২২-এর মধ্যে অন্তত ৩% করা হোক।

* ওষুধ কেনায় সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ নিশ্চিত করা হোক।

* সব নাগরিকের জন্য থাকবে ন্যাশনাল হেলথ্ এনটাইটেলমেন্ট কার্ড।

* ন্যাশনাল হেলথ্ প্যাকেজ গড়ে তুলে প্রত্যেক নাগরিককে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও অন্তিম স্তরের অত্যাবশ্যক চিকিৎসা-পরিষেবা দেওয়া হোক।

ইউনিভার্সাল হেলথ্ কাভারেজ (ইউ এইচ বি)-এর জন্য সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা হয় কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর নিজে অথবা এই কাজের জন্য স্থাপিত আধা-সরকারি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থার মাধ্যমে কিনবে।

* স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ইউজার ফি অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের বিরোধিতা করা হয়।

* স্বাস্থ্য বিমার বিরুদ্ধে সুপারিশ করা হয়।

* কিন্তু হতাশ করল দ্বাদশ পরিকল্পনা। জিডিপি-র ২.৫% নয়, স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ কিছুটা বাড়িয়ে করা হল ১.৫৮%। বলা হল কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হবে রাজ্য নিজে স্বাস্থ্যখাতে যা ব্যয় করে তার চেয়ে কিছু বেশি। কেন্দ্র কর বাবদ রাজ্য থেকে যে অর্থ নেয়, ফেরত দেয় তার ১৫-২০%। বেশির ভাগ রাজ্য স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়াতে পারবে না।

* জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন, জননী সুরক্ষা যোজনা, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান, যক্ষ্মা-ম্যালেরিয়া-ডায়েরিয়া প্রতিরোধ, ইত্যাদি সবই চলে কেন্দ্রের অর্থে। রাজ্যে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের অর্ধেক যদি কেন্দ্র দেয়, তবে ব্যয়বরাদ্দ বাড়া তো দূরের কথা, কমে যাবে।

* বলা হল সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিজের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ত্যাগ করে মূলত ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য বিমার ভূমিকা হবে প্রধান।

* উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল-এর সুপারিশ করা হেলথ প্যাকেজ ও প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির বদলে সরকারের পয়সায় বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি করার কথা বলা হল।

লাভজনক তৃতীয় স্তরের পরিষেবাকে তুলে দেওয়া হবে কর্পোরেট হাসপাতালের হাতে। সরকারি অনুদানে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা ও অসরকারি সংস্থাগুলো নতুন চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। যেটুকু সরকারি ববস্থা আছে, সেটুকুও গুটিয়ে ফেলা হবে।

* প্রতি পরিবার নিজের পছন্দমতো বেসরকারি হাসপাতাল বেছে নেবেন, সরকার একটা সীমা অবধি তার মূল্য চুকিয়ে দেবে।

* জাতীয় স্বাস্থ্য প্যাকেজের উল্লেখ অবধি নেই।

* চিকিৎসকের অভাব মেটানোর জন্য প্রাইভেট হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার জন্য সরকার উৎসাহ দিতে মোট খরচের ২০% অবধি অনুদান দেবে। তাদের আয় বাড়ানোর জন্য করছাড় দেওয়া হবে।

* সরকারি অর্থে গড়ে তোলা বেসরকারি হাসপাতালে ইউজার ফি সবই নেওয়া যাবে।

* দ্বাদশ পরিকল্পনায় উল্লেখ নেই— জেনেরিক নামের ওষুধ প্রচলনের, বিনা পয়সায় অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহের, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ইউপিএ-র পর ক্ষমতায় এসেছে মোদীর এনডিএ সরকার। যোজনা কমিশনই তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতায় এসে মোদী সরকার স্বাস্থ্যখাতে বাজেট-বরাদ্দ ২০% কমিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ কমেছে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা।

বর্তমানে জিডিপি-র ১.০৪% সরকার স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে, যদিও নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১৫-র খসড়ায় ২.৫% খরচ করার কথা বলা হয়েছে। খসড়া নীতিতে সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর স্বপক্ষে গালভরা অনেক কথা বলা হলেও আসলে ঝোঁক স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণের দিকেই।

সবার জন্য স্বাস্থ্য ঃ যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে ঃ

সম্প্রতি লিখিত অমর্ত্য সেনের এক প্রবন্ধের শিরোনাম ধার নিলাম— ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার অ্যান এফোরডেবল্ ড্রিম।

সরকার বলে, আমরাও অনেকে ভাবি সরকারের কাছে সবার জন্য স্বাস্থ্য দেওয়ার পয়সা কোথায়।

আসুন দেখি— সারা পৃথিবীতে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেমনভাবে চলে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন অর্থনৈতিক মডেলগুলো এরকম ঃ

* বেভেরিজ মডেল
* বিসমার্ক মডেল
* জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা মডেল
* রোগীর নিজের পকেট থেকে খরচ করার মডেল।

বেভেরিজ মডেল—

ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর পরিকল্পনাকারী ইউলিয়াম বেভারিজের নামে এই মডেল। এই মডেলে কর থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয় ও তার খরচ জোগায়। অধিকাংশ হাসপাতাল ও ক্লিনিক সরকারি। অধিকাংশ ডাক্তার সরকারের কর্মচারী। কিছু প্রাইভেট ডাক্তার থাকতে পারেন, তবে তাঁরা নিজেদের ফি পান সরকার থেকে। এই ব্যবস্থায় মাথাপিছু খরচ কম, কেননা সরকার নিয়ন্ত্রক। এই মডেলে সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর ব্যবস্থা আছে গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অধিকাংশ দেশ, হংকং ও কিউবায়। বেভেরিজ মডেলের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় কিউবায়, যেখানে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি সরকারি।

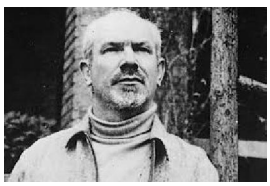

বিসমার্ক মডেল—

এই মডেল অটো ভন বিসমার্কের নামে। স্বাস্থ্য পরিষেবা চলে বিমার মাধ্যমে, বিমা কোম্পানিগুলোকে বলা হয় ''সিকনেস ফাণ্ড''—কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা দু-জনেই টাকা দেন, মাইনে থেকে কেটে। সবাই থাকেন বিমার আওতায়। বিমা কোম্পানি লাভ করে না। সাধারণত ডাক্তার ও হাসপাতাল প্রাইভেট। কড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকায় খরচ নিয়ন্ত্রিত থাকে। এমন মডেল আমরা দেখি জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, জাপান, সুইজারল্যান্ড ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে।

জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা মডেল—

এই মডেলে বেভেরিজ ও বিসমার্ক দুই মডেলেরই উপাদান থাকে। পরিষেবা দেয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অর্থ আসে সরকারি বিমা কর্মসূচি থেকে, যাতে সব নাগরিক পয়সা দেন। মার্কেটিং করতে হয় না বলে, ক্লেম দিতে অস্বীকার করতে হয় না বলে এবং লাভের জন্য নয় বলে খরচ কম। পয়সা সরকার দেয় বলে কম খরচের জন্য দরাদরি করতে পারে। এই মডেলে স্বাস্থ্য পরিষেবা চলে কানাডা, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়।

আর আমাদের দেশে যে মডেল তা হল রোগীর নিজের পকেটের পয়সা খরচ করার মডেল—ফ্যালো কড়ি মাখো তেল।

আওয়াজ তুলুন— ''স্বাস্থ্য কোনো ভিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য আমার অধিকার।''

সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে আন্দোলনের পথে এক বড়ো বাধা আমাদের মানসিকতা। আমাদের অনেকে ভাবেন—

* সমাজতন্ত্রেই বোধহয় সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব হয়েছিল, সমাজতন্ত্রের দুর্গগুলোর পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার জন্য স্বাস্থ্যের ধারণার সলিল সমাধি হয়েছে।

* ধনী দেশগুলোর সরকারের পক্ষে সব নাগরিকের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব, আমাদের মতো গরিব দেশের সরকার সে ব্যবস্থা করবে কেমন করে?

এঁদের মনে করিয়ে দেব—

* সবার জন্য স্বাস্থ্যের পথে প্রথম চলা দেশ নরওয়ে, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের দেশ গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক নয়।

* দেশ ধনী বা গরিব হওয়ার সঙ্গেও সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনো সম্পর্ক নেই। থাইল্যান্ড বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেবে মাঝারি আয়ের দেশ, শ্রীলঙ্কা কম আয়ের দেশ— সেসব দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব হয়েছে।

আসলে বিষয়টা হল সরকারের নীতি ও সদিচ্ছা।

দেশের অনেক খ্যাতনামা জনস্বাস্থ্যবিদ, চিকিৎসক ও অর্থনীতিবিদরা সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর পক্ষে বলেছেন। সরকারি যোজনা-কমিশন-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ দল হিসাব করে দেখিয়েছেন কীভাবে সমস্ত নাগরিকের প্রাথমিক, মধ্যম ও অন্তিম স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা নাগরিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যক্ষ করের আয় থেকেই চালানো যায়।

আমরা বিশ্বাস করি— কেবল গরিবদের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প ধরনের কোনো ৩০ হাজারি বিমা নয়, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে সব নাগরিকের স্বাস্থ্য-রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নেওয়া তার পক্ষে সহজেই সম্ভব।

আসুন, সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর দাবিতে জনমত গড়ে তুলি, বাধ্য করি সরকারকে।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ও জীবনদায়ী ওষুধ

ওষুধ একটি পণ্য—

ওষুধ একটি পণ্য, ওষুধ-কোম্পানি ওষুধ তৈরি করে মুনাফার জন্য। কিন্তু অন্য পণ্যের সঙ্গে এ পণ্যের ফারাক হল ক্রেতা (অর্থাৎ রোগী) পণ্যটাকে পছন্দ করেন না। রোগীর হয়ে পণ্যটাকে পছন্দ করে দেন অন্য কেউ অর্থাৎ ডাক্তার।

ওষুধ একটি রাসায়নিক—

যার ব্যবহার ঃ

* রোগ নিরাময়ে (যেমন ব্যাক্টেরিয়া-সংক্রমণে অ্যান্টিবায়োটিক)
* রোগের কষ্ট কমানোয় (যেমন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসে)
* রোগ-প্রতিরোধে (যেমন টীকাগুলো)
* রোগ-নির্ণয়ে (যেমন এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানে অনেক ক্ষেত্রে রঞ্জকের ব্যবহার)
* স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া পরিবর্তনে (যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধ)

সব ওষুধ কিন্তু দরকারী নয়—

১৯৭৫-এ ভারতের এক সংসদীয় কমিটি বলেছিল ১১৭টি ওষুধ দিয়ে সে সময়ের ভারতের অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ অসুখের চিকিৎসা সম্ভব। ১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম যে অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা বার করে তাতে ছিল ২০৮টি ওষুধ। অথচ সে সময়ে ভারতের ওষুধ বাজারে প্রায় ৬০ হাজার ওষুধ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে ৩৭৪টি ওষুধ। ভারতের জাতীয় তালিকায় ওষুধের সংখ্যা ৩৪৮। অথচ ভারতের বাজারে ওষুধ ফর্মুলেশনের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়েছে।

এত ফর্মুলেশন তাহলে কেন? একই ওষুধ আলাদা আলাদা কোম্পানি বাজার-জাত করে আলাদা আলাদা নামে। তারপর আছে একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া আছে অপ্রয়োজনীয় অনেক ফর্মুলেশন, যেমন— কাফ সিরাপ, হজমী ওষুধ, টনিক...।

প্রচুর ওষুধ, মানুষের জন্য ওষুধ নেই—

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে একটি। ২০০৯-২০১০ সালে ৬২,০৫৫ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়েছে দেশের বাজারে আর ৪২,১৫২ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হয়েছে। উৎপাদিত ওষুধের আয়তনের হিসেবে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়, মোট দামের হিসেবে পৃথিবীতে ১৪ নম্বর। এই ফারাকের কারণ হল আমাদের দেশে ওষুধের দাম অনেক দেশের তুলনায় কম। তাই মোট আয়তন বেশি হলেও মোট দাম কম। এত উৎপাদন সত্ত্বেও অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক ওষুধ কিনতে পারেন না। চিকিৎসার মোট খরচের একটা বড় অংশ (৭০ থেকে ৮০ শতাংশ) জুড়ে থাকে ওষুধের দাম। চিকিৎসার খরচ যোগাতে দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যায় রোগীর পরিবার।

ওষুধের মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে—

স্বাধীনতার ৩২ বছর পর ১৯৭৯-তে প্রথম ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি ভূমিকা দেখা যায়। সব ওষুধগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় চারটে শ্রেণীতে এবং লাভের সীমা স্থির করে দেওয়া হয়।

শ্রেণী	কী ধরনের ওষুধ	লাভের হার
প্রথম	জীবনদায়ী	৪০ শতাংশ
দ্বিতীয়	জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক	৫৫ শতাংশ
তৃতীয়	অন্যান্য	১০০ শতাংশ
চতুর্থ	নতুন ও বাকি সব ওষুধ	লাভের কোন ঊর্ধ্বসীমা নেই।

ভাবা হয়েছিল এই শ্রেণী বিভাগের ফলে জনসাধারণ জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ কম দামে পাবেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ কোম্পানিগুলোর যে কম লাভ হবে তা তারা পুষিয়ে নেবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ওষুধ কোম্পানিগুলো জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরি কমিয়ে দিয়ে তৈরি করতে লাগল টনিক-কাশির সিরাপের মতো অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। যক্ষ্মা-কুষ্ঠের ওষুধের মত দরকারী ওষুধ অমিল হতে থাকল।

৯০-এর দশকের শুরুতে শুরু হল অর্থনীতির উদারীকরণ, শিল্পে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত হল, ওষুধ শিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হল। কোন ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা হবে তা ঠিক করা হতে লাগল বাজারে ওষুধের মোট বিক্রিতে বিভিন্ন কোম্পানিগুলির অংশের ভিত্তিতে। এই জটিল হিসাবটা না বুঝে জেনে নেওয়া যাক একটা তথ্য— বর্তমানে ৭৪টা ওষুধের কাঁচামাল বা বাল্ক ড্রাগ এবং সেগুলো থেকে তৈরি ১৫৭৭টি ফর্মুলেশন মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায়। সম্প্রতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশে এক বিশেষ মন্ত্রীগোষ্ঠী ২০১১-র অত্যাবশ্যক ওষুধের জাতীয় তালিকায় থাকা ৩৪৮টি ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু যে জটিল হিসেবে তাঁরা দাম নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে ওষুধের দাম কমার বদলে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

যোজনা কমিশনের 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'— বিষয়ক উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল কী বলছে—

বিশেষজ্ঞ দল হিসেব করে দেখিয়েছেন স্বাস্থ্যখাতে খরচ জিডিপি-র ০.৫ শতাংশ বাড়ালেই সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো দেওয়া সম্ভব।

তাঁদের মতে নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এমন হওয়া উচিত—

* স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচের অন্তত ১৫ শতাংশ হোক ওষুধের জন্য, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধগুলো সরকারকেই

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কিনতে হবে।

* আয়ুর্বেদ, উনানি, সিদ্ধ, হোমিওপ্যাথির আলাদা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা করতে হবে, রাজ্যস্তরে তা কেন্দ্রীয়ভাবে কিনতে হবে।

* প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি স্ট্যানডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইড লাইনস্ অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন ও ডিসপেন্সিং করতে হবে।

* স্বচ্ছ টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে ওষুধ কিনতে হবে।

* ভাল গুণমানের জেনেরিক ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে।

* প্রত্যেক জেলায় উপযুক্ত গুদাম থাকবে।

* ওষুধ, টীকা ও পরীক্ষার সরঞ্জাম কেনার জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা চাই।

* ওষুধের গুণবত্তা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি নথিভুক্ত করতে হবে।

* দ্রুত দাম মেটানোর ব্যবস্থা চাই।

তাঁদের মতে ওষুধ ও টীকার কারিগরি নাগালে আনতে—

* ওষুধের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

* জাতীয় ও রাজ্যস্তরে ওষুধ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপন করতে হবে।

* ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে ক্ষমতা দিতে হবে।

* ফার্মাসিউটিক্যাল দপ্তরকে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীনে দেওয়া হোক।

জেনেরিক নামে সব ওষুধ তৈরি হোক—

মানুষের নাগালে ওষুধকে আনতে হলে জেনেরিক নাম অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ছাড়া গতি নেই।

* কেবল জেনেরিক নামই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বইপত্রে পড়াশোনায় ব্যবহৃত হয়।

* বাজারে একাধিক ওষুধের মিশ্রণে তৈরি প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায়, যেগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। জেনেরিক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানীগুলো বেশি সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন করতে বাধ্য হবে।

* ওষুধের নাম দেখেই সেটা কোন ধরনের ওষুধ বোঝা সহজ হবে। একই ওষুধের নানান ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই বিভ্রান্তিও হবে না।

* দেখা যায় জেনেরিক নামের ওষুধগুলোর দাম সাধারণভাবে সেই ওষুধেরই ব্র্যাণ্ডগুলোর চেয়ে অনেকটা কম দামী।

* কেবল জেনেরিক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদেরও অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হবে, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হবে না।

* কেবল জেনেরিক নাম চললে ব্র্যান্ডের প্রচার-প্রসার করতে হবে না, খরচ কমবে, ওষুধের দামও কমবে।

ওষুধশিল্পে পুঁজির শোষণ বন্ধ হোক—

হাতি কমিটি ১৯৭৫-এ প্রকাশিত রিপোর্টে সুপারিশ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যেন ওষুধ উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। দেশীয় ওষুধ-কোম্পানিগুলোর বিকাশের জন্য কিছু ওষুধ-উৎপাদন কেবল দেশীয় কোম্পানিগুলোর জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়। ওষুধ-শিল্পে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভূমিকার নিন্দা করে কমিটি, ওষুধ-কোম্পানিগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগের মাত্রা তৎক্ষণাৎ কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা এবং তারপর কমিয়ে ২৬ শতাংশ করার কথা বলা হয়, এমনকি বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলোর জাতীয়করণের পক্ষে ছিল হাতি কমিটি।

তা হয়নি, বরং বিদেশী বিনিয়োগ বাড়তেই থাকে। আসুন আমরা দাবি তুলি হাতি কমিটির সুপারিশগুলো কার্যকর করার।

সবার জন্য বিনামূল্যে ওষুধের লক্ষ্যে আসুন আমরা সংসদীয় হাতি কমিটি ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যের জন্য উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ কার্যকর করার দাবিতে সোচ্চার হই।

সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ও জীবনদায়ী ওষুধ চাই।

[কৃতজ্ঞতা ঃ **শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ**]

কন্যাশ্রীর পর সবুজশ্রী

শিশু ভূমিষ্ঠ হলেই পরিবারের হাতে দত্তক হিসাবে একটি অর্থকরী চারাগাছ তুলে দিয়ে নবজাতকের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চান মুখ্যমন্ত্রী **'সবুজশ্রী'** প্রকল্পের মাধ্যমে, সেই সঙ্গেই মৃতের সৎকারের জন্য অনুদান প্রকল্প **'সমব্যথী'** এবং পাঁচিলসহ সব শ্মশানের পরিকাঠামো বাড়াতে আনলেন **'বৈতরণী'** প্রকল্প। 'সবুজশ্রী' প্রকল্পের উদ্দেশ্য তিনটি ঃ (১) শিশুর জন্ম হলেই সংশ্লিষ্ট পরিবারকে একটি গাছ দত্তক দেওয়া হবে। ফলে হবে সবুজায়ন ও পরিবেশের উন্নতি। (২) সেই গাছ বড় হলে তাকে বিক্রি করে সন্তানের ভবিষ্যত কিছুটা হলেও সুরক্ষিত হবে। ভাবী প্রজন্মের সহায়ক হবে। (৩) বাড়ানো যাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব। গ্রাম বাংলায় এখনও হাসপাতাল বা প্রসূতিসদনে না পাঠিয়ে বাড়িতেই প্রসবের প্রবণতা। ফলে ঝুঁকিও বেশী। প্রচার চালিয়েও সবাইকে সচেতন করা যাচ্ছে না। মেহগণী, সেগুন প্রমুখ অর্থকরী গাছ দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থায় আয়ের নিশ্চয়তা থাকায় প্রসূতিকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে পাঠানোর তাগিদ বাড়বে। কেননা, শিশু জন্মের তথ্য সরকারি নথিতে উঠলে তবেই দত্তক দেওয়া হবে চারাগাছ। প্রসব সংক্রান্ত তথ্যে কোন গোলমাল থাকলে গাছ দেওয়ার সময় তা ধরা পড়বে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাহায্যে শুধরে নেওয়া যাবে এবং মা ও শিশুর যত্ন, চেকআপ, চিকিৎসা, পুষ্টি ও টীকাকরণের ব্যবস্থা করা যাবে।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সুন্দরবন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প

১৩-তম বার্ষিক সাধারণ সভার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

''আমাদের স্বাস্থ্য আমরাই গড়বো''

১৯৮৯ সালে ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার কিছু বন্ধু ও সরবেড়িয়ার উদ্যোগী কিছু যুবকের মিলিত চেষ্টায় তৈরি হয় কৃষিচক্র (যৌথ উদ্যোগ), যার লক্ষ্য ছিল, এলাকার সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এলাকার পরিবারগুলোর আয় বাড়ানো, নতুন নতুন শ্রমদিবস সৃষ্টি ও স্থায়ী কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণ। সেই সময় মহিলাদের উদ্যোগে ১৮ বিঘা জমিতে তরমুজ, উচ্ছে চাষ, ঝাড়াই বাছাই করে মশলা তৈরি, ফাইবারের চেয়ার টেবিল, নৌকা তৈরি ও ভানকি ব্যবসা শুরু হয়। শুরু হয় কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, নাটক, গান, নাচ শেখানো। তাছাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত গোলবুনিয়ায় শৌচাগার তৈরি, মিনি ব্যাঙ্ক গঠন ইত্যাদি কাজকর্মও চলতে থাকে।

শুরু থেকেই এলাকার অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা নিয়ে একটা সমস্যা আমাদের প্রতি মুহূর্তে তাড়িত করতো। তাই কখনও খড়দার বন্ধুদের উদ্যোগে, কখনও নিজেদের উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাম্প করা হত যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। এমনই এক সময় ১৯৯৮ সালে বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ হয়। চিন্তা ভাবনা শুরু হয় পাক্ষিক মেডিকেল ক্যাম্প করার। অবশেষে, ১৯৯৯ সালের ২২শে জুন, রবিবার, শুরু হয় সরবেড়িয়া হাইস্কুলে মেডিকেল ক্যাম্প, যা একদিনও বন্ধ হয়নি। শুরু থেকেই শ্রমিক বন্ধুদের সৃষ্টি 'বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল' আর কৃষকদের তৈরি এই স্বাস্থ্য পরিষেবা একত্রে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর এক বাতাবরণ তৈরি করে।

এই মেডিকেল ক্যাম্প সরবেড়িয়া হাইস্কুলে শুরু হলেও পরে ফকিরতকিয়া সিড অফিসে স্থানান্তরিত করতে হয়। সব শেষে ফিরিয়ে আনা হয় আমাদের কৃষিচক্রের এই কৃষিখামারে। সাথে সাথে এলাকার মানুষদের দাবী বাড়তে থাকে এই ক্যাম্পকে হাসপাতালে রূপ দেওয়ার। অবশেষে ২০০২ সালের ১২ মে পরীক্ষামূলক ভাবে একটা খড়ের ও একটা টালির ঘরে অস্থায়ী হাসপাতাল শুরু হয়। আর ঐ দিনই ঠিক হয় ঐ বছরে ২৯শে ডিসেম্বর আমরা নতুন ঘরে হাসপাতাল স্থানান্তরিত করব।

শুরু হল হাসপাতাল গড়ার কাজ। গ্রামের মানুষরা তাদের স্বেচ্ছাশ্রম দান করলেন। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা অর্থ সাহায্য করলেন। দূরের বন্ধুরা সিমেন্ট, বালি, ইট, টিন কিনে পাঠালেন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এক মহাযজ্ঞের রূপ নিল। লক্ষ্য, ২৯শে ডিসেম্বর ২০০২ নতুন ঘরে হাসপাতাল স্থানান্তরিত করা।

কিন্তু হঠাৎ ২৩শে নভেম্বর ২০০২, শুক্রবার, আমাদের প্রেরণাদাত্রী রেবা সেন মারা গেলেন। সব ওলট পালট হয়ে গেল। তাঁর দেওয়া জমিতে শুরু হয়েছিল কৃষিচক্রের কাজকর্ম, হাসপাতালও তাঁরই দান করা জায়গায়। তাঁর কথা মতো তাঁর দেহ ও চোখ দান করা হল, যা আজও মানুষকে সংস্কার মুক্ত হতে এবং মরণোত্তর চোখ ও দেহ দানের প্রেরণা জোগাচ্ছে। আমরা দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

এই অবস্থা কাটাতে আমাদের ১-২ দিন সময় লাগল। তারপর তাঁর স্বপ্ন যা তিনি প্রতিনিয়ত সকলের কাছে ব্যক্ত করতেন তাকে বাস্তব রূপ দিতে সকলে কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লক্ষ্য, রেবা সেনের দেখা স্বপ্ন ও চিন্তাকে বাস্তব রূপদানের মধ্য দিয়েই তাঁকে মনে রাখা। অবশেষে ২৯শে ডিসেম্বর ২০০২ আমরা নতুন ঘরে হাসপাতাল স্থানান্তরিত করলাম। সার্থক হল আমাদের স্বপ্ন দেখা। ওই দিনই ঠিক হলো প্রতি ইংরাজী বছরের শেষ রবিবার আমরা এখানে একত্রে মিলব। আর হাসপাতালের উন্নয়নের নতুন নতুন দিশা দেখাব। তা আজও অব্যাহত।

কিন্তু কেন এই উদ্যোগ? স্বাস্থ্য তো মানুষের জন্মগত অধিকার। আর এই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া কোন সংস্থা বা কোনো এলাকার মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে উপায় কী? সরকারি গ্রামীণ চিকিৎসা পরিষেবা দায়সারা গোছের। সেখানে মানুষ তার প্রয়োজনীয় পরিষেবা পায় না। অপরদিকে বহুজাতিক সংস্থার বা বেসরকারি সংস্থায় স্বাস্থ্য পরিষেবা আক্রা পণ্য, যা গরীব খেটে খাওয়া ও মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে। তাই একরকম বাধ্য হয়েই মানুষ তেলপড়া, জলপড়া, তাবিজ, কবজ-এর ওপর আস্থা বাড়ায়; যার পরিণাম ভয়াবহ। এমনই এক অবস্থার মধ্যে কম খরচে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে আমাদের এই চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা সরকারি ও বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার টাকায় চলে না। চলে সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষের দানে। যেখানে রোগ নির্ণয় করে ওষুধের নিদান দেওয়া হয়। তাতে সময়, অর্থ ও শরীর বাঁচে। আজ সরকার ব্লকস্তর পর্যন্ত ওই ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। এখনও পর্যন্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য আমরা রক্ত পরীক্ষা (প্যাথলজী ল্যাব), এক্সরে, ইসিজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফীর ব্যবস্থা করতে পেরেছি। ইমারজেন্সি রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সরঞ্জামও সংগ্রহ করা গেছে। বাকি এখনও অনেক। এবার যুক্ত হয়েছে ডা. সৌরভ সান্যালের দেওয়া স্লিট ল্যাম্প এবং হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলের কর্মকর্তাদের দেওয়া ৫০০ এম এ এক্সরে মেশিন, যাতে রোগ নির্ণয় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

এ সবই সম্ভব হয়েছে কিছু হৃদয়বান ও মানবিক ডাক্তার বন্ধু ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায়। তাঁরা বাইরের লক্ষ লক্ষ টাকার

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

হাতছানিকে উপেক্ষা করে এই লড়াই-এর শরিক হয়েছেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। চলতে চলতে অনেক সংগঠন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে আমাদের কাজের গতিও বেড়েছে।

স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আমরা সুন্দরবনের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির বিকাশ ও শিক্ষার প্রসারের জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। যেমন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়া চাষবাস, তার সাথে মাছ চাষ ও পশুপালনকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা স্থায়ী কৃষিব্যবস্থায় অপরিহার্য। এঁরা একে অপরের পরিপূরক। একমাত্র এই মডেলই পারে সুন্দরবনের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে।

এলাকার পিছিয়ে পড়া আদিবাসী অধ্যুষিত পুকুরপাড়া, গোলবুনিয়া, ছোটো আজগারা গ্রামের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ৩ দিন কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা দু-বছর ধরে চলে আসছে। স্থানীয় কিছু শিক্ষক/শিক্ষিকা সন্তোষ কুমার বৈদ্য, বিপ্লব হালদার, সাধনা মণ্ডল, মামুদ মণ্ডল, গফফার মোল্লা ও আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। এবার আমরা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। স্থানীয় এক যুবক আজহারউদ্দিন মোল্লা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া যাদবপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাহায্যে আগারহাটী গৌরহরি, ফুলমনি আদর্শ ও জেলিয়াখালি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের নবম ও দশম শ্রেণীর ৩০জন গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ও খাতা দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ। আমাদের এই ছেলেমেয়েরা কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের সাথেও যুক্ত হয়েছে। এবছর তারা গোলবুনিয়া টুসু মেলায়, সরবেড়িয়া তালতলা, পাড়ায় অলৌকিক নয় লৌকিক অনুষ্ঠান সফলভাবে করে দেখিয়েছে। ওই দুই জায়গায় ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সহযোগিতায় সাপ সম্পর্কে সচেতনতা শিবিরও হয়েছে। তাছাড়া মহাকাশ বিজ্ঞানী পীযূষ দাশগুপ্তের দেওয়া টেলিস্কোপে আমাদের ছেলেমেয়েরা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতে শিখছে। এ বছর আমাদের লোকগাথা পত্রিকার ৩টি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধু প্রতাপ মিত্র গত দুবছর ধরে এই পত্রিকা, তাঁর প্রেস থেকে বিনামূল্যে ছাপিয়ে দিয়ে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে যাচ্ছেন।

আজ সারা পৃথিবী ব্যাপী সংস্কারমুক্ত মানুষদের নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে। মুক্তমনের মানুষ বাংলাদেশে অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান ও নিলয় চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতে নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারে ও এম এম কালবুর্গীকে হত্যা তার অন্যতম নজির। আমরা ধিক্কার জানাই মৌলবাদীদের ওই সব কার্যকলাপের। দাবী জানাই যারা এই হত্যার জন্য দায়ী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

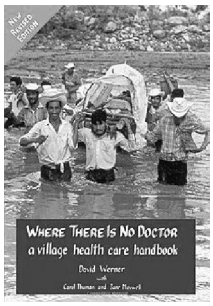

এক নজরে এ বছরের চিকিৎসা পরিষেবা—

রোগী দেখা হয়েছে ঃ

সাধারণ বিভাগে	—	২৩৯৪৬ জন।
স্পেশালিস্ট বিভাগে	—	২৭৯৮ জন।
রোগী ভর্তি রেখে চিকিৎসা হয়েছে	—	৩৯৮ জন।
আল্ট্রাসোনোগ্রাফী হয়েছে	—	৪৫৪ জন।
প্যাথলজী হয়েছে	—	৭৭৯৮ জন।
এক্সরে হয়েছে	—	৮১৪ জন।

শ্যামপদ দাস ও আঙ্গুরবালা দাস মেডিসিন ব্যাঙ্কে জমা ২০০০০০ টাকার সুদ বাবদ পেয়েছি ১৭৫৭৫ টাকা। আর গরীব অসহায় রোগীদের ওষুধ, রক্তপরীক্ষা, এক্সরেতে খরচ হয়েছে ৩৩৭৫২ টাকা। আমাদের ঐ ফাণ্ড বাড়াতে হবে।

যে যে ডাক্তার বন্ধু আমাদের কাছে আছেন— ডা. প্রবীর কুমার দত্ত, ডা. পুণ্যব্রত গুণ, ডা. দেবজিৎ মজুমদার, ডা. সেখ মাসুম, ডা. বিপ্লব সরকার, ডা. অনীক চক্রবর্তী, ডা. জিৎ সরকার, ডা. রাহুল দেব বর্মন, ডা. সোমরাজ মুখার্জী, ডা. কিশলয় ঘোষ, ডা. বিশ্বজিৎ সরকার, ডা. সন্তোষ সোরেন, ডা. দেবার্জুন চ্যাটার্জী, ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, ডা. প্রশান্ত বারিক, ডা. জয়ন্ত দাস, ডা. শর্মিষ্ঠা রায়, ডা. চঞ্চলা সমাজদার, ডা. সুমিত দাস, ডা. প্রদীপ দত্ত, ডা. সুশান্ত গাঙ্গুলী, ডা. দেবাশিস মান্না, ডা. মৃণ্ময় বেরা, ডা. সুজয় মণ্ডল, ডা. প্রদীপ সাহা, ডা. সিদ্ধার্থ হাজরা চৌধুরী, পূর্ণেন্দু বিশ্বাস ও প্রদীপ ব্যানার্জী।

এক নজরে এ বছরের বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ—

২৮.১২.২০১৪	—	মিলন উৎসব। নতুন বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন, প্রায় চার হাজার বন্ধুদের সমাবেশ। উদ্বোধক ঃ দুলাল সরদার ও বিনয় সরদার।
৩১.০১.২০১৫	—	রামপুর ইসলামিক বাইতুল ফাণ্ডের রক্তদান শিবির (৬০ জন রক্তদাতা)
০৬.০২.২০১৫	—	শ্রমজীবি ক্যান্টিন চালু হয়েছে।
১৫.০২.২০১৫	—	যাদবপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাহায্যে নবম ও দশম শ্রেণীর গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও খাতা দেওয়া হয়েছে।
০১.০৪.২০১৫	—	শ্রমজীবী ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করা হয়েছে। ৪৩ জন সদস্য টাকা জমা দিয়েছে।
০৯.০৪.২০১৫	—	শ্রমজীবী বিপণি চালু হয়েছে।
১০.০৫.২০১৫	—	আমাদের রক্তদান শিবির (১৫১ জন রক্তদাতা)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

২৫.০৬.২০১৫ — ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ও সুশান্ত মহাপাত্রের দেওয়া ২-টি কম্পিউটার নিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন।
উদ্বোধক ঃ আনন্দ সরদার।

১৫ ও ১৬.০৮.২০১৫ — নির্মাল্য (টালা পার্কের) বিষমুক্ত হাটে অংশ নেওয়া। আমাদের মশলা, ঘি, মধু, আচার সমাদৃত হয়েছে। কলকাতার ৪-টি বিপণন কেন্দ্র খোলার কথা চলছে।

৩১.০৮.২০১৫ — চক্ষু পরীক্ষার জন্য স্লিট ল্যাম্পের উদ্বোধন।
উদ্বোধক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস।

এবছর আমাদের লোকগাথা পত্রিকার ৩-টি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছে।

আগামী দিনের ভাবনা ঃ

১) গ্রামে গ্রামে সদস্য সংগ্রহ ও হেলথ্ ইউনিট গঠন।

২) নদীমাতৃক সুন্দরবনের অন্ততঃ ৪-টি দ্বীপে হেলথ ইউনিট গঠন। ওই সব দ্বীপ থেকে নির্বাচিত ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ওই সব দ্বীপে মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া। আমাদের ডাক্তারবাবুদের সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে, প্রয়োজন হলে ওইসব রোগীদের এখানে নিয়ে আসবে।

৩) বন্ধ হয়ে যাওয়া অপারেশন থিয়েটারটি পুনরায় শুরু করতে হবে। এই মুহূর্তে তিন জায়গা থেকেপ্রস্তাব এসেছে। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪) অন্ধত্ব দূর করার জন্য এখানে একটা চক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র তৈরী করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সেজন্য তিন চার জন ছেলেমেয়েকে চক্ষু সংগ্রহের প্রশিক্ষণ নিতে পাঠাতে হবে।

৫) ডিসেম্বরের শুরুতে স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করতে চাই।

ডা. চন্দন বারি দুমাস অন্তর ১ দিন আসবেন কথা দিয়েছেন। ডা. অনুপ সাধু এখানে যাতে সবরকম এক্সরে হয় তার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন এবং এক্সরে প্লেট স্ক্যান করে পাঠালে উনি রিপোর্টও করে পাঠাবেন কথা দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই বিশাল কর্মকাণ্ড চালাতে গেলে পর্যাপ্ত সংখ্যক হৃদয়বান ডাক্তার বন্ধু ও স্বাস্থ্যকর্মী দরকার। দরকার দায়িত্বশীল সদস্য/সদস্যা। সকলের কাছে আমাদের আবেদন— আসুন সকলে দায়িত্ব নিয়ে সম্মিলিতভাবে এই কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ি, অন্যদেরও সামিল করার দায়িত্ব নিই; সম্মিলিতভাবে বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানমনস্ক এক সমাজ গড়ার কাজে হাত লাগাই। সফল আমরা হবই।

নবিরুল নাইয়া
সম্পাদক

১লা আগস্ট থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত—

১) জেনারেল বিভাগ — ৮৩১২ জন।
২) স্পেশালিষ্ট বিভাগ — ৯২৬ জন।
৩) ভর্তি রেখে চিকিৎসা — ১৪৬ জন।
৪) রক্ত পরীক্ষা — ২৯৭৩ জন।
৫) এক্সরে — ২৫৮ জন।
৬) ইউ.এস.জি. — ১৩০ জন।

কৃষিচক্র

আপনি যদি সরবেড়িয়া কৃষিচক্র-এর রান্নার মশলা ব্যবহার করেন—

ক) উৎকৃষ্ট, খাঁটি মশলা হওয়ার কারণে রান্নায় অনেক কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়। ভেজাল না থাকায় অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত।

খ) এই মশলা উৎপাদন করেন সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল-এর সদস্য বন্ধুরা। আপনার নিয়মিত ব্যবহারের ফলে হাসপাতালের সর্বক্ষণের স্বেচ্ছাসেবীরা সামান্য আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।

গ) সর্বোপরি, শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের মেল বন্ধনকে আপনি দৃঢ়তর করতে পারেন মশলা ব্যবহারের মাধ্যমে।

সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল-এ নিয়মিত পাবেন—

ঘি, মধু, গুঁড়ো লংকা, গুঁড়ো হলুদ, গুঁড়ো ধনিয়া, গুঁড়ো জিরে, লেবু জোয়ান, আচার, চালকুমড়ো-বিউলি ডালের বড়ি, মশলা, বড়ি প্রভৃতি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

● শ্রমজীবী হাসপাতাল, সরবেড়িয়া,
সন্দেশখালি, উঃ ২৪ পরগনা।
যোগাযোগ ঃ ৮৬৪২৯০২৫৫৩/৯৭৩২৫৮০৫৫৪

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান ঃ

● বেলুড় ও শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল
যোগাযোগ ঃ ৯১৫৩৭৬৫১৬১/৯৭৩২৬৮০৫৫৪

● প্রাকৃতিক, পল্লীশ্রী মোড়, ৬/৯ বিজয়গড়
কলকাতা-৩২, যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৩৮৮৮২৩১

[কৃতজ্ঞতা ঃ **অরুণ সেন**]

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান (পি. এম. এস. এম. এ.)

‘রি

হেলথ্ (ত
প্রসূতি মা
চেকআপে
এবং স্বাস্থ্
জেলা হা
হোমস্, ত
মাসের ন
হয়েছে। এ ... ৃত্যুর কারণ
করা হয়েছে ... হল অন্যতম
অ-সরকারি ... কর্মসূচী যা
এই ... িত অসুখের
স্বাস্থ্যকর্মীর ... ছর জুলাই-
সনাক্ত ক ... উল্লেখযোগ্য
উপযুক্ত ব
১) (... , ফলাফল,
অথবা ‘মি ... তাদের মধ্যে
২) (... দর্শন করে
এ. এন. প ... ও.আর.এস.
৩) ... স.’ বিতরণ
এই
পরীক্ষা-নি ... জিঙ্ক কর্ণার
মৃত্যু প্রতি
... তে শেখানো

নিবি

কন্ট্রোল ... য়ের বুকের

... রামর্শ প্রদান

... য়স পর্য্যন্ত

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বেজওয়াদা উইলসনের আত্মকথা

—শর্মিষ্ঠা রায়

একসময় ভারতের সোনার খনির শহর কর্ণাটকের কোলার (কে জি এফ) ছিল টোকিওর পর সবচাইতে বিজলি বাতি লাগানো শহর। অথচ সেখানে কোন পাকা পায়খানা ও তাতে কোন জলের ব্যবস্থা ছিল না। দলিত ধাঙ্গর পরিবারের নারী পুরুষ ঐ কাঁচা পায়খানাগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম হাত দিয়ে পরিষ্কার করত এবং মলভাণ্ডে মানুষের মল মাথায় করে নিয়ে অন্যত্র ফেলে আসত। কেবলমাত্র কে জি এফের জন্য কর্তৃপক্ষ ৮০০ ধাঙ্গর পরিবারকে নিয়ে আসে। দলিত ধাঙ্গর পরিবারে জন্ম বেজওয়াদা উইলসনের বাবা এই কাজ নিয়ে অন্ধ্র থেকে কোলারে আসেন। বেজওয়াদাও একসময় অল্পবয়সেই এই কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন।

মলবাহকদের দুর্দশা কাছ থেকে দেখে বেজওয়াদা তাদের এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব নেন। তার ১৮ বছর বয়সে তিনি স্থানীয় পুরসভায় এর বিরুদ্ধে পিটিশন দেন। পরে ১৯৮৬ তে তার প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠির প্রেক্ষিতে কেজিএফে ওয়াটার সীলড ল্যাটরিন বসানো হয় এবং মাথায় মলবহন বন্ধ হয়ে মলবাহকরা সাধারণ সাফাই কর্মী ও অন্য কাজে যুক্ত হন। কিন্তু বেজওয়াদা এখানেই থেমে থাকেননি, তিনি ১৯৯৩ তে 'সাফাই কর্মচারী আন্দোলন (এস কে এ)' তৈরি করে প্রচার ও আন্দোলন শুরু করেন যাতে সারাদেশেই এই অমানবিক প্রথা বন্ধ হয়। সরকার ১৯৯৩ তে 'ম্যানুয়াল স্ক্যভেঞ্জিং প্রহিভিশন অ্যাক্ট' তৈরি করেন। ২০১৪ তে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেন কোন সাফাই কর্মী সাফাই কর্ম করতে করতে মারা গেলে তার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সঠিক সংখ্যা পরিমাপ না করা গেলেও মোটামুটি দেশের ৬ লক্ষ মলবাহকের মধ্যে এখনবধি ৩ লক্ষ মলবাহককে মুক্ত করতে পেরেছেন বেজওয়াদা এবং তার 'এস কে এ'। অনেক লড়াই চালিয়ে কর্মক্ষেত্রে মৃত ১০৭৩ জন সাফাই কর্মীর মধ্যে ৩৬ জনের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পেরেছেন। বেজওয়াদা উইলসন ২০১৬-র রমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেলেন। তাকে অভিনন্দন এবং তার এই মহান আন্দোলনের প্রতি আমাদের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন।

বেজওয়াদা উইলসন

● খালি হাতে মানুষের দ্বারা মানুষের মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করা, বওয়া, ফেলা প্রভৃতি (ম্যানুয়ল স্ক্যভেঞ্জিং) থেকে হতদরিদ্র দলিত সাফাইকর্মীদের মুক্তি দিতে কর্ণাটকের দলিত পরিবার থেকে উঠে আসা 'সাফাই কর্মচারী আন্দোলনে'র জাতীয় আহ্বায়ক বেজওয়াদা উইলসন এবং কর্ণাটক ঘরানার মার্গ সঙ্গীতকে সাধারণের কাছে জনপ্রিয় করতে সফল টি. এম. কৃষ্ণাকে ২০১৬ সালের ম্যাগসাইসাই পুরস্কার দেওয়া হল।

● স্বচ্ছ ভারত স্টেটাস রিপোর্ট ২০১৬ থেকে জানতে পারা যাচ্ছে যে ঃ

ক) স্বচ্ছ ভারত মিশনে ২০১৫-'১৬ বর্ষে ৯৭,৭৩,৪৩৭টি গৃহে ৮,২৪০টি স্কুলে এবং ১,৩৩৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পায়খানা নির্মাণ করা হয়েছে।

খ) ১৩.১% ভারতীয় গ্রামে সমষ্টি পায়খানা রয়েছে যা ১১.৪% গ্রামে তা ব্যবহার হয়। ৪২% শহরকেন্দ্রিক ব্লকে সমষ্টি পায়খানা আছে যার ৪০% শহরকেন্দ্রিক ব্লকে ব্যবহৃত হয়।

গ) গ্রামে ৪৫% গৃহে এবং শহরে ৮৯% গৃহে পায়খানা রয়েছে।

ঘ) গ্রামে ৫৫.৪% ও শহরে ৮.৯% মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন।

ঙ) খোলা জায়গায় মলত্যাগের মূল কারণ উপযুক্ত পায়খানার অভাব। আর যেখানে রয়েছে সেখানেও ব্যবহার না করার কারণ মনোভাব (২৩%), খারাপ হয়ে থাকা পায়খানা (২২%), গোপনীয়তার অভাব (২১%), জল ও পরিচ্ছন্নতার অভাব (২০%) এবং অন্যান্য (১৪%)।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

স্বাস্থ্যের অধিকার

— শুভজিৎ ভট্টাচার্য

১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালের ভেতর ভারত, পাকিস্তান (পূর্ব অংশ পরে বাংলাদেশ হয়েছে), এবং শ্রীলঙ্কা সবাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার আশাবাদ স্তিমিত হয়ে আজ নতুন রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সূচক পারস্পরিক তুলনীয় হয়ে উঠেছে। কারণ তাদের অগ্রগতি গত ৬৭ বছরে অভিন্ন থাকেনি।

স্বাস্থ্যে এগিয়ে শ্রীলঙ্কা, কেরালা

দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ সত্ত্বেও, শ্রীলঙ্কা অঞ্চলের সেরা স্বাস্থ্য সূচকের অধিকারী হয়ে উঠেছে যা সমআয়ের অন্যান্য দেশগুলিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু জাতীয় গড় আয় ১০০০ ডলারের নিচে (২০০২ বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাবে ৮৫০ US$) অথচ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তার অসাধারণ সাফল্য চোখে পড়ে। সে দেশে মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তা ৭৪.৩ বছর (আমেরিকাতে সংখ্যাটি ৭৯.৬ বছর) , শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১০০০-এ মাত্র ১৬ এবং প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু প্রতি এক লাখ জীবন্ত-শিশু জন্মের ক্ষেত্রে মাত্র ৩০। স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় জিডিপি-র ৩.৬% হিসাবে এবং জনপ্রতি স্বাস্থ্যের উপর মোট ব্যয়ের গড় বিনিময় হার ১৫% (সূত্র হু রিপোর্ট, ২০০২) যা উন্নত দেশগুলিতে প্রায় ১০% (একমাত্র আমেরিকা বাদে যেখানে ১৪%)। ভারতের কেরালা রাজ্য শ্রীলঙ্কার মতই ভারতীয় জাতীয় গড়ের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। ঐ রাজ্য স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনসূচকের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। কেরালায় এক বছরের নীচে শিশুদের ৮০%-কে সব রুটিন টীকা দেওয়া এবং পরিবার পরিকল্পনাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করে জন সংখ্যাকে একটা স্থির জায়গায় বেঁধে রাখা সম্ভব হয়েছে।

স্বাস্থ্যের অধিকার

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং তার সুরক্ষার বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করার আগে জেনে নিন স্বাস্থ্যের অধিকার বলতে কী বোঝায়।

* সংজ্ঞা

স্বাস্থ্য অধিকার হল সেই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার যাতে স্বাস্থ্যের একটি সর্বজনীন ন্যূনতম মানে সব ব্যক্তিরই অধিকার থাকে। স্বাস্থ্য অধিকারের এই ধারণা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (ডব্লিউ এইচ ও) সংবিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংজ্ঞায়িত হয় ''সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে ভাল থাকা এবং রোগ বা জরার নিছক অনুপস্থিতি নয়''। সংবিধানে স্বাস্থ্য অধিকার সংজ্ঞায়িত হয়েছে, ''স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মান ভোগ করা'' হিসাবে। এই অধিকারের কিছু নীতি হিসাবে উঠে এসেছে শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন, চিকিৎসা জ্ঞান এবং তার সুফলের ন্যায়সঙ্গত প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

* স্বাস্থ্যের সমানাধিকার

১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে এবং ১৯৬৯ সালে কার্যকরী প্রস্তাবে স্বাস্থ্যকে সমস্ত ধরনের বর্ণ, জাতিগত লিঙ্গভেদ এবং ধর্মীয় বিভেদ থেকে দূরে রাখার কথা বলা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবাঅধিকারকে সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে থেকে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

* অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি

১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের এক অধিবেশনে তৈরি হওয়া এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ সমস্ত নাগরিকদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়। এই অধিকারের পূর্ণতাদানের জন্য চুক্তির ১২তম ধারায় যে ধাপগুলিকে অনুসরণ করতে সম্মত হয় তা হল—

— জন্মকালীন শিশুমৃত্যুর হার ও সামগ্রিক শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসকরণ এবং শিশুর সুস্থ বিকাশের উপযোগী ব্যবস্থা করা।

— পরিবেশগত ও শিল্পক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধির সব দিক থেকে উন্নতি।

— অসুখের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা এবং মহামারী, পেশাদারী এবং অন্যান্য রোগের নিয়ন্ত্রণ।

— এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে অসুস্থতার ঘটনায় চিকিৎসা পরিষেবা এবং সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়।

— স্বাস্থ্যের অধিকার বলতে শুধু সুস্থ থাকার অধিকার বুঝলে হবে না। বরং সরকারের উচিত একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার জৈবিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি তৈরি করা এবং সেই সমস্ত পরিকাঠামো নির্মাণ করা যাতে সে সুস্থ থাকতে পারে। রাষ্ট্রের দেখা দরকার স্বাস্থ্যের অধিকার এবং বিধিগুলি সম্পর্কে অসচেতন ব্যক্তিও যাতে সুস্থ থাকতে পারে।

* অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে

আগের চুক্তির ২৪ ধারায় বিস্তারিতভাবে শিশুর স্বাস্থ্যের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। দেশগুলিকে নজর রাখতে হবে যাতে শিশুদের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য স্বাস্থ্য উপভোগ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকে। রাষ্ট্রের দেখা দরকার

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

যাতে দেশের
এই অবস্থাবে
ব্যবস্থাগুলি গ্র
— নবজ
— প্রাথ
শিশুর জন্য ন
ব্যবস্থা নিশ্চি
— প্রাথ
মোকাবিলা ক
প্রযুক্তির প্রয়ে
ব্যবস্থার মাধ্য
— মায়ে
নিশ্চিত করা
— সমা
নিশ্চিত করার
পুষ্টি সম্পর্কে
এবং পরিবে
প্রাথমিক ধার
— পিত
পরিকল্পনা স
* স্বাস্থ্য ন
কাজের
সংযুক্ত হওয়
করে গৃহীত (
স্বাস্থ্যপরিষেব
অভিজ্ঞতা হয়
লাগু করতে
ইচ্ছার বিরুদ্ধে
সম্ভাব্য পরিণে
চিকিৎসা বঞ্চ
ধামাচাপা দে
মানতে অস্বীক

আশার

গ্লোবাল
হেম্যান বলে
বৃদ্ধি পাওয়ার
গৃহীত সংবিধ
কথা বলেছে

চিকিৎসা
া তিন-
একটি
া গৃহীত
সুরক্ষিত

র্বজনীন
জাতীয়
সুইডেনে
৯৫৬),
৪) চালু
) এবং
- থেকে
ভিয়েত
ড়ানোর
১৯৮৪)
৯৭৮),
ণ দক্ষিণ
ইওয়ান
ও একই
া, ফ্রান্স,
ন করে
৯৯৬)-

একটি
পাওয়ার
"এটার
কারের
য়বদ্ধতা
ব্যবস্থা

গ্রগতির

র একটি

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাক্ষরতার হার উভয় লিঙ্গ মিলিয়ে প্রায় ৯০% ছাড়িয়ে যায়। ফলে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়। শ্রীলঙ্কা ও কেরালা উভয় জায়গায়ই লিঙ্গ এবং সামাজিক সাম্যতা অর্জনের নীতি বজায় রাখা হয়েছে। এর ফলে নারীদের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সূচকে অভূতপূর্ব উন্নতি প্রতিফলিত হয়। শ্রীলঙ্কায় কর্মশক্তির অর্ধেকের বেশি নারী।

২. একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সাধারণভাবে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত (যদিও প্রাদেশিক পর্যায়ে কিছু স্বায়ত্তশাসন চালু আছে) একটি ভাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রশাসকেরা ডাক্তার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েও স্বাস্থ্য সেবা সিনিয়র পরিচালকের প্রশাসনিক পোস্টগুলি এমনকী ডিরেক্টর জেনারেল অব হেলথ, মোটের ওপর অরাজনৈতিক।

৩. স্বাস্থ্যনীতি যথাযথভাবেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পক্ষে থেকেছে। সরকারি ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের (টারসিয়ারি) স্বাস্থ্য পরিষেবা সর্বব্যাপী হয়ে ওঠেনি। যেমন সারা শ্রীলঙ্কায় একটিও নবজাতকদের ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট পাবেন না অথচ নবজাতকদের মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবন্ত প্রসবে মাত্র ১৫-র নিচে। এর কারণ শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা যা এমনকি গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত।

৪. গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি দূরবর্তী গ্রামেও উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ বিদ্যমান। এমন কোনও গ্রাম নেই যেখান থেকে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। এগুলির সঙ্গে যোগাযোগের উপযুক্ত রাস্তাও আছে।

৫. পরিবার পরিকল্পনা ও টীকাকরণেও দেশটি যথেষ্ট সফল। এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও (০.৯%) যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত।

স্বাস্থ্য সূচক

আয়ুষ্কাল	৭৩ বছর
শিশু মৃত্যুর হার	১৪.৩৫/১০০০ জীবিত জন্ম
হাসপাতালের শয্যা	৩.৬/১০০০ রোগী
মোট শয্যা	৬৯.৫০১
সরকারি হাসপাতাল	১০৪২
ব্যক্তি-মালিকানার হাসপাতাল	১১৫
চিকিৎসক	২৩০০ রুগী/ডাক্তার
চিকিৎসা সেবিকা	৮২৬ রুগী/নার্স

শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা, যা সামর্থ্যের তুলনায় অনেক ভাল।

সূত্র— ডব্লিউ. এইচ. ও., ২০১১

সবচেয়ে সাশ্রয়ী

বিশ্বে দক্ষিণ আমেরিকার নিকারাগুয়া এবং পানামার মাঝের ছোট্ট দেশ কোস্টারিকাতেও একই রকম অর্থ সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু আছে। তবে সেখানকার মানুষের মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪১০০ মার্কিন ডলার যা শ্রীলঙ্কার তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই শ্রীলঙ্কায় চালু চিকিৎসাব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে সাশ্রয়ী এবং দেশোপযোগী একথা বলা যায়। ফলে বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা সে দেশে ক্রমশ বাড়ছে। ষাটোর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ১০.২% যা আমেরিকাতে ১৬.২% আর কোস্টারিকাতে ৭.৯%।

কেরল এবং শ্রীলঙ্কার শিক্ষা

প্রথমত, সঠিক নেতৃত্ব, জনশিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় অধিক বিনিয়োগ মানুষের উন্নয়নের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করতে পারে। দ্বিতীয়ত, জনগণের অংশগ্রহণের স্বাধীনতায় উন্নতির একটি পটভূমি তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক চেতনা, দুর্নীতিকে পর্যুদস্ত করার ক্ষেত্রে আবশ্যক একটি বিষয়। তৃতীয়ত, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ভারতের স্বাস্থ্যচিত্র

অধিকাংশ মানুষ সম্মত হবেন যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তার আয়, বর্ণ বা লিঙ্গ সঠিক মানের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। চিকিৎসাখাতে দরিদ্রদের বিপুল পরিমাণে ধার বা তার স্বল্প সম্পদ বিক্রি বন্ধ হওয়া উচিত। অথবা তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে— খরচ করার অর্থ জোগাড়ে সামর্থ্য না থাকলে তিনি চিকিৎসা করাবেন না। দুর্ভাগ্যবশত এদেশে বহু মানুষের ভাগ্যেই এটা ঘটে। প্রতিদিনই অনেক পরিবার স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ জোগারের চেষ্টায় দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাচ্ছে। সুস্থ থাকার জন্য ক্রমবর্ধমান খরচের চাপ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির বাজেটেও ঘাটতি তৈরি করছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য খোলা প্রাথমিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলির অনেক দশকের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তার মান এবং ভূমিকা দেশবাসীকে হতাশ করে চলেছে। উচ্চ পর্যায়ের কর্পোরেট হাসপাতালগুলি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। সেগুলি বিনামূল্যে সরকারি জমি এবং অন্যান্য ভর্তুকি পেয়েও তাদের প্রতিশ্রুত গরীবদের জন্য শয্যার ও চিকিৎসার সংরক্ষণের কিয়দংশই রক্ষা করে। বিষয়টিতে সরকারও নীরব দর্শক।

এক মহান বিদ্রুপ

সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশ্বের সমস্ত দেশের সরকারগুলির কাছে একটি প্রধান দায়িত্বের বিষয়। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তির দ্রুত বৃদ্ধি এবং মানুষের আয়ু বৃদ্ধির ফলে বেশি বয়সে যখন স্বাস্থ্যের জন্য বেশি সহায়তার প্রয়োজন হয় তাকে বজায় রাখা এমনকী গ্রেট ব্রিটেনের মত দেশ যাদের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করার ব্যাপারে সুনাম আছে তাদের কাছেও একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। তবে ভারতে প্রযুক্তি এবং সামর্থ্য এখনও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা নয়। এই ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবাহিক কম বিনিয়োগ (জিডিপির মাত্র ১%-এর কিছু বেশি)— স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক মানুষের সামর্থ্যের বাইরে থাকার একটি প্রধান কারণ। এই পরিমাপে সারা বিশ্বে আমাদের অবস্থান নীচের দিকে। মোট চিকিৎসা খরচের প্রায় ৭০% জনগণের পকেট থেকে বের হয়, যার ৭০% খরচ হয় ওষুধ কিনতে। দরিদ্র মানুষেরা আগের থেকেও সরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে কম যেতে চান কারণ সরকার প্রতিশ্রুত বিনামূল্যে ওষুধও তারা ঠিকমত পান না। অথচ ভারত বিশ্বে চতুর্থ জেনেরিক উৎপাদনকারী দেশ এবং তা সাশ্রয়ী মূল্যে রপ্তানির মাধ্যমে সরবরাহ করার জন্য আফ্রিকায় সম্মান অর্জনকারী একটি দেশের কাছে এ এক মহান বিদ্রূপস্বরূপ।

প্রাথমিক স্তরে জোর

দ্বাদশ প্ল্যানিং কমিশনের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য তৈরি করা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ গ্রুপ (এইচএলইজি) দ্বারা চিহ্নিত, একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে জেনেরিক ওষুধ প্রদান করা। এইচএলইজি, ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে তার রিপোর্ট জমা দিয়ে সুপারিশ করেন যে একটি স্মার্ট কার্ড দিয়ে সব নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং এই সেবা সব সময়ে ক্যাশলেস (বিনাব্যয়ে) হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার অঙ্গ হিসাবে প্রাথমিক, গৌণ এবং তৃতীয় পরিষেবার একটি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রতিষেধক, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন প্রদান করা উচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিলে জনস্বাস্থ্য সাশ্রয়ী এবং ফলপ্রসূ হবে।

জনস্বার্থে বাড়তি নজর

এইচএলইজি সুপারিশ করে যে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে জনস্বাস্থ্যে বিনিয়োগ, জিডিপি-র ২.৫%তে পৌঁছানোর প্রয়োজন। সংস্কারের মূল লক্ষই হওয়া উচিত একটি শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। কিন্তু উপেক্ষিত জনস্বাস্থ্যে প্রায়শই অপর্যাপ্ত কর্মী এবং সরঞ্জাম নিয়ে সরকারি সীমিত সুযোগ সুবিধা কীভাবে জনগণের পক্ষে সত্যিকারের ফলপ্রসূ হবে, যেখানে বেশিরভাগ জায়গায় সম্মানের সাথে রোগীদের চিকিৎসাই করা হয় না? জনস্বাস্থ্যকর্মী তৈরিতে আরও বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। তিন বছরের চিকিৎসা শিক্ষাসম্পন্ন চিকিৎসাকর্মী তৈরি করা দরকার যারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সর্বনিম্ন পর্যায়ে যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার হিসাবে কাজ করবে। সেই সাথে নিচুতলায় আরও কর্মী নিয়োগ করা দরকার। একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা সংস্কারের (অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ রিফর্ম) জন্য সরকারি সুবিধার গুণমান এবং কর্মক্ষমতার উন্নয়ন এবং প্রয়োগ আশু প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য নিয়ামক সংস্থা

এইচএলইজি এর জনস্বার্থে বেশি বিনিয়োগের তত্ত্ব ইউরোপ, কানাডা, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো ইত্যাদি সফল দেশের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাস্তব করুণ অবস্থাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এটিকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষেত্রে চিকিৎসা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা (যা সবসময়ে দাবি করা উচ্চমানের না হলেও) প্রায়শই ব্যয়বহুল। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাতে অংশগ্রহণকারীরা অনেক ধরনের সরকারি ছাড়, কর মকুব, জমি এবং অর্থনৈতিক ভর্তুকি পাচ্ছে। কিন্তু তাদের ওপর তদারকির অভাবে তাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার কতটা রক্ষিত হচ্ছে? এইচএলইজি-র একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল জাতীয় ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন স্বাধীন এবং কার্যকরী স্বাস্থ্য নিয়ামক এবং উন্নয়ন সংস্থা গঠন করা যারা সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যসেবার মান তদারকি করবে। দু'টি ক্ষেত্রে আদর্শ চিকিৎসা নির্দেশিকা (স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইড লাইন) যাতে মেনে চলা হয় এবং চিকিৎসার উপযুক্ত মান বজায় রাখা ও খরচ নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রাখা হচ্ছে কিনা তার ওপর সংস্থা নজর রাখবে। নাগরিকদের নালিশ নথিভুক্ত হওয়াকে নিশ্চিত করার জন্য এই মনিটরিং প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি।

অশনি সংকেত

সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পথে যাত্রায় সামনের সারিতে থাকা দেশ যেমন থাইল্যান্ড এবং ব্রাজিলে খুব কার্যকরভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অথচ দ্বাদশ পরিকল্পনা কমিশন, উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশগুলি মানে তো নিই বরং তাকে বিকৃত করে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে এইচএলইজি-র সুপারিশ ছিল স্বাস্থ্যখাতে খরচ হবে জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ। প্ল্যানিং কমিশন অনুমোদন দিয়েছে ১.৫৮ শতাংশ যার রাজ্য সরকারের ভাগ ১.০৪ আর কেন্দ্রের ০.৫৪ শতাংশ। পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব কেবল টীকাকরণ, প্রসূতিদের সেবা এবং জনস্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা। সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে শুধু ম্যানেজারের ভূমিকা নিয়েছে। কর্পোরেট সংস্থাকে হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজ খোলার জন্য ২০ শতাংশ সরকারি অনুদান দেওয়া হবে। কাজেই এই অশুভ প্রয়াস দেশের মানুষের স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকাকে যে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে সজাগ ও সরব হওয়ার সময় এসেছে।

ভারতে স্বাস্থ্যের অধিকার এখনও সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। স্বাস্থ্যখাতে খরচের জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে ভারত বিশ্বের শেষ দশটি দেশের মধ্যে পড়ে। শাসকদলগুলির সদিচ্ছা এবং উচ্চবিত্তদের করুণার ওপর নির্ভর করে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্যোদ্ধার সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং অধিকারবোধই পারে সেই জাগরণ সৃষ্টি করতে যা ক্ষমতাসীন সরকারকে বাধ্য করবে জনস্বাস্থ্যের অধিকার স্বীকৃতি দিতে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার অধীনে সারা দেশকে আনতে।

২০০৯ সাল পর্যন্ত সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বিশ্বের যে ৫৮ দেশে চালু হয়েছে—

এ্যান্ডোরা, অ্যান্টিগুয়া, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, বেলারুস, বেলজিয়াম, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, বতসোয়ানা, ব্রুনেই, দারুসসালাম, বুলগেরিয়া, কানাডা, চিলি, কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, কিউবা, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্টোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, গ্রীস, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইস্রায়েল, ইতালি, জাপান, কুয়েত, লুক্সেমবার্গ, মোল্দাভিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, ওমান, পানামা, পর্তুগাল, রোমানিয়া, সিঙ্গাপুর, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ইউক্রেন, যুক্তরাজ্য, ভেনেজুয়েলা।

[কৃতজ্ঞতা ঃ **সুস্থ জীবনের সন্ধানে**]

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

গ্রামীণ চিকিৎসকদের না নিয়ে সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যাবে না

—পুণ্যব্রত গুণ

১৯৭৭-এ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আলমা আটায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিষেবা নিয়ে এক সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা '২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল অর্থাৎ সকল দেশের সরকার ঐ সময়ের মধ্যে নিজ নিজ দেশের সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেবে। আলমা আটার ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ভারত। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৫ বছর কেটে গেছে, তবু আমাদের দেশে এই লক্ষ্য অধরা।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগে ২০১০-এ ভারতের যোজনা কমিশন সবার জন্য স্বাস্থ্য-পরিষেবা নিয়ে এক উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ করে। পাব্লিক হেলথ ফাউন্ডেশন অব ইণ্ডিয়ার প্রধান ডা. শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বাধীন এই বিশেষজ্ঞ দল ২০১১-এ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে তার সুপারিশ পেশ করে।

উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞ দল যেসব বিষয় নিয়ে বিবেচনা করে, সেগুলো এরকম—

১. মানব সম্পদের প্রয়োজন
২. চিকিৎসা-পরিষেবা নাগালে আনা
৩. ব্যবস্থাপনায় সংস্কার
৪. জনসমুদায়ের অংশগ্রহণ
৫. ওষুধপত্র নাগালে আনা
৬. স্বাস্থ্য-পরিষেবার অর্থের যোগান
৭. সামাজিক যে বিষয়গুলো স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

এই উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ অর্থাৎ সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেন এভাবে— আয়ের স্তর, সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ, জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে দেশের যে-কোন অংশে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের জন্য যথাযথ খরচের, দায়বদ্ধ ও সঠিক, নিশ্চিত গুণমানের স্বাস্থ্য-পরিষেবার (উন্নয়নমূলক, প্রতিরোধমূলক, নিরাময়মূলক ও পুনর্বাসনমূলক) সমান লভ্যতা নিশ্চিত করা, ব্যক্তিদের ও জনসমুদায়গুলোকে স্বাস্থ্যের বৃহত্তর নির্ণায়কগুলোকে নির্ধারণ করে এমন জনস্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া— সরকার এসব স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরিষেবার ব্যবস্থা করবেন এবং নিশ্চিত করবেন, যদিও সরকারই একমাত্র পরিষেবাপ্রদানকারী হবেন— এমনটা নয়।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার যে নির্দেশক নীতিগুলো উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল স্থির করেন, সেগুলো এরকম—

* পরিষেবা সবার জন্য,
* পরিষেবা সবার জন্য সমান,
* কাউকে বাদ দেওয়া হবে না আর কারুর প্রতি বৈষম্য করা হবে না,
* পরিষেবা হবে যুক্তিসঙ্গত ও ভালো গুণমানের,
* আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে,
* রোগীর অধিকারগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া হবে,
* সরকারী স্বাস্থ্য-পরিষেবা মজবুত করা হবে,
* পষিবায় দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা থাকবে,
* নীতি-নির্ধারণ ও পরিচালনায় জনসমুদায়ের অংশগ্রহণ থাকবে।

তাঁরা সরকারী পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলেন কেন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কার জরুরী—

* যাঁদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁদের ৪০ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে চিকিৎসা করাতে ধার নিতে হয় বা সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়।
* গ্রামীণ এলাকায় ১৮ শতাংশ ও শহর এলাকায় ১০ শতাংশ অসুখের কোনও চিকিৎসা হয় না।
* গ্রামীণ এলাকার ১২ শতাংশ ও শহরের ১ শতাংশ বাসিন্দা চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছতেই পারেন না।
* ২৮ শতাংশ গ্রামবাসী ও ২০ শতাংশ শহরবাসীর চিকিৎসা করানোর পয়সাই নেই।
* হাসপাতালে ভর্তি মানুষদের ৩৫ শতাংশেরও বেশি হাসপাতালের খরচের ভারে দারিদ্রসীমার নীচে চলে যান।
* জনসংখ্যার ২.২ শতাংশ-এর বেশি হাসপাতালের খরচের ভারে গরীব হয়ে যান।
* নাগরিকদের অধিকাংশ যাঁরা স্বাস্থ্য-পরিষেবার সুযোগ নিতে পারেন না তাঁরা কম আয়ের মানুষ।

গ্রাম-শহরের বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা দেখান—

৮০ শতাংশ ডাক্তার, ৭৫ শতাংশ ডিস্পেন্সারী, ৬০ শতাংশ হাসপাতাল আছে শহরে। পাশ করা ডাক্তারের ঘনত্ব যেখানে শহরে ১০০০০ মানুষ-পিছু ১১.৩ জন, সেখানে গ্রামে ১০০০০ জনে ১.৯।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

বিশেষজ্ঞ-দল সমস্ত নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য-পরিষেবার প্যাকেজ-এর কথা বলেন, যাতে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর চিকিৎসা-পরিষেবা থাকবে, সরকার যার খরচ জোগাবে। তাঁরা বলেন— এক বিশেষজ্ঞ দল মাঝে মাঝে প্যাকেজের উপাদানগুলো ঠিক করবেন, রাজ্যভেদে প্যাকেজের উপাদানে পার্থক্য থাকতে পারে।

চিকিৎসার খরচ ও আর্থিক সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দলের বক্তব্য ছিল—

* কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো মিলে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বর্তমানের জিডিপির ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে অন্তত ২.৫ শতাংশ এবং ২০২২-এর মধ্যে অন্তত ৩ শতাংশ করা উচিত।

* ওষুধ কেনায় সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

* চিকিৎসা-পরিষেবায় অর্থের মূল উৎস হবে সাধারণ কর, সঙ্গে যাঁরা মাইনে পান বা আয়কর দেন তাঁদের মাইনে বা করযোগ্য আয়ের অনুপাত হিসেবে অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক অর্থ।

স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য মানব সম্পদ সম্পর্কে উচ্চস্তরীয় দলের সুপারিশ—

* পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী নিশ্চিত করা হোক, গুরুত্ব পাক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা।

* গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকায় 'এ. এস. এইচ. এ.'-এর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হোক, জনসংখ্যার ১০০০ পিছু ১ থেকে বাড়িয়ে ১০০০ পিছু ২।

* মাঝারি স্তরের স্বাস্থ্য কর্মী চালু করা হোক— গ্রামীণ উপকেন্দ্রগুলোতে ব্যাচেলর অফ রুরাল হেলথ কেয়ার (বি.আর.এইচ.সি.) প্র্যাকটিশনার ও শহরের উপকেন্দ্রগুলোতে নার্স প্র্যাকটিশনার।

আমরা যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা দেখি তাহলে দেখব প্রতি ১০০০০ মানুষ পিছু ২৫ জন চিকিৎসাকর্মীর সুপারিশ করা হয়েছে— অর্থাৎ ডাক্তার, নার্স, দাই ইত্যাদি কতজন কি তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। আমাদের দেশে এই সংখ্যা ১০০০০ জনে ১৯ জন (প্রশিক্ষিত ও অপ্রশিক্ষিত মিলিয়ে)। পাশ-করা ডাক্তারের সংখ্যা যদি দেখি তা হয়— ১০০০০ জনে ৬ জন। গ্রামে যেখানে ১০০০০ জনে পাশ করা ডাক্তারের সংখ্যা ৩.৯ জন, সেখানে শহরাঞ্চলে ১৩.৩ জন অর্থাৎ প্রায় চারগুণ বেশি। দেশের প্রায় ৫ লক্ষ মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটের তিন-চতুর্থাংশ শহর বা শহরের আশেপাশে কাজ করেন, যেখানে দেশের এক-তৃতীয়াংশেরও কম মানুষের বাস। আর গ্রামীণ জনতার সামান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাটুকুও নেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে এক সমীক্ষায় দেখা যায়— মাত্র ৬ শতাংশ রোগীর চিকিৎসা করেন এম বি বি এস ডাক্তার, ২৮ শতাংশ-এর 'আয়ুশ' ডাক্তার আর ৬৬ শতাংশ-এর চিকিৎসা হয় অপ্রশিক্ষিত গ্রামীণ চিকিৎসকদের হাতে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা ব্লকের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়— সেখানকার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ, সরকারি ডাক্তারের সংখ্যা ১০ জনেরও কম, অথচ গ্রামীণ ডাক্তার প্রায় ৪০০ জন। একজন অসুস্থ শিশুকে সরকারি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয় অধিকাংশ সময় নদীপথে, সময় লাগে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা। ফলে ৮৫ শতাংশ অসুস্থ শিশুকেই চিকিৎসা পেতে হয় গ্রামীণ ডাক্তারের কাছে।

২০০৯-এ পশ্চিমবঙ্গের তিনটে জেলায় সমীক্ষা করে দেখা যায় ৫৪ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ গ্রামীণ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসিত হন। খুব সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা এণ্ড এন্টেরিক ডিজিজেজ (নাইসেড)-এর এক সমীক্ষক-দল দেখেন মালদা জেলার গ্রামবাসীদের অর্ধেকের বেশি সাধারণ রোগের জন্য গ্রামীণ ডাক্তারদেরই সাহায্য নেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিসংখ্যানটা মোটামুটি এরকম— পাশকরা ডাক্তার আছেন প্রায় ৪৩ হাজার। সবার কাছে স্বাস্থ্য-পরিষেবা পাশকরা ডাক্তারের মাধ্যমে পৌঁছাতে হলে দরকার আরও ৬৫ হাজার ডাক্তার, বর্তমান হারে ডাক্তার তৈরি হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ২০৫৫ সাল অবধি।

আর সমস্ত স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য পাশ করা ডাক্তার কিন্তু জরুরীও নয়। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এন. আর. এইচ. এম.)-এর টাস্ক ফোর্স ২০০৭-এর রিপোর্টে বলে— মারক রোগগুলোকে প্রতিহত করার জন্য উঁচু মানের ডাক্তারী দক্ষতা বা দামী রোগ-নির্ণয় প্রযুক্তির দরকার হয় না। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়েই এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায়। আসল সমস্যা হল মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা না পৌঁছানো।

এম বি বি এস-এর চেয়ে কম সময় যাঁরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তাঁদের ডাক্তারী দক্ষতা নিয়ে এক পর্যবেক্ষণের কথা বলি। পাব্লিক হেলথ ফাউণ্ডেশন অফ ইণ্ডিয়ার কৃষ্ণ ডি রাও এই সমীক্ষাটা করেন ছত্তিশগড়ের এক এলাকায়। ছত্তিশগড় ও আসাম হল দেশের দুটো রাজ্য যেখানে কম সময়ের ডাক্তার তৈরির কোর্স চালু করা হয়। অবশ্য ডাক্তার বলা হয় না, ছত্তিশগড়ে বলা হয় রুরাল মেডিকাল এসিস্টেন্ট বা আর এম এ। দেখা যায় প্রাথমিক পরিষেবায় যে রোগ বা সমস্যাগুলো দেখা যায় সেগুলো সামলাতে এম বি বি এস ডাক্তার ও আর এম এ-রা সমান দক্ষ। কম দক্ষ আয়ুশ চিকিৎসকরা। প্যারামেডিকাল কর্মীরা সবচেয়ে কম দক্ষ।

বর্তমান সময় থেকে অনেক বছর পিছিয়ে যাই, নজর রাখি প্রতিবেশী দেশ চীনে। চীনে পাশ্চাত্য মেডিসিনের প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৮১ সালে। ১৯৪৯-এ শোষণমুক্তির আগে সে দেশে মেডিক্যাল কলেজ ছিল মাত্র একটা, ১৯১৬-এ স্থাপিত পিকিং ইউনিয়ন মেডিক্যাল কলেজ। সেই কলেজ থেকে ১৯২৪ থেকে ১৯৪২ অবধি পাশ করে বেরোনো মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, তাঁরাও মূলত বিদেশী শাসক-শোষকদের সেবায় লাগতেন। ১৯৪৯-এর পর কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের সরকার সমস্ত নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্ভব করেছিল, তা সম্ভব হয়েছিল আধুনিক ডাক্তারদের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণহীন গ্রামীণ-চিকিৎসকদের যুক্ত করে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ চিকিৎসকদের যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত করার কাজ করে 'সোসাইটি ফর সোশ্যাল ফার্মাকোলজি' 'রুরাল

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স এসোশিয়েশনের' সঙ্গে। কাজ করে বাঁকুড়ার আমাদের হাসপাতাল, বীরভূম লিভার ফাউণ্ডেশন।

প্রশিক্ষিত গ্রামীণ চিকিৎসকদের ওপর এক সমীক্ষা চালান ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-র অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা যায়— তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির মানোন্নয়ন হয়েছে, ভুল ওষুধের ব্যবহার কমেছে, রোগীদের ক্ষতি কম হচ্ছে, রোগীরাও তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করছেন।

জয়পুরের ইন্সটিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ-এর বরুণ কাঞ্জিলাল গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন বহুদিন। তাঁর সুপারিশ হল— সমস্ত গ্রামীণ ডাক্তারদের নথিভুক্ত করা হোক। তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক যাতে তাঁরা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারেন এবং নিজের সীমা কতোটা তা বোঝেন। তাঁদের সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হোক, যাতে তাঁরা সরকারি ডাক্তারদের নজরদারীতে কাজ করতে পারেন।

আমরাও মনে করি—গ্রামীণ চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যে দিয়েই চিকিৎসা-কর্মীর অভাব পূরণ হতে পারে, কিছুটা বাস্তবায়িত হতে পারে সবার জন্য স্বাস্থ্যের স্বপ্ন।

তাছাড়া গ্রামীণ তরুণ-তরুণীদের যথাযথ স্বল্পকালীন ট্রেনিং দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে তৈরী করেও প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ অনেকটা করানো যায়। এই বিষয়ে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রায় দেড় দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতালও প্রত্যন্ত দ্বীপের তরুণ-তরুণীদের ট্রেনিং দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী রূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে।

[কৃতজ্ঞতা ঃ **'লোক গাথা'**]

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটি মানবাধিকার নিবন্ধ
উনিশটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত

—ক্লডিও স্কুফটান্, পিপলস্ হেলথ মুভমেন্ট

১) মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়ন খুবই যুক্তিগ্রাহ্য এবং বর্তমান গতানুগতিক দৃষ্টিকোণের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য। মানবাধিকার এবং স্বাস্থ্যের অধিকার সেই সব মানুষের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য যারা প্রান্তিক মানুষ, অসহায় এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনধারণ করে।

২) বৃহত্তর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা মূলত সেই সব দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় (এবং বর্তমানে যারা অর্থের বিনিময় পরিষেবা ব্যবস্থার শিকার) ঘোরতর ভাবে মানবাধিকারের পরিপন্থী। এটি অবশ্য অন্যভাবে বলতে গেলে সেই সব পরিষেবাকাঙ্ক্ষী মানুষেরই ব্যর্থতা যে তারা তাদের দাবি জোরালো কণ্ঠে বলিষ্ঠভাবে দাবি করতে পারছে না। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নিষ্কর্মা সংস্থাগুলি এবং তাদের আধিকারিকদের থেকে পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা আদায় করে নিতে পারবে এবং মানবাধিকার লঙঘনকে আটকানো যাবে।

৩) আমরা অবশ্য পরিস্থিতির চুলচেরা বিচার করে বিস্তারিত ভাবে সমস্তরকম অপূর্ণ চাহিদা এবং অধিকারের তালিকা বানাতে খুবই পটু। কিন্তু এ তো হল শুধুমাত্র রোগনির্ণয়, মানবাধিকারের যে অজস্র চ্যুতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তার ফর্দ মাত্র।

৪) যদি সত্যিই এইসব মানবাধিকার লঙঘন রোধের ব্যাপারে কিছু করতে হয়, তাহলে বিশ্লেষণ করা দরকার, কার কার ওপর কি কি দায়িত্ব ছিল যাতে একে রোধ করা যায়। নিজের দায়িত্বের বিশ্লেষণ এবং দায়িত্ববোধের বিশ্লেষণ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হলে পরিষেবাভোগীরাও বুঝতে পারবে যে আধিকারিকরা তাদের বাধ্যবাধকতার থেকে সরে এসেছে বা আধিকারিকরাও তাদের আচরণকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫) এই সব দায়িত্ববোধের বিশ্লেষণ করার পর আমাদের সংগঠিত ভাবে, অতিরিক্ত তৎপরতার সঙ্গে সমাজকে চালিত করতে হবে যাতে পরিষেবা প্রাপকরা সঠিকভাবে জানতে পারে কার কাছে প্রস্তাব নিয়ে যেতে হবে, বা কার মুখোমুখি হয়ে কি কি দাবি জানাতে হবে।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

৬) সমস্ত রকম অপূর্ণ প্রয়োজন বা দাবি, কিছু কিছু ক্ষতি ডেকে আনে। যেমন মৌলিক অধিকারের চরিতার্থতাকে সবসময় নীতিবিশারদরা দায়বদ্ধতা রূপে দেখে না। তাদের ন্যূনতম দায় কিন্তু যথেষ্ট নয় বিগত চল্লিশ বছরের উত্তর গোলার্ধ শাসিত উন্নয়নের ফলস্বরূপ যে অগাধ অপূর্ণতা তৈরি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য।

৭) একদিকে অপূর্ণ চাহিদা এবং দাবি এবং সেই সূত্রে মানবাধিকার লঙঘন, অন্য দিকে আন্তর্জাতিক আইন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আইনি অনুশাসন। বেশিরভাগ দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংরক্ষণে চুক্তিবদ্ধ এবং এটাই সবথেকে প্রয়োজনীয় কথা। আমরা দাবি জানাচ্ছি তারা কি চুক্তি সই করেছে তার শর্তাবলী আইন মোতাবেক প্রকাশ করা হোক এবং এই বিষয়টি এখন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও অনুমোদন করেছে।

৮) বিগত দিনে একশোটির উপর দেশের সংবিধান স্বাস্থ্যের অধিকারকে সম্মানজনক স্বীকৃতি জানিয়েছে। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ন্যায়শালায় এই সংক্রান্ত তদন্তে ন্যায়ের পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সংক্রান্ত সংস্থা গড়ে উঠছে যা আমাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী এবং মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে যাতে মানবাধিকারের লক্ষ্যে সাফল্য অর্জন করা যায়। অতএব, এখন চ্যালেঞ্জ হল স্বাস্থ্যের অধিকার এর দায় স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারক সংস্থা এবং কর্মপদ্ধতির ওপর দায়িত্ব দেওয়া, এটি মনে রাখার দরকার যে অতিসক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্যের নীতিনির্ধারণ প্রভাবিত করার সঙ্গে আদালতে মানবাধিকার সংক্রান্ত তদন্তের মামলার জেতা-হারা নির্ভর করে না; এই নীতি-নির্ধারণকে প্রভাবিত করার দিকটি হাল্কাভাবে নিলে হবে না। এর মাধ্যমে সমাজকে সঠিক ও জোরালোভাবে চালিত করতে হয়। এ কোনো শক্তিহীন প্রান্তিকদের কথা শোনা নয়, বরং তাদেরকে শক্তি যোগাতে হবে যাতে তারা গঠনমূলক পরিবর্তন না ঘটার কারণগুলির দিকে আঙুল তুলতে পারে। তাই আদালত সংক্রান্ত এবং নীতি-সংক্রান্ত দিকগুলিকে একসঙ্গে আমাদের আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে যাতে একে অপরের পরিপূরক হয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং এই দুটি দিককে আমাদের উন্নীত করতে হবে। যা বাকি রইল তা হল এই আচরণগুলোকে বাস্তবায়িত করা যা সমাজে স্বাস্থ্যের অধিকারকে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে। তা করার জন্য দারিদ্র, ভেদাভেদ, এবং কুসংস্কার, নির্দিষ্ট ভাবে লিঙ্গ বৈষম্য, জাতপাত, গর্ভবতী মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রমণ, এইড্স এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকগুলিকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে হবে।

৯) এই সমস্তই স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং সমাজে আমরা যে পরিবর্তনগুলি দেখতে চাই তাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এক সদর্থক পদক্ষেপ।

১০) এখানে এটা ব্যাখ্যা করা দরকার যে এস.ডি.জি (সাসটেনবল ডেভেলপমেন্ট গোল)-এ পৌঁছলেও আমাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ এর উপরও গুরুত্ব দিতে হবে কারণ এটাই এস.ডি.জি-র সবগুলি সূচকের অন্তর্নিহিত মূল কারণ। এ ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের অধিকারের আতস কাচের নীচে ফেলে আমাদের লক্ষ্যগুলিকে বিচার করলে স্বাস্থ্যের সূচকগুলির উন্নতি হলেও এটি আংশিক জয়। অনেকেই আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যের অধিকারকে ভিত্তি করে দারিদ্র দূরীকরণের। অপর দিক থেকে দেখলে দারিদ্র্য দূরীকরণ করে কিভাবে স্বাস্থ্যের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আমরা শুধু দরিদ্রদের স্বাস্থ্যনীতি চাই না। আমরা চাই স্বাস্থ্য বনাম দারিদ্র দূরীকরণ নীতি। শুধুমাত্র দারিদ্র্য কমানো নয়, বৈষম্য কমানোও আমাদের মূল বিষয়।

১১) এই স্বাস্থ্যের অধিকার কর্মসূচী থেকেই আমরা সাম্যের কথা, সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করার প্রয়োজন এবং অন্যান্য সামাজিক কাজ এর দিকে অগ্রসর হব যাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য তারা পায়, যাতে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

১২) (ক) এরপর আমরা ঐ অকর্মণ্য সংস্থাগুলি ও আধিকারিকদের সরাসরি দায়ী করতে পারব আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের কারণে।

এর একটি কৌশলগত সুবিধা আছে। এবার আমরা গঠনগত পরিবর্তন দাবি করতে পারব আন্তর্জাতিক আইনের ছায়ায়। আমাদের এখনকার চ্যালেঞ্জ হল পরিষেবাকামী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে এক নতুন দিশায় এবং অনেক বেশি শক্তির সঙ্গে আন্দোলনকে সংগঠিত করা।

(খ) প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে কি করে মানবাধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজকে শক্তিশালী করা যায়।

১৩) আরো নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ যা আমাদের মুখোমুখি হতে হয় তা হল সবার জন্য স্বাস্থ্যের পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যের অধিকারের দিকটি অন্তর্ভুক্ত করা। এই বিষয়টিকে সরলভাবে জনপ্রিয় করা হল প্রথম ধাপ। প্রাথমিক ভাবে আমাদের এটা করতে হবে আমাদের দ্বিস্তরীয় এবং বহুস্তরীয় এন.জি.ও.র কৌশলগত সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে। এদের মধ্যে অনেকেই এ কাজ শুরু করে দিয়েছে। ইউনিসেফ অন্যান্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থাগুলির মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তারা উন্নয়নের পরিকল্পনায় মানবাধিকারের দিকটি প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু বর্তমানে সে প্রচেষ্টা শিথিল হয়ে পড়েছে। অপর সংস্থা 'কেয়ার'ও প্রামাণ্য পদক্ষেপ নিয়েছিল তাদের ক্রিয়াকলাপে মানবাধিকার রক্ষার দিকটি অন্তর্গত করার জন্য কিন্তু ইদানীং খুব বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না।

কারণ বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক, সরকারি বা বে-সরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংস্করণ বা পরিমার্জন করেনি।

১৪) দ্বিতীয় ধাপে, ঐ সমস্ত জোটবদ্ধ সঙ্গীরা নতুন ধারণাগুলি তাদের সহকর্মী এবং সমকক্ষদের কাছে তুলে ধরবে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে তাদের কর্মস্থলে গিয়ে এবং জননেতাদের কাছে তাদের কার্যক্ষেত্রে গিয়ে বর্ণণা করতে হবে।

১৫) সামর্থ্যের বিশ্লেষণ করে কর্মীদের যা কাজ করার কথা এবং যা করছে তা চিহ্নিত এবং সনাক্ত করা এখন থেকে আমাদের প্রধান কাজ হবে।

১৬) ওপরের দুটি ধাপেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে সেখানে

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

মানবাধিকারের কোন প্রাধান্য নেই; কোন অধিকারের প্রতিযোগিতা নেই। সমস্ত অধিকার সর্বজনীন এবং সর্বব্যাপী, তাই আমাদের সর্বস্তরে কাজ করতে হয়। সেই জন্যই সবার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার লড়াইয়ে দারিদ্র দূরীকরণের জোরালো দাবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৭) নব উদারতাবাদী (নিওলিবারেল) উন্নয়নের দৃষ্টান্ত সামাজিক বাস্তবতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায় যাতে আংশিক ছোট ছোট জয়কেই সাফল্য বলে ধরে নেওয়া হয় আর যার কোনো স্থিতিশীলতা নেই। যে নীতিতে দারিদ্রের সমস্ত লক্ষণ ও চিহ্নগুলি ফুটে ওঠে তা যদি মেরামত করা না যায়, তাহলে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ছোট ছোট জয়গুলো আমাদের কেবলমাত্র প্রতারিত করবে।

উদাহরণ স্বরূপ, বাণিজ্যের যে ক্ষেত্রকে বিশ্বায়ন বড় করে তোলে তাতে গরীবদের কোনো সুবিধা হয় না যদি না আমরা বিশেষভাবে ন্যায্য বাণিজ্য নীতি তৈরি করি এবং নিম্নতম আয়ের স্তরে তার সুবিধাগুলিকে ছড়িয়ে দিতে পারি।

আরেকটি উদাহরণ হল স্বাস্থ্যক্ষেত্র থেকে আমরা দেখেছি বিপুল প্রচেষ্টা এবং সংস্থান ঢেলে দেওয়া হয়েছে টীকাকরণের কর্মসূচীগুলিতে। কে তাদের দোষ দেবে যতক্ষণ তারা জীবন বাঁচাচ্ছে? কিন্তু কতদিন? তাকে ছ'টার মধ্যে একটা টীকাপ্রদানকারী রোগের থেকে বাঁচানো গেলেও, সে যদি অপুষ্ট হয় এবং একটি অপরিষ্কার, নিম্নমানের স্থানে বসবাস করে এবং নিউমোনিয়া বা ডায়ারিয়ার শিকার হয়? তার তো টীকাও নেই আজ পর্যন্তও— কাকে আমরা বোকা বানাচ্ছি?

১৮) যে বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে তা হল আমরা কোন শক্তিকেই স্বাস্থ্যে মানবাধিকার রক্ষার দিকটিকে অপসৃত করতে দেব না। এই ধারণার আংশিক ব্যাখ্যা অত্যন্ত অসৎ প্রচেষ্টা। এই ধারণায় অনেক সমভাবে সংস্থান বা সম্পদের বণ্টন হয় সমাজে এবং স্বাস্থ্য একটি ক্ষেত্র, আরো অনেক ক্ষেত্রের মত, যার মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। মানুষ স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়েই জন্মায় এবং সমাজকে তার অবদান যুক্ত করতে হবে যাতে অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকে রোধ করা যায় এবং দারিদ্র্যঘটিত অসুখকে সারিয়ে তোলা যায়। এর থেকে কিছু কম করলেও কাজটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। উপরন্তু এই পরিস্থিতিতে পরিষেবাকামী মানুষের সংগঠিত শক্তি সহযোগেই আমাদের উপনীত হতে হবে যেখানে তারাই এই পরিবর্তনকে ক্রমান্বয়ে দাবি করবে। এটি একটি জন সচেতনতা এবং সংহতি কর্মসূচী।

১৯) আমরা বলছি না যে এ সব খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি হবে অথবা ছোট ছোট জয়ের দ্বারা আমরা আমাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। কিন্তু আমাদের বৃহত্তর ক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করতে হবে। লক্ষ্যচ্যুত হলে চলবে না।

[অনুবাদ ঃ রূপা বাগচী]

খসড়া সারসংকলন ঃ টিবি সার্কল ইণ্ডিয়া ষ্টাডি রিপোর্ট

ঝাড়খণ্ডের নিম্ন-আয়-শ্রেণীর মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রভাব

(রোগ নির্ণয়ের সূচক এবং চিকিৎসার সুবিধার মান এবং চিকিৎসা না চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ এবং পরিবারগুলিতে এর অর্থনৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা)

ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক যক্ষ্মারোগী নথিভুক্ত হয়েছে। ২০১৪ সালে পৃথিবীর ৯.৬ লক্ষ যক্ষ্মারোগীর মধ্যে ২৩ শতাংশ ভারতে নথিভুক্ত হয়। আমাদের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (আর.এন.টি.সি.পি.) পুরো দেশে উন্নতমানের যক্ষ্মা নির্ণয় এবং চিকিৎসার কর্মসূচী চালায়। তা সত্ত্বেও, কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকা, বিশেষতঃ প্রত্যন্ত গ্রামীণ কিছু এলাকায় পরিস্থিতি উদ্বেগের এবং আরো মনোযোগের প্রয়োজন। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং উড়িষ্যার প্রান্তিক এবং উপজাতি অধ্যুষিত অনুন্নত জায়গাগুলিতে এইরকম বেশ কিছু এলাকা লক্ষ্য করা যায়।

ঝাড়খণ্ডের আর.এন.টি.সি.পি., ২০১৪'র রিপোর্ট অনুযায়ী, টিবি রোগের জীবাণু আদিবাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় বেশি পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ— পাকুর, পশ্চিম সিংভূম, দুমকা, জামতারা জেলায় রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯২.২, ৮৯.৪, ৭৮.৬, ৭১.৯ (প্রতি ১০০,০০০ জনের মধ্যে), যেখানে জেলার গড় ৬৪ এবং ধানবাদ, কোডারমা'র মত মিশ্র উন্নত এলাকায় এই গড় যথাক্রমে ৪৭.৭ এবং ৩৩.১। এই সূচক থেকেই বোঝা যায় এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে যক্ষ্মারোগের প্রবণতা উপজাতি এবং প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে বেশি।

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মানুষের মধ্যে চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা এবং যক্ষ্মারোগের ওষুধ নিয়মিত, সময়মতো খাওয়ার প্রবণতা একেবারেই ক্ষীণ। আমরা এখনো সঠিকভাবে জানি না, কতজন রোগী আর.এন.টি.সি.পি. কেন্দ্রে আসছেন আর কতজন বাইরের চিকিৎসকের কাছে চলে যাচ্ছেন। আমরা এখনো জানি না, এই রোগের অর্থনৈতিক অভিঘাত রোগীর এবং তাদের পরিবারের ওপর প্রত্যন্ত এলাকায় কতটা? কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বাস্তব পরিস্থিতি নথিভুক্ত পরিস্থিতির তুলনায় অনেক খারাপ। সত্য উদঘাটনের জন্য, টিবি সার্কল ইণ্ডিয়া, ২০১৫ সালে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল।

সমীক্ষা—

এই সমীক্ষা টিবি সার্কল ইণ্ডিয়ার দ্বারা ২০১৫ সালে, ১৫৩ জন যক্ষ্মা রোগীর ওপর চালানো হয়েছিল যারা ঝাড়খণ্ডের বোকারো,

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

দেওঘর, গিরিডি, হাজারিবাগ, পশ্চিম সিংভূম এবং পাকুর জেলার ২১টি ব্লকের উপজাতি প্রান্তিক মানুষ। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই সমীক্ষায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলির উত্তর খোঁজা হয়েছিল—

১) ঝাড়খণ্ডে নিম্নআয়সম্পন্ন মানুষের কাছে কি মানের চিকিৎসা পৌঁছেছে, কতটা পৌঁছেছে, তা সঠিক কিনা, তা আর.এন.টি.সি.পি. কেন্দ্রের মাধ্যমে হচ্ছে কিনা এবং চিকিৎসা চালিয়ে না নিয়ে যাওয়ার কারণ।

২) চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে উপজাতি-প্রান্তিক শ্রেণী মানুষদের বাধা কি কি।

৩) এই রোগের ফলে রোগীর পরিবারের ওপর কি প্রভাব পড়ে এবং বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসার ফলে কতটা ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা হচ্ছে।

এই খসড়া রিপোর্টটি পূর্ণাঙ্গ-রিপোর্ট নয়। এটি একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট প্রাথমিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। পাকুরের তথ্য এই রিপোর্টে সংযুক্ত করা হয়নি। টিবি সার্কল আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করবে। কিন্তু কিছু কিছু অনুসন্ধানের উত্তর অত্যন্ত বিচলিত করছে এবং সত্বর সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেমন আর.এন.টি.সি.পি. কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনুসন্ধানের ফল—

যক্ষ্মারোগ নির্মূলের ওষুধের লভ্যতা এবং প্রাপ্যতা ঃ

১৫৩ জন রোগীর মধ্যে ৪৯ জন আর.এন.টি.সি.পি. কেন্দ্রে চিকিৎসা পেয়েছে, ৮৪ জন অন্যান্য যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা পেয়েছে, ১৯ জন বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে গেছে এবং একজন ঘরোয়া চিকিৎসাকে বেছে নিয়েছে। মাত্র ২২ জন দেরি না করে আদর্শ চিকিৎসা বেছে নিয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ রোগীই প্রাথমিক ভাবে, আঞ্চলিক প্রথাগত শিক্ষাবিহীন গ্রামীণ চিকিৎসাকারীদের কাছে বা শিক্ষিত শহুরে বেসরকারী ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা করিয়েছে এবং পরে দেরী করে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে।

যদিও প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে সরকারি ষ্ট্যান্ডার্ড চিকিৎসা পাওয়া যায় যা আর.এন.টি.সি.পি.'র আওতাভুক্ত, তবুও একটা বিরাট সংখ্যক রোগী এই চিকিৎসার আওতায় আসছে না, যে-কোন কারণেই হোক, তারা শহরের বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রকেই বেছে নিচ্ছে। যখন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল তখন এই প্রবণতার কারণ হিসেবে তারা অনেক যুক্তি দেখিয়েছিল, যথা— ১) সরকারি ওষুধের চাইতে বেসরকারি কেন্দ্রের ওষুধ বেশি জোরালো এবং সহজলভ্য এবং ঝুটঝামেলাহীন। ২) সরকারি কেন্দ্রগুলি অনেক দূরে। ৩) চিকিৎসক/কর্মী সরকারি ক্ষেত্রে সবসময় মেলে না। বেশ কিছু সংখ্যক রোগী পরিষ্কার ভাবে সরকারি ক্ষেত্রে তাদের অনাস্থার কথা জানিয়ে দেয়; কেউ কেউ ওষুধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা বলে। কিন্তু যদিও অল্প সংখ্যক মানুষ বলে যে সরকারি যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার ব্যাপারে তারা জানে না, কিন্তু এই কথাটিই সবথেকে বেশি চিন্তার।

চিকিৎসা বিলম্ব ঃ এই বিলম্ব এবং অনিয়মিত এবং অ-যথাযথ চিকিৎসার ফলে যে ড্রাগ রেজিস্টেন্স হয় তা আমাদের সবথেকে উদ্বেগের কারণ। এই সমীক্ষায় নিম্নলিখিত বিকল্প চিকিৎসার কথা উঠে এসেছে যা আর.এন.টি.সি.পি.'র আওতাভুক্ত নয় এবং প্রান্তিক মানুষরা বেছে নিচ্ছেন অ-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেসরকারি ডাক্তার, ওষুধের দোকান, গতানুগতিক ওষুধ; তুকতাক, ঝাড়ফুক ইত্যাদি

কুসংস্কারাচ্ছন্ন পদ্ধতি। এই সব অযৌক্তিক চিকিৎসা করিয়ে, গড়ে ২-৩ মাস, এমনকি ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত চিকিৎসা বিলম্ব হয়ে যেতে পারে।

অ-যথাযথ চিকিৎসা যা আর.এন.টি.সি.পি. গাইডলাইন-এর অন্তর্ভুক্ত নয় ঃ

বেসরকারি ডাক্তার এবং অশিক্ষিত গ্রামীণ চিকিৎসারত চিকিৎসকরা জাতীয় যক্ষ্মা দূরীকরণ কর্মকাণ্ডে এক বিশাল বাধা। বিশেষতঃ প্রান্তিক আদিবাসী মানুষদের মধ্যে যেখানে রোগের ঘটনা জাতীয় গড়ের বেশী। 'ঝোলা ছাপ ডাক্তার' নামে পরিচিত অ-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকেরাই ঐ রোগীদের প্রথম পছন্দ। এরা সঠিক ওষুধ না দিয়ে অত্যন্ত কড়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেয়। তাতে যখন রোগের নিরাময় হয় না তখন শহরে 'বড় ডাক্তারদের' দ্বারস্থ হয় রোগীরা। এখানে তাদের বুকের এক্স-রে করা হয় এবং অল্প সময়ে অনেক খরচ হয়ে যায়। যদিও আমরা তাদের চিকিৎসার মান নিয়ে খুব বেশি পড়াশুনো করিনি, কিন্তু বিভিন্ন পরিমাণ এবং কম্বিনেশনের ওষুধের প্রেসক্রিপশন আমাদের নজরে এসেছে। পিছিয়ে পড়া গরীব মানুষগুলি খরচ বহন করতে না পেরে প্রথমে চিকিৎসা বন্ধ করে দেয় এবং তারপর অনিয়মিত ভাবে ৩-৪ মাস চিকিৎসা চালিয়ে যায়। এর ফলে মালটিপল ড্রাগস্ রেসিসটান্ট টিবি (এমডিআর টিবি) 'র উৎপত্তি হয়।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার ঃ

১৫৩ জন রোগীর মধ্যে, মাত্র ১৩ জনের ১,০০০ টাকার নীচে খরচ হয়েছে। বাকিদের মধ্যে ৪৬ জনের ১,০০০-৩,০০০ এর মধ্যে, ২৩ জনের ৩,০০০-৫,০০০ এর মধ্যে এবং ৭১ জনের ৫,০০০ এর বেশি খরচ হয়েছে।

প্রায় অর্ধেক সংখ্যক রোগী (৪৬ শতাংশ) ৫,০০০ টাকার বেশি খরচ করেছে এই চিকিৎসায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে খরচ এমনকি ৭০,০০০-৯০,০০০ অবধি পৌঁছেছে।

যে ৭১ জন রোগী ৫,০০০ এর বেশি খরচ করেছে, তারমধ্যে ৬৩ শতাংশ ১০,০০০ পর্যন্ত, ১৬ শতাংশ ২০,০০০ পর্যন্ত এবং ১৮ শতাংশ ২০,০০০-৪০,০০০ পর্যন্ত খরচ করেছে।

উপসংহার—

টানা চিকিৎসায় বিঘ্ন এবং সঠিক চিকিৎসার অভাব, সকল যক্ষ্মারোগী— বিশেষতঃ আদিবাসী প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কমিয়ে এবং ন্যূনতম মাত্রায় নিয়ে আসাই হল এম.ডি.আর.-টি.বি. কে নিয়ন্ত্রণ করার চাবিকাঠি। এটা একটা প্রমাণিত তথ্য যে শহরের মানুষদের তুলনায় এই সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের ঘটনা বেশি।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যক্ষ্মারোগের সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই সীমিত, উপযুক্ত তথ্যের অভাবে। এই সমীক্ষা, যদিও ঝাড়খণ্ডের সব জেলা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

এবং ব্লকে চালানো হয়নি, তবুও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি উঠে এসেছে যার থেকে অন্যান্য অনুন্নত, উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যগুলি শিক্ষা পেতে পারে।

প্রথম শিক্ষা হল, আর.এন.টি.সি.পি. প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষের যক্ষ্মা নির্মূলের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি দিচ্ছে না।

দ্বিতীয় শিক্ষা হল, প্রথমটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর মানুষরা সঠিকভাবে আর.এন.টি.সি.পি. নির্দেশিত ওষুধ ব্যবহার করে না। একটা বিরাট সংখ্যক রোগী অশনাক্ত থেকে যায় প্রায় ২-৩ মাস পর্যন্ত, যা থেকে আশেপাশে বাধাহীন ভাবে ঐ জীবাণু ছড়িয়ে যায় এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ঐ রোগের আধিক্যের এ বোধহয় একটি অন্যতম কারণ। এরা আর.এন.টি.সি.পি. অথবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় না, এদের সরকারি ক্ষেত্রে বিশ্বাস নেই, অনেকে আবার আর.এন.টি.সি.পি. বিষয়ে জানেই না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল সাধারণ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ডাক্তারদের যথেচ্ছ চিকিৎসার ফলে চিকিৎসায় বিলম্ব এবং চিকিৎসায় সাড়া না দেওয়ার ঘটনা প্রবলভাবে ঘটছে।

এবং সবশেষে, যক্ষ্মার প্রভাবে, অর্থনৈতিক ভাবেও আদিবাসী পরিবারগুলি জর্জরিত হয়ে পড়ছে।

টিবি সার্কল ইণ্ডিয়ার আবেদন—

১) আর.এন.টি.সি.পি. যেন প্রত্যন্ত প্রান্তিক, উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ দূরীকরণের সমস্যাগুলিকে দূর করার জন্য পুনরায় ভাবনাচিন্তা করে এবং তাদের কাছে চিকিৎসা পৌঁছে দেয়।

২) আর.এন.টি.সি.পি. এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অসংগঠিত এবং অযথাযথ চিকিৎসা যা বেসরকারিভাবে চিকিৎসকরা হাসপাতালের বাইরে করে থাকে তা বন্ধ করতে সঠিক ব্যবস্থা নেয়। নাহলে ঝাড়খণ্ডের মত রাজ্যে এম.ডি.আর.-টি.বি. মহামারীর রূপ নেবে।

৩) আর.এন.টি.সি.পি. এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ডব্লিউ.এইচ.ও এবং ইউ.এন.আই.ও.এন. কে আবেদেন করা হচ্ছে তারা তাদের নীতিকে পুনর্বিবেচনা করুন যাতে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারি এবং বেসরকারি মিশ্রণ বন্ধ করা যায়।

৪) আর.এন.টি.সি.পি. এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যেন যক্ষ্মারোগের ওষুধ যথেচ্ছ এবং বিভিন্ন কম্বিনেশনে ওষুধের দোকানে পাওয়ার ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি খেয়াল করে এবং এর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার দিকে লক্ষ্য রাখে এবং ব্যবস্থা নেয়।

৫) আর.এন.টি.সি.পি. এবং স্বেচ্ছসেবী সংগঠনগুলি একযোগে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা এবং ওষুধ সম্বন্ধে প্রান্তিক আদিবাসী মানুষদের সচেতনতা বাড়াতে এবং শিক্ষা দিতে যেন কাজ করে।

৬) যারা বাইরে থেকে শ্রমিকের কাজ করতে আসে এবং মহিলারাও যাতে এই চিকিৎসা নিয়মিত ভাবে শেষ করে সেদিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখতে হবে।

৭) সবশেষে, রাজ্য যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, ডব্লিউ.এইচ.ও. এবং ইউ.এন.আই.ও.এন যেন আর.এন.টি.সি.পি., পি.এইচ.সি. এর যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং সেখানকার কাজ পর্যালোচনা করে যাতে ঝাড়খণ্ডের প্রতিটা জেলা এবং ব্লকের কেন্দ্রগুলি সঠিকভাবে তাদের কাজ করে যেতে পারে।

[সংকলন ঃ প্রবীর চট্টোপাধ্যায়
ভাষান্তর ঃ রূপা বাগচী]

ক্যানসার রোগী ও তার অধিকার

— উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কাহিনী কি আমাদের জানা নয়?

ভুবনবাবুর ক্যানসার। গলব্লাডারের পাশে পিত্তনালীতে ক্যানসার ধরা পড়েছে। ভুবনবাবু রিটায়ার্ড মানুষ। অবসরকালীন পাওনা কিছু টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। তিন ছেলে, দুই মেয়ে। দুইমেয়ের অনেক আগে বিয়ে হয়ে গেছে। বড়ছেলে ভাল চাকরী করেন— থাকেন বাইরে। সুপ্রতিষ্ঠিত। মেজ ছেলে ব্যবসা করেন। বড়ছেলে, মেজো ছেলে— দুজনারই বিয়ে হয়ে গেছে। ভুবনবাবু বিপত্নীক। ভুবনবাবুর একমাত্র দুঃখ ছোট ছেলেকে নিয়ে। বয়স ৩৫। চাকরীবাকরী পায়নি। দু-একটা টিউশন করে। ভুবনবাবুর গচ্ছিত প্রায় লাখ বিশেক টাকা আছে। ইচ্ছে আছে কিছু টাকা দিয়ে একটা ভাল দোকান করে দেবেন ছোট ছেলেটার জন্য যাতে সে-ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বাড়ি দুতলা। বেহালায়। এর মধ্যে বাবার শরীর খারাপ শুনে ছেলে মেয়েরা সবাই চলে এসেছে বেহালার বাড়িতে। ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ডাক্তারবাবু বিশিষ্ট অঙ্কোলজিস্ট। অসাধারণ নাকি একটা সদ্য ট্রায়াল করা নতুন কেমো এসেছে মার্কেটে। কেমোটার পুরো ৫টা সাইকেল নিলে ভুবনবাবু অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠবেন। সাকুল্যে মূল্য প্রায় ১০লাখ টাকা। ছেলে-মেয়েরা যথেষ্ট সচ্ছল (ছোট ছেলে বাদ দিয়ে)। তারা নিজেরাই দিতে পারে পুরো টাকাটা বাবার চিকিৎসার জন্য। বাবা ওদের বড়ো আপন। ছোটবেলায় তো কবে সেই মা মারা গেছেন। সবাই ঠিক করছেন কে কিভাবে কতটাকা জোগাড় করবেন। হঠাৎ বড় ছেলে বললেন— বাবা কিন্তু চান না অন্য কারুর পয়সায় বাবার চিকিৎসা হোক। বাবা জানতে পারলে দুঃখ পাবেন। ছোট মেয়ে রুমি বলল, 'বাবা তো জানেই না যে বাবার ক্যানসার হয়েছে— কাজেই কি চিকিৎসায় কত টাকা খরচা হচ্ছে— এটাই বা বাবা বুঝবে কেমন করে? কিন্তু অবশেষে বাবার সম্মানার্থে (!) বড়ো ছেলের কথাটাই ঠিক হলো। বাবার টাকাতেই বাবার চিকিৎসা হবে। চিকিৎসা শুরু হলো। ১০লাখ টাকার প্যাকেজ ছাপিয়ে মোট প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেলো। প্রথম কেমো নেবার পর থেকেই নিস্তেজ হয়ে গেলেন ভুবনবাবু। মাত্র চারমাস বাঁচলেন। ভুবনবাবুর টাকাতেই

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ভুবনবাবুর শ্রাদ্ধ হলো। ওনার টাকা প্রায় নিঃশেষ। ভুবনবাবু মারা গেলেন। ওনার ব্যাঙ্কে তখন মাত্র ১লাখের সামান্য কিছু কম টাকা। ভুবনবাবু জানতেও পারলেন না যে কেন এতো টাকা খরচা হলো— টাকাগুলো ভুবনবাবু প্রথমেই তুলে বড়ছেলের অ্যাকাউন্টে জমা করেছিলেন। ভুবনবাবুকে কখনোই জানানো হয়নি যে ওনার ক্যানসার হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ (এক) যদি ঐ কেমোথেরাপি না দিয়ে ভুবনবাবুকে তথাকথিত অনেক কম দামী কেমো দেওয়া হতো— তাহলে কি তিনি ৪ মাস না বেঁচে আরো কম দিন বাঁচতেন? (দুই) প্রায় ১৮ লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হয়ে গেলো— তাতে কি ভুবনবাবুর জীবনের মানকে উন্নত কিছু দিতে পেরেছে উক্ত কেমোর চিকিৎসা? (তিন) কম দামী কেমো কি কম দিন বাঁচায় (বা ভাল রাখে) আর দামী কেমো কি বেশিদিন বাঁচায় (বা ভাল রাখে)? (চার) বাবাকে জানিয়ে কষ্ট দেবো না বলে বাবারই কষ্টার্জিত সঞ্চিত অর্থ খরচ করা হলো অথচ কিজন্যে খরচ হলো এটা জানা কি ভুবনবাবুর অধিকারে পড়ে না? (পাঁচ) কোন কেমোই যদি ভুবনবাবু না নিতেন তাহলে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে উনি আর একদিনও বাঁচতেন না; তাহলে এই চারমাস ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করে ওনাকে বাঁচিয়ে রেখে কোন জীবন উপহার দিল? কেমো নিতে নিতে ক্রমশঃ অবনতি ও শেষে মৃত্যু। তাহলে এই চারমাস টাকা খরচ না করে ছোট ছেলেটার একটা জীবিকার ব্যবস্থা করা বরং অনেক উপযোগী এই সিদ্ধান্ত কি ভুবনবাবুর একা নিতে পারাটা তার অধিকারের মধ্যে পড়ে না? (ছয়) চিকিৎসার নামে বাবারই টাকা ধ্বংস করে মৃত্যু-উপহার কী তার স্বাধীন মতামতকে অগ্রাহ্য করা নয়? তাহলে কী করা উচিত ছিল? যদি সৎ ডাক্তারবাবু ভুবনবাবুকেই বুঝিয়ে বলতেন সবটা তাহলে কে জানে ভুবনবাবু সমস্তটা জানার পর নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যে অনেক টাকা খরচ করে শেষমেষ সুস্থ না হয়ে মাত্র কয়েকটা মাস মৃত্যু না হওয়ার থেকে অনেক কম যন্ত্রণার অন্য কোন বিকল্প?

যদি এমন হতো? যদি ডাক্তারবাবু নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ভুবনবাবুর ছেলে-মেয়েকে ডেকে বোঝাতেন যে ভুবনবাবুকে বুঝিয়ে সমস্ত সত্যটাই খোলাখুলিভাবে জানানো উচিত। বোঝানো উচিত যে, কোনোভাবেই কেমোথেরাপি নিলে সম্পূর্ণ সুস্থ নাও হতে পারেন, হয়তো আর কিছুদিন বেশী বাঁচতে পারেন। বা এই কেমোথেরাপির এই খরচ— প্রত্যেকটার গুণগত মান এক নয় তবে ভুবনবাবু যাতে আবেগপ্রবণ না হয়ে ভুল কিছু সিদ্ধান্ত না করে বসেন... (যদি অবশ্য তার সিদ্ধান্ত নেবার মানসিক জোর থাকতো তবুও— সেটা ডাক্তারই বুঝবেন)। কারণ, শরীরের অসুখটা তারই— চিকিৎসাও তার উপর দিয়েই হবে— খরচটাও তার টাকায় হবে...। উনি যদি এটা ভাবতেন যে কেমোথেরাপি করে সুস্থ জীবন তেমন না পেয়ে মাত্র আর কটা মাস নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সমস্ত টাকাটা খরচ না করে যদি ছোট ছেলেটার জন্য কিছু একটা করে যেতাম। ভুবনবাবু তো ভাবতেই পারতেন যে ছোট ছেলেটা যেন কারুর মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে না থাকে; বাবা হয়ে সন্তানের জন্য স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার না হয় একটা রাস্তা চেষ্টা করা হলো।

কিন্তু ভুবনবাবুর এই ইচ্ছেটা জানতেন না কেউ একমাত্র ছোট ছেলে ছাড়া। ছোট ছেলেটাও দাদা-দিদিকে ঐ কথাটি বলতে পারেননি।

আরেকটি ঘটনা

অমিতাভ দে'র বয়স মাত্র ১৬। মাধ্যমিক পাশ করেছে। অমিতাভ-র বাবা কালীপদ বাবু একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর পরই অমিতাভর ঘনঘন জ্বর হয় ও বুকে ব্যথা হয়। ওষুধ খায়— এ্যান্টিবায়োটিক চলে— জ্বর থেকে যায়। দু তিন দিন যেতে আবার জ্বর হয়। আবার এ্যান্টিবায়োটিক। সেরে যায়। দুদিন পর আবার জ্বর আসে। কেউ রোগ ধরতে পারছেন না। অমিতাভ-র বুকের বাঁদিকটা লাল হয়ে ফুলে ওঠে একটা টিউমারের মতো। অমিতাভ অসুস্থতার জন্য আর উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে পারল না। কালীপদ বাবু দেরী না করে ছেলেকে নিয়ে চলে যান ভেলোরে। পরীক্ষা নিরীক্ষা হবার পর রোগ ধরা পড়ে। ইউয়িং সার্কোমা এক ধরনের ক্যানসার। প্রথমে অপারেশন করে ফুসফুসের উপর ওই পিণ্ডটা বাদ দিতে হবে তারপর কেমোথেরাপি দিতে হবে। কালীপদবাবু ভেলোরে চিকিৎসা করলেন না। চলে এলেন মুম্বাইতে টাটা মেমোরিয়ালে। চিকিৎসা শুরু হলো। প্রথমে অপারেট করে পিণ্ডটা বাদ দেওয়া হলো। তারপর শুরু হলো কেমোথেরাপি। ২০টার মতন সাইকেল হলো কেমোথেরাপির। তারপরে আবার পরীক্ষা করা হলো। সবরকম। না, ক্যানসারের ছিঁটেফোঁটা নেই। কিন্তু মেন্টেনেন্স কেমোথেরাপি দিতে হবে আরো ৩০টা। মুম্বাইয়ের ডাক্তারবাবুরা বললেন যে এই মেন্টেনেন্স কেমোথেরাপিটা কলকাতায় ফিরে নিলেও হবে। সঙ্গে কেমোথেরাপিতে কি কি ওষুধ লাগবে তার জন্য একটা রেজিম বা প্রটোকল করে দিলেন ওনারা। কলকাতায় ফিরলেন কালীপদবাবু ছেলেকে নিয়ে। এরমধ্যে ২ মাস কেটে গিয়েছে। কলকাতায় ফিরে কালীপদবাবু মূলত ক্যানসার রোগীর চিকিৎসার একটি নার্সিংহোমে ছেলেকে মাঝে মাঝে ভর্তি করিয়ে প্রতিবার কেমোথেরাপি করেন। কলকাতার এই নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবুও ওই কেমোথেরাপির প্রটোকল অনুযায়ী কেমো দিতে শুরু করলেন। ছেলেটি ২২ বার ভর্তি হয়ে ২২ বার কেমোথেরাপি নিলো। তারপরেই দেখা গেলো আর এক বিপত্তি। অমিতাভর গলায় একটা সংক্রমণ হলো, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আবার ওখানেই ভর্তি হলো। এই ভর্তি হওয়াটা কিন্তু ২৩ তম কেমোথেরাপির জন্য ভর্তি হওয়া নয়। যাই হোক, অমিতাভর শ্বাসকষ্ট বাড়াতে ওষুধের সাথে ওকে ভেন্টিলেটরের সাহায্য নিতে হলো। ওর অসুবিধা হচ্ছে বলে একবার ভেন্টিলেটর খুলে নেওয়া হলো। এর ৫ মিনিটের মাথায় অমিতাভ মারা গেলো। অমিতাভ কিন্তু ক্যানসারের জন্য মারা যায়নি। গলায় সংক্রমণ থেকে শ্বাসকষ্ট— সেই শ্বাসকষ্ট আর নিয়ন্ত্রণ হলো না তাই মারা গেলো। কিন্তু এটাই বা হলো কেন? কেন এ্যান্টিবায়োটিক গুলো কাজ করল না সংক্রমণকে ঠেকাতে? পরে ধরা পড়ে গেলো আসল কারণ। টাটা মেমোরিয়াল যে প্রটোকলটা দিয়েছিল— তার মধ্যে একটা ইঞ্জেকশনও যুক্ত করেছিল। গ্রাফিল। এই গ্রাফিল ইঞ্জেকশনটা তখনই দেয় যখন অনেকের কেমোথেরাপি চলতে চলতে দেখা যায় যে রোগীর শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা কমে যায়। শ্বেত রক্ত কণিকা কমে গেলে দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাটাও কমে যায়। টাটা মেমোরিয়াল ওখানে কেমোথেরাপি চলাকালীন এটা লক্ষ্য করেছিল, তাই প্রতিবার প্রতিটি কেমোথেরাপির সাথে অর্থাৎ প্রতিটি সাইকেল-এর সাথে ৫দিনে ৫টা গ্রাফিল ইঞ্জেকশনও দিয়েছে। কলকাতার নার্সিংহোম এটা দেয়নি। কলকাতায় প্রতিবার কেমোথেরাপির পর ব্লাড কাউন্টে দেখা গেছে যে শ্বেত রক্ত কণিকা কমে গেছে। তবুও গ্রাফিল ইঞ্জেকশনটি নিয়মিত প্রতিটি কেমোথেরাপির সাইকেলের সাথে নিয়ম করে দেওয়া হয়নি।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

দিলেও মাঝে মাঝে— তাও এক-আধটা। ফলে, অমিতাভ-র সংক্রমণ হবার প্রবণতা বেড়ে গেলো। অথবা সংক্রমণ হওয়ার পর তা না সারারও প্রবণতা বেড়ে গেলো। অমিতাভ মারা গেলো, মাত্র ১৬ বছর বয়সের একটি তরতাজা কিশোর।

এর জন্য দায়ী কে? নিঃসন্দেহে সেই চিকিৎসক। তাকে আরো যত্নবান হতে হতো। যেখানে সেই চিকিৎসক স্বীকার করেছেন যে টাটা মেমোরিয়ালের প্রোটোকলই তিনি প্রয়োগ করছেন। তাহলে গ্রাফিল ইঞ্জেকশনটা নিয়মিত দিলেন না কেন? হয়তো এখানে ডাক্তারের একটা নিজস্বতা কাজ করেছে— অন্য প্রোটোকল যদি উনি নিজে চালু করতেন তাহলে হয়তো রোগীর বাড়ির লোক অন্যত্র চলে যেতো। কিন্তু যেহেতু কেবল শ্বেত রক্ত কণিকার কমা-বাড়ার সঙ্গে গ্রাফিল এর প্রসঙ্গটি যুক্ত— এক্ষেত্রে চিকিৎসক নিজের ডাক্তারি করার সুযোগটি ছাড়েননি। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভুল করলেন শুধু না কাগজপত্র প্রমাণ করে যে তিনি চিকিৎসায় গাফিলতি করেছেন।

ভূমিকা তো রাখতেই হয়

ভারতের সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় (আর্টিকল ২১ : রাইট টু লিভ) প্রতিটি ব্যক্তির জীবন রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা আছে। এমনকি সংবিধানে নির্দেশও দেওয়া আছে জনজীবনের মানোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি। কিন্তু এটা বাধ্যাতামূলক নয়। বাধ্যতামূলক হতে গেলে তো সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্য বা সুচিকিৎসার স্বীকৃতি থাকতে হবে। তাহলে তো অনেক কিছুরই সমস্যা দূর করতে হবে। এতদূর গরীব বড়লোকের তারতম্য থাকবে না—সেইরকম অর্থনৈতিক বিন্যাস থাকতে হবে দেশের। কিন্তু তা তো হতে পারে না বা হতে দেওয়া যায় না। তাই পরিতাপের বিষয় হল, জীবন রক্ষার অধিকার সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি পেলেও, সংবিধানের মূল অধিকারগুলির মধ্যে সুচিকিৎসা লাভের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। বরং সংবিধানের ৪৭ নম্বর ধারায় ২৪৬ নম্বর সম্পর্কিত ৭ নম্বর তফসিলের রাজ্য তালিকার ৬ নং সূত্র যেখানে রাজ্য তালিকার উপর 'অবশ্যই নয়' কিন্তু সুপারিশমূলক কর্তব্য হিসাবে বলা আছে, ফলতঃ কি দাঁড়াল? নয়া অর্থনৈতিক বাতাবরণে এই সুপারিশমূলক কর্তব্য আর আশু কর্তব্য হিসাবে না করলে তা সংবিধান বহির্ভূত কাজ হবে না। বেসরকারিকরণ বাড়তে লাগল চিকিৎসাতে এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা যে দুটি আলাদা বিষয় তাকে গুলিয়ে ফেলে এমনকি স্বাস্থ্যেরও বহু কাজ বেসরকারিকরণ করে দেওয়া হল। আর বেসরকারিকরণের মূল মন্ত্রই হল মুনাফা। ফলে সেবা কথাটি উঠে গেলো ধীরে ধীরে। উঠে এলো একটি নয়া শব্দ ঃ পরিষেবা। পরিষেবা কথাটি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কশিশনের ঘোষণাপত্রের ২৫(ক) ধারায় প্রত্যেকের তার নিজের এবং পরিবারের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবাসহ যথাযথ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিময় জীবনযাপনের কথা উল্লেখ আছে। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৪৬ সালে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। এর প্রথম কাজ ছিল অধিকারের সনদ-এর খসড়া প্রস্তুত করা। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর এই ঘোষণাপত্রটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। এর প্রায় ৩০ বছর পর ১৯৭৬ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র গৃহীত হয়। ভারতবর্ষ ১৯৭৯ সালে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। অতএব, চুক্তিপত্রের অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান ভোগ করার অধিকারকে স্বীকার করে। এই অধিকার পরিপূর্ণভাবে অর্জনের জন্য ধারাটিকে প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির যাতে চিকিৎসা হয় এবং সবাইকে যাতে চিকিৎসকেরা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেন সে বিষয়ে চুক্তিপত্রে অংশীদার রাষ্ট্রগুলির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

তা কি হয়েছে? তাহলে তো পৃথিবীটা অনেক সুন্দরই হতো— মানুষ তো অনেক সুখী হতো— তা কি হয়েছে? আমেরিকাতে বহু মানুষ আজও চিকিৎসার সুযোগ পায় না কারণ তাদের চিকিৎসা বীমা নেই। তারা কম পয়সায় বাধ্য হয়ে এশিয়ার বহু দেশে এসে চিকিৎসা করেন। আজও আমেরিকাতে কেন প্রেসক্রিপশন বহির্ভূত ওষুধ বিক্রি অন্য সবদেশের তুলনায় বেশি (ওভার দ্য কাউন্টার)? আজও আমেরিকাতে কেন চিকিৎসায় গাফিলতি এবং তার ফলে ক্ষতিপূরণ সর্বাধিক? আজও আমেরিকাতে অপ্রয়োজনীয় ওষুধের সংখ্যা সর্বাধিক— কেন? সারা বিশ্বজুড়ে আজ চিকিৎসা একটি বড়ো শিল্পে পরিণত হয়ে গেছে। কোথায় গেলো তাহলে আন্তর্জাতিক সনদ? মনে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এবং ইংল্যাণ্ডের পাবলিক হেলথ পলিসি যেখানে চিকিৎসা ফ্রি প্রতিটি নাগরিকের জন্যে— এই যে দাবীর চাপ ছিল তার জন্যই বাধ্য হয়ে সনদটি তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক চাপে আন্তর্জাতিক সমিতিগুলোকে প্রয়োজন ছিল। সেখানে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ। আজ তারাই শাসন করছে বিশ্বজুড়ে। রাজনীতি, রাষ্ট্র, সরকার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তাদের দখলে। চিকিৎসায় মুনাফাকে আরো ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে ক্যানসার বা এই ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা।

সকলের জন্য স্বাস্থ্য (!)

১৯৭৮ সালে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার আলমা আটা শহরে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং '২০০০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার নেওয়া হল। ১৯৮২ সালে ভারত সরকার তার লিখিত স্বাস্থ্যনীতিতে এই ঘোষণাকে জাতীয় স্তরে রূপায়ণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারপরেও স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার মৌলিক অধিকার রূপে গৃহীত হয়নি সংবিধানে। কিন্তু আলমা আটার উক্ত অঙ্গীকার অর্জিত হয়নি আদৌ। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সংস্থা' গত শতাব্দীর শেষের দিকে আবার আওয়াজ তোলে 'একবিংশ শতাব্দীতে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এবং এই পরিবর্তিত স্বাস্থ্য নীতিতে আগামী একশো বছরের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যেমন—

(১) বিশ্বজনীন 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' একটি নীতি প্রতিষ্ঠা করা।

(২) 'স্বাস্থ্যই উন্নয়নের ভরকেন্দ্র'— এই ধারণার রূপায়ণ।

(৩) দীর্ঘমেয়াদী একটি স্বাস্থ্যনীতি গঠন।

এই নতুন স্বাস্থ্যনীতিতে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের অধিকার, পর্যাপ্ত বাসস্থান, শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার, উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভের অধিকার, হিংস্রতা ও পরিবেশগত বিপদ ও যুদ্ধের মতো বিপদে হানিকারক বিষয়ের থেকে নিরাপত্তার অধিকারের পাশাপাশি তথ্যের অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ওপরেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে মানবোন্নয়নের কেন্দ্রে রেখে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে জনস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র উক্ত নয়া চুক্তিতে অংশীদার রাষ্ট্রগুলি প্রতিটি দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যনীতির মূল কাঠামোরূপে অত্যাবশ্যকীয় কতগুলো কার্যাবলীকে চিহ্নিত করা হয়—

(১) উপযুক্ত সহায়তা প্রদান।

(২) ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও নজরদারি।

(৩) আজীবন উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করা।

(৪) রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা।

(৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটানো।

(৬) স্বাস্থ্যের জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন।

(৭) স্বাস্থ্যনীতির জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সুনিশ্চিতকরণ।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে 'বিশ্বজনীন সকলের জন্য স্বাস্থ্য' নীতিতে কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা বলা আছে। চিকিৎসার কথা নয়। চিকিৎসার বাণিজ্যিকিকরণে তাই বাধা কোথায়? আর উন্নত স্বাস্থ্যনীতি বলতে বোঝায় যে ভবিষ্যতে কেউ অসুস্থ হবেন না; অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো রোগ প্রতিরোধ। কিন্তু রোগ হয়ে গেলে তার প্রতিরোধের থেকেও তার নিরাময় কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। এইভাবে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নীতির মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ফেলতে চায় না। নতুন আবহে মানুষের তো সুস্থ থাকার কথা নয়, তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রটি আরো বড়ো হবে— জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রটি ছোট হতে থাকবে। চিকিৎসার সঙ্গে গোটা ব্যবস্থা— অর্থাৎ হাসপাতাল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অস্ত্রোপচার, ওষুধ, আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী। এই ব্যবস্থার এরা সবাই কাঁচা মাল। আর পণ্য হলো রোগী। বিশেষ করে বেসরকারি পুঁজি নতুন দিগন্ত পেয়েছে সারা পৃথিবীতে চিকিৎসা নিয়ে ব্যবসা করতে। বাণিজ্যিক এই আকর্ষণে মানুষকে আকৃষ্ট করতে হবে খুব সন্তর্পণে তার সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যে স্বাস্থ্যকে চিকিৎসার সাথে গুলিয়ে দিয়ে। কার্যত স্বাস্থ্য বনাম চিকিৎসা ব্যবস্থা; যেখানে বোঝাপড়ায় জনগণের টাকায় স্বাস্থ্য দেখার (আরও অসুস্থ করে দেবার) ভার রাষ্ট্রের আর ব্যয়বহুল প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় (প্রায় বাধ্যতামূলক) চিকিৎসার ভার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের।

প্রসঙ্গ যখন ক্যানসার

এটি ঠিকই কয়েক ধরনের ক্যানসার অতি ভয়ানক রোগ এবং সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা করলে বহু ক্যানসার রোগ থেকেই আজ উন্নত চিকিৎসার দৌলতে আরোগ্য অথবা দীর্ঘজীবন সম্ভব। যদিও ক্যানসারের চাইতে অনেক বেশি রোগী ভারতে আক্রান্ত হন ও মারা যান আন্ত্রিক, নিওমোনিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগে, কিন্তু ক্যানসারের চিকিৎসা যেহেতু বিস্তৃত ও ব্যয়বহুল এবং মুনাফাও অত্যন্ত বেশি তাই বহুজাতিক পুঁজি, কর্পোরেট, চিকিৎসক প্রমুখের নজর এক্ষেত্রে বেশি।

এহেন ব্যবসায়িক চিকিৎসা দুনিয়ার বাতাবরণে আমাদের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে ভীষণভাবে রোগীর অধিকারের কথা। যে রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবনটাকে ছোট করে দেয় অথচ ভয়ঙ্কর খরচ সাপেক্ষ— সেই ক্যানসার রোগীর অধিকার অতি জরুরী হয়ে পড়ে। প্রতিবছর সারা বিশ্বে ১ কোটি মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন, আর মারা যাচ্ছেন ষাট লক্ষ মানুষ। ২০২৫ সালের মধ্যে এই রোগ পৃথিবীর প্রধান ৫ টি সমস্যার অন্যতম হয়ে উঠবে বলে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র রিপোর্টে বলা আছে। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে প্রতিবছরে দু'কোটি মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হবে বলে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এই আক্রান্ত মানুষের ৭০ শতাংশই সেইসব গরিব অনুন্নত অধিবাসী হবেন যেসব দেশে ক্যানসার নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো প্রায় নেই বললেই চলে। এই গভীর সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলে ক্যানসার প্রতিরোধে গণসচেতনতার দরকার যেমন, তেমন-ই দরকার ক্যানসার রোগীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ক্যানসার প্রতিরোধে সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা, শুরুতে রোগ নির্ণয় এবং যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক বা প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রার স্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ক্যানসার রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা করা, রোগ ঘিরে বিভিন্ন সংস্কার, সামাজিক সমস্যা নিয়ে পৃথিবীতে বহু জায়গায় বহু স্তরে ভাবনা চিন্তা চলছে— বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সমাজ বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে রোগীর পক্ষে আন্দোলন কর্মীরা। চিকিৎসক, গবেষক, স্বাস্থ্যআধিকারিক, সমাজকর্মী এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অবিলম্বে ক্যানসার রোগীর অধিকার বিষয়ক কিছু আইন বা নিয়ম থাকা জরুরী হয়ে পড়েছে। এটি এখন একটি আন্দোলনের বিষয়। ক্যানসার রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার কিভাবে উন্নতি করা যায়— এবং তার জন্য রোগী ও তার বাড়ীর লোকজনদের কি কি অধিকার থাকা উচিত তার জন্য একটি ঘোষণাপত্র থাকা উচিত। এবং এই অধিকারগুলোকে আইনিভাবে স্বীকৃতিও দেওয়া উচিত যাতে কিনা ক্যানসার রোগীকে সাধ্যমত জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা যায়।

ক্যানসারের চিকিৎসা

ক্যানসারের চিকিৎসা প্রধানত দু'রকমের। কোন কোন ক্যানসার সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য বা অনেকদিন পর্যন্ত ভাল থাকা যায়। আবার অন্তিম মুহূর্তে হয়তো আর নিরাময় যোগ্য চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না। তখন দরকার উপশমকারী চিকিৎসা।

(১) নিরাময় চিকিৎসা ঃ

ক্যানসার রোগ নিরাময়ে মূলত তিন ধরনের চিকিৎসা চালু আছে।

(ক) অস্ত্রোপচার

(খ) রশ্মি চিকিৎসা (রেডিওথেরাপি)। এই চিকিৎসা দুভাগে

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

দেওয়া হতে পারে—

(i) টেলিথেরাপি;

(ii) ব্র্যাকিথেরাপি;

(গ) ওষুধ চিকিৎসা (কেমোথেরাপি)।

(২) উপশমকারী চিকিৎসা ঃ

ক্যানসার রোগীর যখন নিরাময় আর সম্ভব হয়ে ওঠে না, তখনও শরীরের যন্ত্রণা থাকে নানান জায়গায়, তাই রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করার মাধ্যমে রোগীর জীবনধারণের গুণগত মান বাড়ানোই উপশমকারী চিকিৎসা। রোগীর অন্তিম মুহূর্তে তার শারীরিক সমস্যা ছাড়াও অন্যসকল সমস্যা যেমন— (ক) মুমূর্ষু অবস্থাজনিত হতাশা; (খ) ব্যক্তিগত, সামাজিক ও স্বাভাবিক কাজ থেকে বিচ্যুত হবার জন্য উদ্ভূত কিছু সমস্যা; (গ) পরিবার-পরিজনের প্রতি নির্ভরশীলতা এবং এক্ষেত্রে রোগী অনেকসময়ে মনে করেন যে সে বোধহয় 'বোঝা' সকলের কাছে। 'দুনিয়া একরকম আর সে অন্যরকম'— এরকম কিছু ধারণা আসে। এই সমস্যাগুলি রোগবৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে। আর তখনই উপশমকারী চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আরো। এই চিকিৎসায়— চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ— এদের একটা দলগত প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়া উচিত। আরো উচিত উপশমকারী চিকিৎসায় রোগী ছাড়াও তার পরিবারের লোকজনদেরও যুক্ত করা। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' এই ধারণাকে সম্মতিও জানিয়েছে সম্প্রতি।

আসলে ক্যানসার প্রতিরোধকে যদি চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়— (১) রোগ প্রতিরোধ (যার জন্য গণসচেতনতার দরকার), (২) রোগের অগ্রগতির প্রতিরোধ (যার জন্য রোগটি পূর্ব নির্ধারিত হওয়া উচিত— হঠাৎ ধরা পড়ল এবং অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে এমনটা নয়, (৩) মৃত্যু প্রতিরোধ (অর্থাৎ ক্যানসারের নিরাময়ের চিকিৎসা) এবং (৪) কষ্ট, দুর্দশার প্রতিরোধ (উপশমকারী চিকিৎসা)। এই চতুর্থ পর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত অর্থনৈতিক কারণেও। আমরা প্রায়শই দেখি অনেক ক্যানসার চিকিৎসক অনৈতিকভাবে রোগীর নিরাময়ের সম্ভাবনা নেই নিশ্চিত জেনেও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশায় ও ওষুধ কোম্পানির মুনাফা বাড়িয়ে ব্যয়বহুল নিরাময় চিকিৎসা করে থাকেন কিন্তু আদপে রোগীটির স্টেজ কিন্তু উপশমকারী চিকিৎসা।

ক্যানসার রোগীর অন্তিম অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ— তা কি বর্জনীয়?

ক্যানসার রোগীর ক্ষেত্রে জীবনের শেষ মুহূর্তে চিকিৎসা যে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়— রোগীর যদি জ্ঞান ও বুদ্ধি তখন বিদ্যমান থাকে তবে সেই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাদবাকি কালটায় ওনার ইচ্ছা কি ও সুনির্দিষ্ট কোন ভাবনা আছে কিনা তা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের পরিণতি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একমাত্র সম-অনুভূতি সম্পন্ন চিকিৎসকই এক্ষেত্রে রোগীর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে পারেন।

ক্যানসার রোগীকে তথ্য না জানালে সমস্যা গভীরতর হয়।

ক্যানসার রোগীর যে কোন অধিকার সংক্রান্ত আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি রোগীর তথ্য জানার অধিকারকে সুনিশ্চিত না করা যায়।

২০০৫ সালের মে মাসে ভারতীয় সংসদ 'তথ্য জানার অধিকার' সংক্রান্ত আইনটি পাস করে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য, স্থানীয় স্তরের যাবতীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় পড়েছে। কিন্তু আমরা এক অন্য প্রেক্ষিতে রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য জানার অধিকার, বিশেষ করে ক্যানসার চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি।

প্রায়শঃই চিকিৎসক নিজ সিদ্ধান্তে কিংবা রোগীর পরিজনদের অনুরোধে রোগীকে রোগের তথ্য বলা থেকে বিরত থাকেন। এই না জানানোর পিছনে চিকিৎসকের যে পূর্ব ধারণা কাজ করে তা হল ঃ

(১) রোগজনিত কারণে রোগী সংকটময় অবস্থায় থাকেন তাই তখনই তাঁকে রোগের তথ্য এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জানালে অবস্থা গুরুতর হতে পারে।

(২) রোগের প্রকৃত তথ্য আড়াল করে 'ভাল থাকা' বা 'সুস্থ হওয়ার কথা' শোনালে রোগী মানসিক দিক থেকে সবল থাকেন। তাতে তাঁর চিকিৎসার সুবিধা হয়, উল্টোদিকে, প্রকৃত তথ্য, 'খারাপ খবর' তাঁর আরোগ্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) কোনও চিকিৎসকের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে রোগীকে রোগের তথ্য জানালে কিংবা চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা ঠিক হচ্ছে কিনা এই সংশয় থাকতেই পারে; এগুলি জানালে ফলে বিপত্তি বাড়ে। সে কারণে কোন তথ্য না জানানো তুলনামূলক ভাবে ভালো।

(৪) রোগগ্রস্ত অবস্থায় রোগীর মানসিক অবস্থা, তথ্য শোনা এবং তা বিশ্লেষণ করার অবস্থায় থাকে না, ফলত চিকিৎসকের পরামর্শ তার কাছে ভুল অর্থ বহন করে, যেমন— সব ক্যানসারের ধরন, পর্যায়, এক বলে মনে হয়; ক্যানসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু এমন এক উপলব্ধি তাঁর চেতনার গভীরে গেঁড়ে বসে এবং এক অন্ধকার নামিয়ে আনে।

(৫) মুমূর্ষু রোগী নিজেই রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত শুনতে চান না। তিনি তো আর ডাক্তার নন— তাই অল্প জেনে তাকে কল্পনায় সাজিয়ে এমন এক ভুল ভয় ভরা কাণ্ড এসে তাকে গ্রাস করে— তাতে ক্ষতিই হয় চিকিৎসার।

উপরের এই সকল যুক্তির সারবত্তা একেবারেই নেই তা নয়, তথাপি রোগীকে ও তার বাড়ির লোককে রোগের প্রকৃত তথ্য না জানালে কি ভাল হয়? না। বরং আরো গভীরতর সমস্যা সৃষ্টি হয়।

তথ্য না জানানোর ফলে যে সমস্ত সংকট উপস্থিত হল তার কয়েকটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—

(১) চিকিৎসকের রোগীর প্রতি কর্তব্যের নৈতিকতা দাঁড়িয়ে আছে তিন মূল সত্যের

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

উপরে। রোগীর সর্বোত্তম মঙ্গল, রোগীর নিজস্বতা বা স্বায়ত্ত এবং অধিকার। তথ্য না জানানোর ফলে চিকিৎসক তাঁর নৈতিকতার অমর্যাদা করেন।

(২) মানুষ হিসেবে অন্যান্য অধিকারের মতো তথ্য জানার অধিকার যে তাঁর মৌলিক অধিকারের মতোই তা থেকে রোগী বঞ্চিত হয়। এই অধিকার কিন্তু অন্যান্য সমস্ত অধিকারের থেকে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা প্রশ্নটা আসে জীবনের এক চরম মুহূর্তে।

(৩) রোগের তথ্য বলতে বোঝায় রোগের ধরন, রোগের সম্ভাব্য গতি-প্রকৃতি, চিকিৎসা করলে বা না করলে, চিকিৎসার ফলাফল এবং তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, সর্বোপরি চিকিৎসার সম্ভাব্য খরচ জানা থাকলে রোগী ও তাঁর পরিবারের চিকিৎসা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়ে ওঠে।

(৪) নৈতিকতার শর্ত অনুযায়ী একজন চিকিৎসকের রোগের তথ্য রোগীকে জানাতে এবং রোগীর কাছ থেকে নেওয়া তথ্য গোপন রাখা দরকার। শিশু, মানসিক রোগগ্রস্ত বিশেষ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্য এটা বাধ্যবাধকতা নয়।

(৫) রোগ না জানার ফলে রোগী তার নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, সম্পত্তির অধিকার, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। সায় না থাকলেও অনাকাঙ্ক্ষিত অভিভাবকত্ব মেনে নিতে বাধ্য হন। রোগের প্রকৃত তথ্য জানা থাকলে এমন ব্যাপারটি নাও ঘটতে পারত। চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিজে তাঁর পরিবারের লোকজন ও চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারতেন— যদি এমনটা সম্ভব হতো তাহলে কি খুব খারাপ হতো?

আসলে এই সমস্ত প্রশ্নই চিকিৎসক ও রোগীর আন্তঃ সম্পর্ককে ঘিরে, একজন পারদর্শী, সৎ চিকিৎসকই পারেন তাঁর কেন্দ্রিক অবস্থানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে। তিনি এইসকল সমস্যা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন। একজন সমব্যথী চিকিৎসকের এই পারদর্শিতা অর্জন করা উচিত। কাদের উপস্থিতিতে, কখন, রোগীর কোন অবস্থায় ও কেমনভাবে বা কোন ভাষায় রোগীকে ও তার বাড়ির লোককে ঠিক তথ্যটি উপস্থিত করতে পারবেন এটি নিঃসন্দেহে তাঁর পারদর্শিতা।

আমাদের দেশে একজন ক্যানসার রোগীর শিক্ষা, সংস্কার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, বিশ্বাস, মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে কোন চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অন্যরকম হতেই পারে, কিন্তু জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন-এর এক সমীক্ষাপত্রে (২০০৫) দেখা গিয়েছে যে শতকরা ৯৭ জন ক্যানসার চিকিৎসক রোগীকে রোগ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর পক্ষপাতী।

রোগী সাধারণত ৫টি মানসিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যান—তার সঠিক মূল্যায়ন করে সহানুভূতির সাথে চিকিৎসক তাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন এবং চিকিৎসায় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করবেন, এবং— মানসিক সংকটময় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিচর্যা করবেন। যদি রোগীকে প্রথমেই রোগের তথ্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে চিকিৎসা করা ও রোগীর জীবনের গুণগত মান বাড়ানো সম্ভব নয়।

ক্যানসার রোগীর বিমা সুরক্ষা?

'ক্যানসার রোগ কোনভাবেই সারে না'— এটি একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এই ধারণাকে কাজে লাগিয়েই আমাদের দেশের প্রচলিত সাধারণ ও স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানীগুলি— কি সরকারি, কি বেসরকারি ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিমা সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। রোগমুক্তি ঘটার পরও অথবা নিরাময়যোগ্য ক্যানসারে যদি কেউ ভোগেন— তাদের ক্ষেত্রেও বিমার আবেদন আমাদের দেশে বে-আইনি ভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। জীবন বিমা নিগমের ক্ষেত্রেও কতগুলি নির্দিষ্ট কোমল কোষকলার টিউমার-এর ক্ষেত্রে বিমায় আবেদন পত্র গ্রহণ করার নির্দেশ আছে। কিন্তু খাতায় কলমে। বাস্তবে কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে-কোন ক্যানসার রোগীর আবেদন সংশ্লিষ্ট বিমা কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দেন। এদেশের বিমাকোম্পানীগুলির এহেন উদ্দেশ্যমূলক নেতিবাচক মনোভাবকে পরিহার করানোর জন্য সমাজের সংশ্লিষ্ট সকল মানুষের আন্দোলন করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

চিকিৎসার গোপনীয়তা

অন্য যে-কোন রোগের চিকিৎসার মতো ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও রোগের ও চিকিৎসার গোপনীয়তা রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া-র এথিকস্, এটিকেট ও প্রফেশনাল কণ্ডাক্ট রেগুলেশন ২০০২ তে খুব পরিষ্কার ভাবে এই কথাটি ব্যক্ত করা আছে। চিকিৎসক রোগী ব্যতীত অন্য কাউকেই রোগ, চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা কিংবা চিকিৎসার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করবেন না। একমাত্র রোগীর নির্বাচিত কোন প্রতিনিধিকেই বা নির্বাচিত কোন পরিজনকেই চিকিৎসক ওই সকল তথ্য জানাতে পারেন। দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশে ক্যানসার চিকিৎসায় এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। সাধারণত রোগী ছাড়া সকলেই রোগের তথ্য জানতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসক নিজেই বলেন না রোগীকে— এর ফলে রোগীর স্বায়ত্ত, অধিকার বিঘ্নিত হয়। অনেকক্ষেত্রেই পরিবারের অনুরোধেও চিকিৎসক রোগীকে কিছুই বলেন না। ফলে রোগী চিকিৎসকের সম্পর্কের সুস্থতা থাকে না, রোগী তার ব্যক্তিগত ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিতে পারা থেকে বঞ্চিত হন।

গিনিপিগ

নির্দিষ্ট ক্যানসারের নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, যা মোটামুটিভাবে সারা বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশই মানে, নিরন্তর পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি স্বীকৃতি লাভ করেছে। ক্যানসারের ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট ক্যানসারের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ বা কয়েকটি ওষুধ একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয় যাকে রেজিম বা প্রোটোকল বলা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু চিকিৎসক সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালখুশি মতো সরাসরি বাণিজ্যিক কারণে এমন কিছু ওষুধ কোন ক্যানসার রোগীর ওপরে প্রয়োগ করেন যার সেইভাবে কোনও বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতিই নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক সময় ওষুধের ফলাফল বোঝাবার জন্য মানুষের ওপর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এটাকে বলে ওষুধটির ট্রায়াল। সাধারণত চারটি স্তরের এই ট্রায়াল প্রথমে জীবজন্তুর ওপরে প্রয়োগ হয়। এই ধরনের ট্রায়ালগুলোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিধি আছে। রোগীর ওপর প্রয়োগ করার আগে রোগীকে জানাতে হয় যে ওই নির্দিষ্ট ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি বা তার সম্ভাব্য ফলাফলই বা কি— তারপরে রোগী রাজী হলে তার লিখিত সম্মতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের দেশে এটা করাই হয় না। লিখিত সম্মতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

নেওয়া হয়ে থাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হরফে ইংরাজী ভাষাতে। রোগী ইংরাজী জানলেও তা পড়তে পারেন না, এতো ক্ষুদ্র হরফ! বহু চিকিৎসকই ট্রায়ালের নামে প্রচার করে এমনও যে কয়েকটি বিশেষ ক্যানসারের ক্ষেত্রে অমুক রেজিমটা দেখা গেছে খুব কম খরচায় হয়।

এমনও দেখা গেছে মানুষের অজ্ঞতা ও দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশগুলোতে সৃষ্ট কিছু ওষুধের ট্রায়াল সরাসরি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রোগীর ওপর চালানো হয়। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির প্রসাদ ধন্য আমাদেরই দেশের অসৎ কিছু চিকিৎসক এই ধরনের অপকর্মে নিজেকে যুক্ত রাখেন। একমাত্র আন্দোলন, ক্রমাগত জনচেতনা এবং প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার যে দাবী— তার মাধ্যমেই এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধ হতে পারে। চিকিৎসকের উচিৎ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এথিকস ও নিয়মাবলী মেনে রোগীর সম্পূর্ণ অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি নিতে হবে।

ক্রেতাসুরক্ষা আইনে রোগী কতটা সুরক্ষিত?

ক্রেতাসুরক্ষা আইন ১৯৮৬ পরবর্তী সংশোধন মিলিয়ে ভারতবর্ষ আইনি কাঠামোর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে একটা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যেখানে চিকিৎসক হচ্ছেন একজন বিক্রেতা এবং রোগী হচ্ছেন একজন ক্রেতা। এর ভালমন্দ উভয়দিকই আছে— তা বিস্তারিত ভাবে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না। তবে এটুকু বলা যায় যে চিকিৎসা পরিষেবা কখনোই আর পাঁচটা বাণিজ্যিক পণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থার মতো হতে পারে না কারণ সমাজে যার টাকা আছে, সে চিকিৎসা তাহলে কিনতে পারবে আর যার টাকা নেই তার কেনা সম্ভব নয়।

এইভাবে এই রাজনৈতিক ছক কষে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আইনি মোড়কে বাণিজ্যিক পণ্যায়ন ব্যবস্থায় ফেলে দেওয়া হলো।

চিকিৎসা ব্যবস্থা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা হওয়ার ফলে লাভ কিন্তু দু-তরফের। প্রথমত, যারা চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যবসা করেন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংগঠিত বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা আর দ্বিতীয়ত সরকারি কর্তৃপক্ষ যারা তাদের দায় ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চান। এই অবস্থায় অধিকাংশ চিকিৎসকই ক্ষতিপূরণ দেবার ভয়ে আত্মরক্ষাকারী পেশাগত ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তার ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োজন ছাড়াই অন্যান্য চিকিৎসকের কাছে রোগীকে বারবার রেফার করা ও তাঁদের মতামত নেওয়া এগুলো অনিবার্য হয়ে পড়ে। বলাই বাহুল্য এ সমস্ত আর্থিক দায়ভারগুলোই গিয়ে পড়ে সাধারণ রোগীর উপরে। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ক্যানসার রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে কিছু কিছু বিষয় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। যেমন—

চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সঠিকভাবে ও সহজবোধ্য ভাষায় রোগীর পাওয়ার অধিকার আছে। রোগী যদি অন্য ভাষী হন, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হন, অথবা রোগী যদি এমনিই বুঝতে না পারেন, তাহলে তাঁকে এই সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারার জন্য সবরকম সাহায্য করতে হবে; যাতে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যদি তিনি একা সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হন তবে পরিবার, পরিজন থেকে প্রতিনিধি ঠিক করে ওই সকল সিদ্ধান্ত নেবেন।

গুণগতভাবে সর্বোত্তম চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা নির্বাচন করার অধিকার একমাত্র রোগীরই থাকবে। চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসার রকমফের নিদান ইত্যাদি বলবেন কিন্তু গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একমাত্র রোগীরই থাকবে।

অসহনীয় ব্যথা, বেদনা বা আকস্মিক অসুস্থতার কারণে রোগী যদি মনে করেন তাঁর অবস্থা সংকটজনক, তখন সেই সংকটকালীন মুহূর্তে একটুও দেরি না করে রোগী তাঁর নির্বাচিত পরিষেবকের কাছে জরুরী পরিষেবা লাভ করতে পারেন, এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোন প্রশ্নই থাকবে না।

চিকিৎসকের কাছ থেকে বৈষম্যহীন, মর্যাদাসম্পন্ন চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রোগীর আছে।

চিকিৎসকের সাথে রোগীর একান্তে কথা বলার অধিকার আছে। চিকিৎসক রোগীর রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গোপন রাখতে বাধ্য থাকবেন।

চিকিৎসা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যকে পুনর্বিচার করার অধিকার রোগীর আছে— কাজেই রোগীর অন্য কোন চিকিৎসককে দিয়ে তা পরীক্ষা করার অধিকার আছে। যদি তথ্যে ভুলভ্রান্তি থাকে তাহলে চিকিৎসককে দিয়ে সংশোধন করিয়ে সঠিক, প্রয়োজনীয় ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়ার অধিকার রোগীর আছে।

রোগীর অভিযোগ ও আবেদনের ভিত্তিতে চিকিৎসক, চিকিৎসা পরিষেবক, হাসপাতাল, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার রোগীর আছে। এই অভিযোগগুলি চিকিৎসা ক্ষেত্রে অযথা বিলম্বে চিকিৎসা শুরু করা, চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীর আচার-আচরণ, পরিষেবার সুযোগ সুবিচার অপ্রতুলতা, রোগীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার বা অবহেলা ইত্যাদি সম্পর্কিত হতে পারে।

রোগী চিকিৎসক সম্পর্ক

রোগী চিকিৎসক সম্পর্কটি আসলে চারটি মূল ধারণার বশবর্তী। (১) পিতৃতান্ত্রিক, (২) তথ্যনির্ভর, (৩) ব্যাখ্যানির্ভর, (৪) যুক্তিনিষ্ঠ।

আমাদের দেশে রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কটি সমাজের অন্য সকল সম্পর্কের মতোই পিতৃতান্ত্রিক। রোগীরা সাধারণত "ডাক্তারবাবু, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন আমার আর বলার কি আছে!"— এই ধরনের কথা বলে চিকিৎসকের কাছে তাঁর ভালোমন্দ সঁপে দেন, চিকিৎসক তাঁর জ্ঞান (যেটা স্বাভাবিকভাবেই একটি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ), বিবেচনা, নীতিবোধ অনুযায়ী রোগীর রোগের চিকিৎসা করে থাকেন; রোগীর মতামত মূল্য পায় না। ক্যানসার রোগীর ক্ষেত্রে অবস্থা আরো সংকটজনক হয়; যেহেতু ক্যানসার রোগীরা প্রায়ই তাঁর রোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন না। তথ্যভিত্তিক রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কে চিকিৎসক-রোগীকে তাঁর রোগ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলবেন এবং রোগীই বা রোগীর নির্বাচিত প্রতিনিধিই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কি করবেন। ইদানিং পশ্চিমী দুনিয়ার চিকিৎসকেরা এবং আধুনিক চিকিৎসার নামে আমাদের দেশেও অনেক চিকিৎসক তথ্যনির্ভর চিকিৎসাকে মাত্রাধিক গুরুত্ব দেন। নতুন নতুন তথ্যের খোঁজে অনেক পুরোনো প্রতিষ্ঠিত ওষুধ ও পদ্ধতিকে বাতিল বলে অর্ধপরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

গ্রহণ করা হয়ে থাকে, ফলে অনেক সময়ে বিভ্রাট বাড়তেই থাকে। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ওপর তথ্য জানানোর অন্য কুফল থাকার সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না।

ব্যাখ্যানির্ভর ধারণায় চিকিৎসক রোগের প্রকৃত তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি রোগ বা চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু এক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নেবেন রোগী নিজে।

যুক্তিনিষ্ঠ সম্পর্কে চিকিৎসক শুধুমাত্র ব্যখ্যাই করবেন না, যদি মনে করেন রোগী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তিনি তার জ্ঞান, মূল্যবোধ দ্বারা বিশ্লেষণ করে যুক্তি দিয়ে রোগীকে বোঝাবেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে রোগীকে সাহায্য করবেন।

বর্তমানে চিকিৎসাক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়— একটি নিত্যনতুন ওষুধ আবিষ্কার, চিকিৎসা প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি, অপরটি চিকিৎসা পদ্ধতির লাগামহীন বাণিজ্যিকিকরণ। এর ফলে নতুন এক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন, যান্ত্রিক হয়ে পড়ে, সম্পর্কের অবনয়ন ঘটে। ফলে প্রায়শই অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির বিচারে বিচ্ছিন্ন একজন চিকিৎসক তাঁর ওপর আস্থাহীন নিঃসঙ্গ এক রোগীকে চিকিৎসা করেন। (সংক্ষেপিত)

[সৌজন্য ঃ **কথা**]

পুরনো টায়ারের সদগতি

সারা পৃথিবী জুড়ে পুরনো ও বর্জ্য টায়ার ফেলা যেখানে এক গুরুতর সমস্যা, বিশেষত পরিবেশ দূষণ ও মশাবাহিত মারণ রোগের ধাত্রীগৃহ হিসাবে, সেখানে তরুণ অধ্যাপক বীণা সাজওয়ালার নেতৃত্বে 'সেন্টার ফর সাসটেনবল্ মেটেরিয়ালস্ রিসার্চ অ্যাণ্ড টেকনোলজি', নিউ সাউথ ওয়েলস্, অস্ট্রেলিয়া, এক ধরনের পলিমার ইনজেকশন টেকনোলজি আবিষ্কার করলেন যার মাধ্যমে পুরনো রবারের টায়ারকে একধরনের সংকর ধাতু বা 'গ্রীনষ্টীলে' পরিণত করা যায়।

প্রতি বছর ১০০ কোটির বেশি টায়ার প্রস্তুত হয় আর প্রায় সমসংখ্যক টায়ার পুরনো হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে ৩০ লক্ষ টায়ার তৈরি হয়। চীন ও ভারতেও সংখ্যাটি প্রচুর ও ক্রমবর্দ্ধমান। আধুনিক টায়ার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রবার, রাসায়নিক, ধাতুর স্থিততাবর্ধক তার প্রভৃতি নিয়ে তৈরি এক জটিল বস্তু যা মাটির তলায় পুতলেও স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের ভয় থাকে, ক্ষতিকর পতঙ্গরা এতে জমা জলে ডিম পাড়ে, আগুন লাগলে বিষাক্ত ধোঁয়া বেরোয় ইত্যাদি। ওয়েলসের ১০ কোটি পরিত্যক্ত টায়ার রাখার ধাপায় ১৯৮৯ তে আগুন লেগে ১৫ বছর নেয় পুরোপুরি নিভতে। ৭%-র বর্জ্য টায়ার রিসাইকেলও হয়, ১১% পোড়ানো হয় শক্তি তৈরিতে, ৫% নানাধরনের শিল্পে লেগে যায় আর ৭৭%-র মত ফেলে দেওয়া হয়, যার বেশিটাই বেআইনীভাবে অথবা যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হয়। আজকের দিনে অবশ্য 'ক্রাম্ব রাবার মোডিফায়েড বিটুমিন' দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে।

পলিমার ইনজেকশন টেকনোলজিতে 'গ্রীন ষ্টীল' তৈরির ক্ষেত্রে ইস্পাত তৈরির সময় 'কনভেনশনাল ইলেকট্রিক আর্ক ফারনেসে' পুরোটা কোক না ঢেলে আংশিক কোক এবং আংশিক পুরনো টায়ারের গুঁড়ো ঢালা হয়। কোকের মত টায়ারও হাইড্রোকারবনের ভাল উৎস, তাই একে ঠিকমত মাত্রা মেপে ঢাললে ভাল জাতের ইস্পাত তৈরি হয়। বাণিজ্য সফলভাবে এই ইস্পাত তৈরি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, তাইল্যাণ্ড, কোরিয়া, ইউ. কে. ও নরওয়েতে। ইস্পাত এবং ভালজাতের অ্যাসফল্ট তৈরি ছাড়াও পুরনো টায়ারের ভাল ব্যবহার হচ্ছে সিমেন্ট শিল্পে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দেওয়ালের দৃঢ়তা বাড়াতে ও রাস্তার বেরিয়ার তৈরি করতে, খেলার মাঠে এবং খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুতিতে।

● অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় ৪০০০-এর বেশী মানুষ এখনবধি একধরনের ক্রনিক কিডনির রোগে আক্রান্ত।

● ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস্ ২০১৩-১৪ আর্থিক বছর বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে মানুষ সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা করতে যা খরচ করেছেন (৮,১৯৩ কোটি টাকা), তার দ্বিগুণের বেশি খরচ করছেন রোগীকে আনা নেওয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া ইত্যাদির জন্য (১৮,১৪৯ কোটি টাকা) এবং আটগুণ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচে (৬৪,৬২৮ কোটি টাকা)।

● পারিপার্শ্বিক অপরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের সঠিক সংরক্ষণের অভাব ও জলের পাইপ লাইনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের কারণের অভাবে হিমাচল প্রদেশের সিমলা, সোলান ও মিরমাউর জেলায় 'হেপাটাইটিস্-ই' রোগের মহামারী সৃষ্টি হয়েছে। ফেব্রুয়ারী'১৬-র মাঝামাঝি রোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে।

● যেখানে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এন.এফ.এইচ.এস.)-৪ জানাচ্ছে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের ৩৭% খর্বকায়, ৩৪% কম ওজনের এবং ২২% অপুষ্টিজনিত কারণে বিকলাঙ্গ সেখানে কেন্দ্র সরকার গত বাজেটে আই.সি.ডি.এস. খাতে বরাদ্দ ১,০৬৯.১৯ কোটি টাকা (৫.৮৯%) এবং জাতীয় পুষ্টি মিশন খাতে ৭৫৮.১৯ কোটি টাকা (৪.৮৯%) হ্রাস করলেন।

● ভ্রূণ হত্যা নিবারণে সরকারি প্রচেষ্টার ব্যর্থতা প্রতিকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধী এক অভিনব প্রস্তাব দিয়েছেন। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর প্রতিটি গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্যপরীক্ষার পাশাপাশি ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করা হোক এবং সেই ভ্রূণকে সঠিকভাবে নজরদারি ও যত্নের আওতায় আনা হোক। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (IMA) এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কলম্বিয়ায় যুদ্ধবিরতি

—অরণি সেন

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের বর্ণময় দেশ কলম্বিয়া। অপরূপ প্রশান্ত মহাসাগরের বেলাভূমি থেকে ব্রাজিল অ্যামাজন সংলগ্ন গভীর অরণ্যের মধ্যবর্তী নদী, পাহাড়, উপত্যকা, সমভূমি, শহর প্রান্তর নিয়ে উজ্জ্বল উপস্থিতি। মার্কোজের জাদু বাস্তবতার গদ্যে তা আরও মায়াময় হয়ে উঠেছে। এই বৈচিত্র্যময় জনজাতিপূর্ণ কৃষিভিত্তিক দেশ দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী ধনী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। এই ক্ষমতাবান ধনী গোষ্ঠী তার তিন প্রধান অস্ত্র স্বৈরাচারী সরকার, অত্যাচারী সামরিক বাহিনী আর নিষ্ঠুর মাদক কার্টেলের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে শোষণ, দমন আর অত্যাচার করে এসেছে। ফলে কতিপয় ধনী আরও ধনী হয়েছে, বেশীরভাগ মানুষ আরও গরীব হয়ে পড়েছে। কৃষি ও অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। রমরমিয়ে উঠেছে ড্রাগ কার্টেলদের ও অপরাধ চক্রের অবৈধ ব্যবসা। তার সাথে সন্ত্রাস, অপহরণ, গুপ্ত হত্যা।

কলম্বিয়ার ক্ষমতাসীন এই স্বৈরশাহী মার্কিনের মদতে এই দমনপীড়ন তীব্র করে তোলে ১৯৪৮-'৫৮ পর্যায়ে যাকে কলম্বিয়ার ইতিহাসে 'লা ভাওলেন্সিয়া' বলা হয়। সেইসময় দুই লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। গণতন্ত্রের কোন পরিসর না থাকায় বামপন্থীরা অরণ্য ও অরণ্যসংলগ্ন গ্রামগুলিতে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে বামপন্থীদের মূল সংগঠন 'রেভেলিউশনারি আরমড ফোর্সেস অফ কলম্বিয়া (এফ. এ. আর. সি.)' এবং তার বিভিন্ন বন্ধু সংগঠন ক্ষমতাসীন তানাশাহীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। এই গৃহযুদ্ধ বিগত ৫০ বছর ধরে চলছে, ১৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। একটা সময় দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা 'এফ. এ. আর. সি.'-র দখলে চলে যায়। তাদের ধ্বংস করতে সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী মার্কিনের সহায়তায় ব্যাপক তাণ্ডব ও হত্যালীলা চালায়। তাদের নাপামের আগুনে আদিবাসী গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়, নিঃশেষ হয়ে যায় কৃষি। সে জায়গায় শাসক, সামরিক বাহিনী ও অপরাধ চক্রের মদতে শুরু হয় ব্যাপক মাদক চাষ, মাদক তৈরী ও পাচার। মাদকের বিপুল টাকায় এই চক্র ফুলে ফেঁপে ওঠে।

১৯৮০-র পর থেকে দেশজুড়ে বামপন্থী আন্দোলনের তরঙ্গ তৈরী হয়। বামপন্থী তরঙ্গের আহ্বানে ১৯৮৪-তে 'এফ. এ. আর. সি.' যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে দেশ পুনর্গঠনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। ১৯৮৫-তে তৈরী হয় 'প্যাটরিয়টিক ইউনিয়ন (ইউ.পি.)', ১৯৮৬-এর নির্বাচনে রক্ষণশীল ও উদারতাবাদীদের হারাতে না পারলেও 'ইউ. পি.' ভাল ভোট পায়, সংসদে প্রবেশ করে এবং প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জাইমে পারদো ৫% জাতীয় ভোট পান। স্বৈরশাহীর সহ্য হয় না, আচম্বিতে আঘাত হেনে পারদো সহ ২৫০০ 'ইউ. পি.' নেতাকে হত্যা করা হয়। পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী, মিলিটারী, মাদক গোষ্ঠীগুলি এবং মার্কিন পরামর্শদাতাদের শ্বেতসন্ত্রাস চলতে থাকে। 'এফ. এ. আর. সি.' পুনরায় সশস্ত্র গেরিলা লড়াইয়ে ফিরে যায়। গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৯০-এ স্বৈরাচারী শাসক উরিবে সি-আই-এ-র সাথে শলা করে মার্কিন ডলার, প্রযুক্তি, অস্ত্র ও পরিকল্পনা বলে 'প্ল্যান কলম্বিয়া' কর্মসূচীর মাধ্যমে 'এফ.এ.আর.সি.'-র বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে নামে যা শেষমেষ দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়। ক্ষয়ক্ষতি হলেও 'এফ.এ.আর.সি.' তার শক্তি অটুট রাখে। ক্রুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নাম দিয়ে নিজেদের কমাণ্ডো ও মারণাস্ত্রের আঘাত হানে 'এফ.এ.আর.সি.' নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে। এতেও 'এফ.এ.আর.সি.'-কে থামানো যায় না।

পরবর্তীতে এবং বিশ্ব ও লাতিন আমেরিকার নতুন আবহে প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং দু'-দু'বারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জুয়ান ম্যানুয়েল স্যান্টোস শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করেন। তিন বছর ধরে চলা এই প্রক্রিয়ায় কিউবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শেষে হাভানাতে ক্যাম্প করে কলম্বিয়া সরকারপক্ষ ও 'এফ.এ.আর.সি.' খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করে যুদ্ধ বিরতিতে উপনীত হয়। গত ২৩ জুন হাভানাতে 'এফ.এ.আর.সি.' কমাণ্ডার টিমোচেঙ্কো, যিনি অরণ্যে ৩০ বছরের বেশী থেকে গেরিলা লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন ও প্রেসিডেন্ট স্যান্টোস, কিউবার প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর উপস্থিতিতে, যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। বোগোটো, মেডেলিন, কালি সহ সর্বত্র উল্লাস শুরু হয়।

এখন দেখার কথা কবিতা, ফুটবল এবং বিশ্ব সুন্দরীদের দেশে যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি কতদিন স্থায়ী হয়, দেশ পুনর্গঠন ও অর্থনীতির উন্নয়নের কাজ কতটা সম্পন্ন হয়, সবপক্ষ তাদের কথা ঠিকমত রাখতে পারে কিনা। এই শান্তি প্রক্রিয়াকে বানচাল করতে অসফল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন কোন আক্রমণ শানায় কি না। অন্যদিকে গেরিলা যোদ্ধাদের নিরস্ত্রকরণ ও পুনর্বাসন, যুদ্ধ অপরাধ ও হত্যার বিচার প্রভৃতি স্পর্শকাতর বিষয়গুলিও রয়েছে। রয়েছে মাদক চক্রের দাপট নির্মূলকরণ। বিগত ৫০ বছর ধরে যারা সফল লড়াই চালিয়েছেন তাদের কাছে এটুকু আশা রাখাই যায়।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

চিত্র সমালোচনা

‘দি ম্যান হু নিউ ইনফিনিটি’ (ইংলিশ)

পরিচালনা : ম্যাথিউ ব্রাউন

ক্ষণজন্মা গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজম আয়েঙ্গারকে নিয়ে বেশ কিছু বই, মঞ্চ-সফল নাটক ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম হয়ে গেছে। সাধারণ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা নিয়ে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের এক সামান্য বেতনের তরুণ করণিক অবসর সময়ে কি করে গণিতের এতগুলি দুরূহ ফর্মূলা ও থিয়োরেম আবিষ্কার করেছিলেন তা বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজও বিস্ময়। রামানুজমও হারিয়ে যেতেন যদি না কেমব্রিজের গণিতজ্ঞ অধ্যাপক গডফ্রে হ্যারল হার্ডি ১৯১৩ তে রামানুজমের পাঠানো চিঠি ও গণিতকৃতিগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে ১৯১৪ তে রামানুজমকে বৃত্তি দিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে না নিয়ে আসতেন। এরপর তাদের দুজনের যৌথ গবেষণায় ও এককভাবে রামানুজম অনেক কিছু আবিষ্কার করলেন। নির্বাচিত হলেন ট্রিনিটি কলেজ এবং রয়াল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস.)। কিন্তু বাড়িতে মা ও সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে রেখে আসার বিরহ যন্ত্রণা, বিলেতের মাটিতে তামিল ব্রাহ্মণ্যবাদী নিরামিষাহার ও শুদ্ধাচারের সমস্যা, হাঁড় কাপানো শীত, এ ছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল এই বিজ্ঞান সাধকের গতি রুদ্ধ করল। প্রবল মানসিক যন্ত্রণা ও শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ১৯১৯-এ দেশে ফিরে আসার পর অচিরেই মাত্র ৩২ বছর বয়সে যক্ষ্মায় মারা যান রামানুজম। ১৯৮৭তে রামানুজমের জন্ম শতবর্ষে ম্যসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক রবার্ট ক্যানিগেল তাঁর জীবনী লেখেন ‘দি ম্যান হু নিউ ইনফিনিটি’, যা প্রকাশিত হয় ১৯৯১-তে। তারপর ১০ বছরের বেশী সময় ধরে রামানুজমের জীবন অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তোলেন পরিচালক ম্যাথিউ ব্রাউন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষানুরাগীদের অবশ্যই দ্রষ্টব্য এই সিনেমা।

‘শঙ্খচিল’ (বাংলা)

পরিচালনা : গৌতম ঘোষ

নদীমাতৃক উর্বর শ্যামল সুন্দর, লক্ষ লক্ষ পরিশ্রমী কৃষক ও কারিগরের প্রয়াসে সমৃদ্ধ, লালন ফকির-হাসন রাজার গানের তরী, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা আজ বিবর্ণ ধূসর অতীত। বিভক্ত বাংলার পূর্বাংশ বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, জনবহুল, সংঘর্ষপূর্ণ দেশ যে এখন মৌলবাদী ঘাতকের দঙ্গল পয়দা করে চলেছে। আর পশ্চিমাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশের অন্যতম দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, জনবহুল, সমস্যাসঙ্কুল রাজ্য যেখানে কেবল তোলাবাজ লুম্পেনরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তবুও শিক্ষিত ক্ষমতাহীন জাবরকাটা বাঙালীর মাঝে মাঝে সেন্টিমেন্ট জেগে ওঠে, ক’দিন বিতর্ক ও চর্চা চলে, তারপর আবার তারা ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঝিমিয়ে পড়ে না অর্থনীতি ও পেটের টানে রাজনৈতিক-ব্যবসায়ী-সশস্ত্র বাহিনী-অপরাধচক্রের চিত্রনাট্য মেনে সীমান্তের চোরাচালান, গরু পাচার, সোনা পাচার, ড্রাগ, ফেনসিডিল, অস্ত্র, জালনোট পাচার, যুবতী ও সস্তাশ্রম পাচারের ব্যবসা কিংবা চিকিৎসার কারণে বেআইনীভাবে ভঙ্গুর সীমান্ত পার। এমনই আবহে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, একদা যিনি ‘মা ভূমি’, ‘দখল’-এর মত তেজস্বী এবং ‘পদ্মানদীর মাঝী’, ‘মনের মানুষ’-এর মত মরমিয়া ছবি করেছেন, র‍্যাডক্লিফ লাইনের অসারতাকে বিদ্রুপ করে, সীমান্তের বাঁধাকে পাত্তা না দেওয়া জল-জঙ্গলের শিকারী পাখি শঙ্খচিলকে রূপক ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ ফিল্মটি উপহার দিলেন। গৌতমের ক্যামেরা সবসময় কবিতা লেখে। তাই অপরূপা ইছামতী, কালিন্দী, যমুনা, রায়মঙ্গলদের দুপারে সাবেক খুলনা জেলার সাতক্ষীরা প্রমুখ অঞ্চল এবং সাবেক চব্বিশপরগনা জেলার টাকি প্রমুখ অঞ্চলের বেশ কিছু অপূর্ব নিঃসর্গ চিত্র, চিত্রকল্প ও দৃশ্যায়ন আমাদের অভিভূত করে। চিত্রনাট্য নাটকীয়, প্রসেনজিৎ কুসুম শিকদার প্রমুখদের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সিনেমাটি তেমন জমল না। বিষয়বস্তু যেন আরোপিত। পূর্ণ চন্দ্র দাসের বিখ্যাত গানটি ছাড়া বাকি গানগুলিও কেমন আলগা আলগা সিনেমার শরীর থেকে।

‘দ্য হেড হান্টার’ (আঞ্চলিক)

পরিচালনা : নীলাঞ্জন দত্ত

ত্রিপুরার অপরূপ রাইমা উপত্যকার জীবনযন্ত্রণার উপর তোলা কোকবরক ভাষার ছবি ‘ইয়ারন’ ২০১০ সালে প্রথম আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে নির্বাচিত হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর চলে আসা এই প্রতিযোগিতায় ২০১৫-তে সেরা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পায় নীলাঞ্জন দত্তের ‘দ্য হেড হান্টার’। অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলায় পাতকোই পাহাড়ের ওয়াঞ্চো জনজাতিদের নিয়ে তাদের ভাষায় তৈরী এই চলচ্চিত্র। নীলাঞ্জনের এই শুভ প্রয়াসে সুন্দরী প্রকৃতির বুকে সভ্যতার সঙ্কটে একটি প্রান্তিক ক্ষুদ্র জনজাতির জীবন আখ্যানের সাথে অসহায়তা প্রকাশিত হয়েছে।

—রাজ্যশ্রী দাশগুপ্ত

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

পুস্তক পর্যালোচনা

ডিসেনটিং ডায়গনোসিস

—ডাঃ অরুণ গাদরে ও ডাঃ অভয় শুক্লা
প্রকাশক ঃ পেঙ্গুইন ইণ্ডিয়া

বইটিতে ৭৮ জন সাধারণ চিকিৎসক ছাড়াও, মুম্বই ও পুনে সহ বিভিন্ন মেট্রো শহরের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে কিভাবে দেশের চিকিৎসাক্ষেত্রের সর্বত্র ব্যাপক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং হাসপাতাল, ওষুধ কোম্পানি ও ডাক্তারদের মধ্যে সমঝোতা গড়ে উঠছে। ৭৮ জন চিকিৎসকের মধ্যে ৩৫ জনই হাসপাতালের নির্লজ্জ দুর্নীতির ব্যাপারে প্রবল হতাশা ব্যক্ত করেছেন। এটাই চিকিৎসাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশিত পুস্তক বলে লেখকদের দাবি।

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ড. অরুণ গাদরে এবং সাধারণ চিকিৎসক ড. অভয় শুক্লা 'সাথী' নামের একটি এনজিও'র সঙ্গে যুক্ত। এনজিও'টি, ভারতে স্বাস্থ্য সচেতনতা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে। ড. গাদরের বক্তব্য ''যদি এটা চলতে থাকে তবে আগামী ১০-১৫ বছরে যারা কমিশন নেয় না এমন চিকিৎসক পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে কারণ ইদানীং সততার সঙ্গে চিকিৎসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।'' ২০ বছর ধরে নাসিকের লাসালগাঁওয়ে ড. গাদরে তাঁর নিজের হাসপাতাল চালিয়েছিলেন। তিনি বলেন ''প্রাইভেট চিকিৎসকরা রুগীকে আমার হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে ৪০ শতাংশ কমিশন দাবি করেন। আমি এই ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেন অপছন্দ করি। আর সেই কারণে ১০ বছর আগেই আমার হাসপাতাল তুলে দিয়েছি এবং গত তিন বছর ধরে আমি 'সাথী'র সঙ্গে যুক্ত।''

অনেক সৎ চিকিৎসক আছেন যাঁদের উদ্দেশ্য সমাজের দরিদ্র লোকের চিকিৎসা করা কিন্তু কর্পোরেট সংস্থা হাসপাতালকে শপিং মল বানিয়ে তুলছে। কম বয়সী ডাক্তাররা কমিশন নিতে বাধ্য হন এবং অর্থের জন্য অপ্রয়োজনীয় অপারেশন করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দেয়।

ড. গাদরে বলেন ''সাধারণভাবে ১৪ শতাংশ কার্ডিয়াক রুগীর অ্যানজিওপ্লাস্টি অপারেশন দরকার হয় কিন্তু ইদানীং প্রাইভেট হাসপাতালের কার্ডিওলজিস্টদের বাধ্য করা হয় এটাকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত করার জন্য। কম বয়সী ডাক্তাররা এটা মানতে বাধ্য থাকেন, না হলে তাদের বরখাস্ত করা হয়। হাসপাতাল এখন বাণিজ্যিক সংস্থায় পর্যবসিত হয়েছে এবং রুগীরা সেখানকার কাঁচামাল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।''

ড. গাদরে বলেন যে তিনি সচেতন ডাক্তারদের উদ্বেগকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে চান। আসলে এই যথেচ্ছ দুর্নীতি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাণিজ্যিকে সমার্থক করে তুলেছে। রিয়াল এস্টেটের আকাশ ছোঁয়া লাভের অঙ্ক, রাজনীতিবিদ ও শিল্পপতিদের অনুপ্রবেশ এর অন্যতম কারণ।

লেখক ড. অরুণ গাদরে এবং ড. অভয় শুক্লা দুজনেই বিশেষভাবে জানিয়েছেন কিভাবে কর্পোরেট হাসপাতালে অপারেশনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হয়, অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে বাধ্য করা হয় এবং শেয়ার হোল্ডারদের আরো মুনাফার জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজ করা হয়।

ড. গাদরে এবং ড. শুক্লা লিখেছেন, একটা কর্পোরেট হাসপাতালের একজন অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ইউরোলজিস্ট সেখানকার কমবয়সী এক এমবিবিএস সিইও'র আদেশে জনৈক রুগীর কিডনি স্টোন অপসারণ করার অপারেশন করতে রাজি হননি কারণ সেই অপারেশনটা ছিল নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। আদেশ অমান্য করার জন্য তাঁকে কাঠগড়ায় তুলে অপসারিত করা হয়।

এই পুস্তকে আরো ভীতিপ্রদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে কিভাবে শারীরিক অবস্থার উদ্বেগজনক অবনতি ছাড়াও কৃত্রিম অপারেশনের ভান করা হয় এবং যেখানে রুগীকে অ্যানেশথেশিয়া দিয়ে অজ্ঞান করে চামড়ার ওপর সেলাই করে দেওয়া হয়। ফলে রুগী ভাবেন তাঁর অপারেশন করা হয়েছে।

বইতে একজন নবীন ডাক্তার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন ম্যানেজমেন্ট নির্ধারিত ৪০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বদলে মাত্র ১৫ শতাংশ পূর্ণ করায় একজন সিইও কিভাবে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন।

লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অর্থ একজন ডাক্তার যতজন রুগী দেখবেন তার মধ্যে কত শতাংশ রুগীকে অপারেশন করা হবে কিংবা তাদের চিকিৎসা বিলম্বিত করা হবে।

এনারা দুজন দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বই ও পুনের মতো শহর তথা গ্রাম ও জেলাস্তরের ৭৮ জন চিকিৎসককে ইন্টারভিউ করেন। প্রকাশিত বইটি মুম্বই ও পুনে থেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরাই।

ড. শুক্লার কথায় ''চিকিৎসকরা আমাদের উদ্দেশ্যকে মান্যতা দিয়েছেন এবং খোলাখুলি তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন।'' ভারত সরকার যেখানে রাষ্ট্রীয় জিডিপি'র ১ শতাংশ মাত্র স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে সেখানে ব্যক্তি পুঁজির ৪ থেকে ৬ শতাংশ ব্যয়িত হয়।

ড. শুক্লা বলেন ''উদারীকরণের নামে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রাইভেট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। বাণিজ্যিকিকরণ প্রতিহত করার জন্য সরকারের উচিত বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো এবং সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।''

একটা ক্ষুদ্র শহরের একজন সাধারণ চিকিৎসক পুরোপুরি সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত রাজীব গান্ধী জীবনদায়ী যোজনা স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে অপ্রয়োজনীয়ভাবে একজন কৃষকের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অপারেশন করান। তাঁর অনুপস্থিতিতেই দেখানো হয় যে তিনি কার্ডিয়াক সংক্রান্ত অসুখে ভুগছেন এবং তাঁকে কিছু অর্থও দেওয়া হয়। চিকিৎসক দেড় লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন।

কলকাতার একজন সাধারণ চিকিৎসক ড. পুণ্যব্রত গুণ বলেন যে ইদানীং ডাক্তাররা সঠিকভাবে রুগীর অসুখের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন না। কেবলমাত্র রুগীর শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার একটা তালিকা পেশ করেন যার মাধ্যমে তাঁরা কমিশন পেয়ে থাকেন।

তিনি আরো বলেন, এলাকার সব ল্যাবোরেটরি ৫০ শতাংশ কমিশন দেয় এবং প্রায় সব ডাক্তাররা তা নিয়ে থাকেন। অনেক ডাক্তারই কমিশনের মাধ্যমে যা আয় করেন তা তাঁদের ফি বাবদ আয়ের চেয়ে বেশি। এলাকায় কমিশনের হার এক্সরে ২৫ শতাংশ, এমআরআই ও

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সি টি স্ক্যান ৩৩ শতাংশ।

একজন প্যাথোলজিস্ট দেড়শো জন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের রুগীদের তাঁর পরীক্ষাগারে পাঠাবার অনুরোধ করেন কিন্তু কোন কমিশন দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন না। কেবলমাত্র তিনজন ডাক্তার তাঁর কাছে রুগী পাঠিয়েছিলেন। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ওই প্যাথোলজিস্ট জানিয়েছেন, রুগীর শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনা অনেক সময়েই বাস্তবে পরীক্ষা না করেই সত্যি সত্যি বেসিনে ফেলে নষ্ট করা হয়। ডাক্তার ও প্যাথোলজিস্ট গোপন সমঝোতা করেন। ডাক্তারের পরামর্শ মতোই যেসব পরীক্ষা করতে বলা হয় তা না করেই নমুনা নষ্ট করে ফেলা হয়।

একজন সাধারণ শল্যচিকিৎসকের বক্তব্য অনুযায়ী শ্রমিকদের চিকিৎসা সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়ে একটা হাসপাতালের সঙ্গে এক শ্রমিক নেতার লেনদেনের ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ অসুখের চিকিৎসার জন্য ৫০০০ শ্রমিককে অন্য হাসপাতালে পাঠানো হত কিন্তু অপারেশনের জন্য পাঠানো হত চুক্তিকারী কর্পোরেট হাসপাতালে কারণ চুক্তি অনুযায়ী চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ নিয়োগ কর্তা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য।

'ডিসেনটিং ডায়গনোসিস' নামক পুস্তকে তীব্র ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে কিভাবে মাল্টি স্পেশালিটি কর্পোরেট হাসপাতালে সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় বিশেষ ধরনের প্যাকেজের মোড়কে উন্নত শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের কষ্টার্জিত অর্থের বিশাল অপচয় হয় যদিও পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনার সবটাই জলাঞ্জলি যায়। বইটির ভূমিকা লিখেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব দেশীরাজু। প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপিত চিকিৎসকদের বিবেকের আর্তনাদ। —প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

"এ ডক্টর এমঙ্গ দ্য সানথালস্ ঃ দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ ডঃ স্টিফেন বি. হানস্‌দাঁ"

—সম্পাদনা ঃ আইভি ইমোজেন হানস্‌দাঁ,
আই এস পি. পি. কে, নিউ দিল্লী

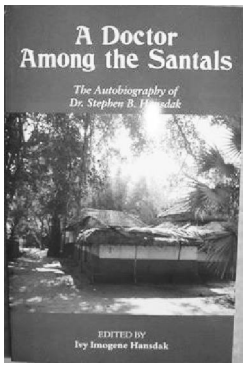

গ্রন্থটির সূচনায় সাঁওতাল পরগণার দু'শতাব্দী ব্যাপী সামাজিক বিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজ সরকার ছত্তিশগড়ের ধামতরি ও তিলডায় যেমন মেনোইটস্ মিশনারীদের নিয়ে আসেন তেমনই ১৮৭৪-র দুর্ভিক্ষের পর দুমকায় লুথেরানদের আনা হয়। মিজোরামে যেরকম বাঁশগাছের ফুল বেরোনো ও দুর্ভিক্ষের পর মিশনারীরা এসে মিজোদের ধর্মান্তরিত করেন, সাঁওতাল পরগনায় মিশনারীদের চেষ্টায় এবং পরবর্তীতে ভগীরথ মাঝির নেতৃত্বে খেরোয়ার আন্দোলনের ফলে কিছু ধর্মান্তকরণ হলেও সাঁওতালরা সাধারণভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি। এর আগে দুই নরওয়েরিয়ান ক্রেশফুড ও বোয়েরেশেন ১৮৬৭ সালে অন্যদের সাথে মিশনারীদের কাজে যোগ দেন। তারা অনেক স্থানীয় ভাষা শেখেন এবং রোমান স্ক্রিপ্টে অনেকগুলি সাঁওতালি বই প্রকাশ করেন। এর আগে জে. ফিলিপস ১৮৫২ সালে বাংলা স্ক্রিপ্টে সাঁওতালি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। পি. ও. বোডিং এই অঞ্চলে আসেন ১৮৯০ তে। একদিকে বাইবেলের সাঁওতালি অনুবাদ, অন্যদিকে রোমান স্ক্রিপ্টে সাঁওতালি লোককথা, চিকিৎসা, ঐতিহ্য, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি রচনা তার অনবদ্য অবদান। বোডিং তার চিকিৎসক স্ত্রী ক্রিস্টিন লারসেনকে নিয়ে মহুল পাহাড়ি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ১৯১৫ থেকে ১৯৩৪ অবধি কাজ করেন। পিলু হানস্‌দাঁ নামক এক মহিলাকে ডাইনি আখ্যা দেওয়ায় তিনি চার্চের আশ্রয় নেন। এই পিলুর নাতি হলেন ডাঃ স্টিফেন হানস্‌দাঁ।

১৯৩১-এ স্টিফেনের এক দরিদ্র সাঁওতাল পরিবারে জন্ম। তার ছোটবেলা কাটে পরিবারের অন্যদের সাথে ক্ষুদকুঁড়ো আর কাঁঠাল খেয়ে। দায়িত্ব ছিল ছাগল আর গরু চড়ানো। তিনি কেওরবানি বোর্ডিং স্কুলে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হন। অর্থাভাবে তাকে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের জামা-কাপড় কাচতে ও বাসন মাজতে হত। হোস্টেল ফি দিতে হত কিছুটা স্কলারশিপের টাকায়, বাকিটা বাড়ির ক্ষেত থেকে নিয়মিত সবজী জুগিয়ে। এখনও আদিবাসী এলাকায় এই প্রথা রয়েছে। অর্থ দিতে না পারার জন্য এমনকি ৫০ কি. মি. দূর থেকে চাল ও সবজীর ব্যাগ বয়ে নিয়ে স্কুলে বা বোর্ডিং-এ দিতে হয়। স্টিফেন রাঁচী থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কেওরাবনিতে একবছর শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি ভেলোরের ক্রিশ্চান মেডিকেল কলেজের ভর্তির পরীক্ষায় বসেন। তার আগে সাঁওতাল সমাজে দু'জন মাত্র পাশ করা ডাক্তার ছিলেন। ডাঃ অলোকা মারাণ্ডি, এমবিবিএস, ডিজিও এবং ডাঃ বাহা হেমব্রম, এমবিবিএস, ডিজিও, ডিএমআরডি। ইংরেজি ভাল না জানার জন্য স্টিফেন প্রথমে বাতিল হলেও পরে মনোনীত হন। প্রথম প্রফেশনাল পরীক্ষায় ফিজিওলজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পান। সি এম সি ভেলোর থেকে ডাক্তারি পাশ করে তিনি মহুলপাহাড়িতে কাজ শুরু করেন এবং পি.ও. বোডিং-এর পরিত্যক্ত বাংলোয় হাসপাতাল খোলেন।

এরপর শুরু হয় তার কর্মযজ্ঞ। দরিদ্র বঞ্চিত পশ্চাদপদ সাঁওতালদের তিনি শুধু চিকিৎসা করতেন না, শিক্ষা ও পুষ্টির বিষয়টাও দেখতেন। পাশাপাশি তিনি অসুস্থতার আর্থ-সামাজিক কারণগুলি খুঁজে বের করেছিলেন, দেখতে পেয়েছিলেন চিকিৎসা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা। ১৯৬০-এ নার্সিং স্কুলের অধ্যক্ষা এলিসের সাথে তার বিবাহ হয়। মিশনের পরামর্শে ১৯৬৫-তে তিনি ভেলোর থেকে সার্জারিতে এম. এস. করেন। সেইসময়ও তিনি তামিলনাড়ুর জাওয়াদি পাহাড়ে আদিবাসীদের চিকিৎসায় একটি ক্লিনিক চালাতেন। সংসার চালাতে তাকে চাষবাসও করতে হত। একসময় তিনি প্রচুর শিকার করেছেন। পরে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আন্দোলনে যুক্ত হন। সাঁওতালদের পবিত্র সারজম বা শাল রক্ষণে ব্রতী হন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন ও শিশুদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। জীবনকৃতির জন্য ১৯৮৮ সালে তিনি পল হ্যারিসন পুরস্কার পান। ২০০২ তে তার মৃত্যু হয়। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা ইভা শিক্ষিকা, পুত্র সি. বি. হানস্‌দাঁ শল্য চিকিৎসক এবং কনিষ্ঠ কন্যা আইভি গবেষক এবং এই গ্রন্থের সম্পাদক। এই গ্রন্থের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরলস কাজ করে যাওয়া এক মহতী চিকিৎসকের জীবন ও কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। —প্রবীর চট্টোপাধ্যায়

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

২০১৬ সালের বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে
নাগরিক-ভোটারদের কাছে সিআরপিপি-র আবেদন

পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচন (২০১৬) উপলক্ষে **কমিটি ফর দি রিলিজ অফ পলিটিকাল প্রিজনারস্ (পশ্চিমবাংলা চ্যাপ্টার)**-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে মতামত বিনিময় করেছে এবং তাদের স্ব স্ব নির্বাচনী ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন রেখেছে। বলাবাহুল্য, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করে না বা নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করে। ''কথা দিলে কথা রাখি'' ফাঁকা বুলিতে পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক সমাজ সম্পর্কে নাগরিক সমাজের, মানবাধিকার সংগঠনের এহেন তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, তারা বারবার ক্লান্তিবিহীনভাবে নাগরিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করে; সম্ভাব্য নাগরিক-ভোটারদের কাছে আবেদন জানায়, এগুলোকে নিয়ে প্রার্থীকে প্রশ্ন করুন, তাদের মতামত জেনে নিন, অধিকার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণে দলগুলো কতদূর সৎ ও আন্তরিক তা বুঝে নিন, বিবেচনা করুন।

১। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, পশ্চিমবাংলায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেবে। সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি; ফলে আজও পশ্চিমবাংলার 'সংশোধনাগারে' কয়েক শত রাজনৈতিক বন্দি রয়েছেন; ২০১১ সালের পর থেকে রাজনৈতিক বন্দির (ইউপিএ সহ) সংখ্যা ক্রমবর্ধমান; বহুজনের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ মিথ্যা মামলা ঝুলছে। কেপিপি, সিমি, গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন রত সংগঠন, মাওবাদী, লালগড়ের পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির সদস্য/সমর্থকরা প্রায় ২০০৮-২০০৯ সাল থেকে জেলে বন্দি। ছত্রধর, প্রসূন, রাজা সরখেল, সাগুন মুর্মু, সুখশান্তি বাস্কে সহ অনেকে আজ রাষ্ট্রের তথা সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনৈতিক মনোভাবের জন্য দণ্ডিত।

সিআরপিপি এদের নিঃশর্তে মুক্তির দাবি জানাচ্ছে। দণ্ডিতদের ক্ষেত্রে জামিনের আবেদনের বিরোধিতা না করার ও আপীল শুনানির সময় বিরোধিতা না করে মুক্তির ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।এইসঙ্গে বিচারাধীন বন্দিদেরও নিঃশর্তে মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

২। ২০১১ সালের আগে থেকেই লালগড় তথা জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে এসেছিল বর্তমান শাসক দল। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক দাবিকে আজও মান্যতা দেওয়া হয়নি। পরন্তু ঐ অঞ্চলে নাগরিকের চলাফেরার মৌলিক অধিকার আজও ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে আছে। জঙ্গলমহল অঞ্চলে গণতান্ত্রিক ও ভয়-সন্ত্রাসহীন পরিবেশ ফিরিয়ে আনার অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হল অবিলম্বে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার।

৩। বামফ্রন্টের আমলে রাজনৈতিক বন্দিদের, হিংসা-অহিংসা নিরপেক্ষভাবে, মর্যাদার স্বীকৃতির আইনি বৈধতা পেয়েছিল ১৯৯২ সালের সংশোধনাগার সংক্রান্ত নতুন বিধিতে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্তে মুক্তি তো দিলই না, তাদেরই গঠিত রিভিউ কমিটির সুপারিশ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করল; উল্টে, রাজনৈতিক বন্দিদের মর্যাদাকে কেড়ে নেওয়া এবং সংকুচিত করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করল এমন একটা সময়ে যখন বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টে বিবেচনাধীন। সিআরপিপি-র দাবি, ২০১৩-র এই সংশোধনী [২৪-(ক)] ধারাকে, অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সাথে সাথে সিআরপিপি এও দাবি জানাচ্ছে রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টে দায়ের করা আপীল মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৪। তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমে সিআরপিপি জানতে পেরেছে, গোপনে ১২টি সংশোধনাগারে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এই মর্মে যে, রাজনৈতিক বন্দিরা তাদের অতিথি/বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করতে পারবে না। সিআরপিপি মনে করে এই কালা সার্কুলার রাজনৈতিক বন্দির আইনি ও সাংবিধানিক অধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও এটি একটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ। সিআরপিপি-র দাবি, এই কালা সার্কুলার অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি, বন্দিদের ফোন কলের সংখ্যা ৫ থেকে কমিয়ে ৩ করা হয়েছে। জেলবিধি, বন্দি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আচরণবিধি লংঘন করে রাজনৈতিক বন্দিদের নিজেদের জেলা থেকে সরিয়ে দূরতম/প্রান্তিক জেলায় পাঠিয়ে দিচ্ছে, যা পরিবারের দুর্ভোগ ও হেনস্থা বাড়াচ্ছে। বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের সময় সাক্ষাৎ প্রার্থীর ওপর ছবি তোলা সহ যে-কোনো নজরদারি ও হাতে স্ট্যাম্প মারার মত অবমাননাকর প্রথা বন্ধ করতে হবে।

সিআরপিপি মনে করে, সরকারের এই ধরনের আচরণ মানসিক অত্যাচারের সামিল। আগের মতোই ফোনকলের সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখতে হবে অথবা বাড়াতে হবে।

৫। বন্দিদের চিকিৎসায় নানারকম গাফিলতি রয়েছে ও সেই কারণেই স্বপন দাশগুপ্ত, রঞ্জিত মুর্মুরা বন্দি থাকাকালিন শহিদ হয়েছেন। সিআরপিপি রাজনৈতিক বন্দিসহ সমস্ত বন্দিদের সঠিক সময়ে সঠিক

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ও উপযুক্ত চিকিৎসার দাবি জানাচ্ছে।

৬। জামিনে মুক্ত অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে আজও মামলা ঝুলে আছে। কোনো বিচার হচ্ছে না; কর্মীরা আজও শুধু হয়রানি ও হেনস্থার শিকার। সিআরপিপি-র দাবি—সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে, গণআন্দোলনের কর্মীর বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৭। জঙ্গলমহলে ভুয়ো সংঘর্ষে নিহত অসীম দাস, শশধর মাহাতো, সিধু সোরেন, লালমোহন টুডু, যুধিষ্ঠির মাহাতো, কিষেণজী সহ সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ/বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা ও বলপূর্বক নিখোঁজ নীতি বাতিল করতে হবে। সিআরপিপি এও দাবি করছে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর সুপারিশ অনুযায়ী, যে-কোনো ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করতে হবে।

৮। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম এবং লালগড়ে যেভাবে রাজ্য সরকার ধর্ষণ ও নারী নিগ্রহকে (যেমন— তাপসী মালিক, রাধারাণী আড়ি) আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল তাকে ধিক্কার জানাতে হবে এবং ভবিষ্যতে কোনও অবস্থাতেই এর পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

৯। পশ্চিমবাংলাসহ বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক নিরপেক্ষভাবে অসংখ্য বয়স্ক বৃদ্ধ, অসুস্থ নারী-পুরুষ আটক রয়েছেন বছরের পর বছর। নারীবন্দিদের ক্ষেত্রে ৫৮ এবং পুরুষবন্দিদের ক্ষেত্রে ৬০ বছরকে ভিত্তি নির্ধারণ করে সমস্ত বয়স্ক বন্দিকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের মত স্থায়ীভাবে নীতি নির্ধারণের দাবি জানাচ্ছে সিআরপিপি।

১০। খাগড়াগড় ঘটনার পর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পশ্চিমবাংলায় সম্পূর্ণ মানবাধিকার বিরোধীভাবে শিশুসহ নারীদের সংশোধনাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সিআরপিপি দাবি করে, এই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক একাধিক ঘোষণা মোতাবেক শিশুসহ নারীবন্দিদের জেলে রাখা যাবে না, হোমে উপযুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে।

১১। রাজনৈতিক বন্দিসহ সমস্ত বন্দির প্রতি জেলে ন্যূনতম আচরণবিধির সম্প্রতি পরিবর্তন হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে, যা ২০১৫-এর 'ম্যান্ডেলা রুলস' নামে বিখ্যাত। সেই আলোকে পশ্চিমবাংলাসহ সর্বত্র সংশোধনাগার বিধির পরিবর্তন ঘটাতে হবে ও কার্যকর করতে হবে।

১২। ন্যায়বিচার পাওয়ার লক্ষ্যে আধা-বিচারবিভাগীয় প্রতিকারমূলক সংস্থাগুলোর— মানবাধিকার কমিশন, নারী কমিশন, শিশু কমিশন, তথ্য কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন, তফশিলী জাতি-উপজাতি কমিশন— ক্ষমতা বাড়াতে হবে ও প্রাক্তন পুলিশ বা আমলা নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

১৩। আমাদের সমীক্ষা দেখাচ্ছে, জেলায় জেলায় মানবাধিকার কোর্ট আদৌ চালু হয়নি; কোনো স্বতন্ত্র পরিকাঠামোও নেই। সিআরপিপি-র দাবি, কার্যকরভাবে মানবাধিকার কোর্ট জেলায় জেলায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে চালু করতে হবে। মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে।

১৪। বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যাচ্ছে, নানা ধরনের বিক্ষুব্ধ সামাজিক তথা নাগরিক আন্দোলন উঠে আসছে। সেই সমস্ত আন্দোলনকে কিভাবে সরকার বিবেচনা করবে তা পূর্ব থেকে ঘোষণা করা জরুরি। বিনা শর্তে আলাপ-আলোচনার নীতি সর্বদা গ্রহণ করা এবং রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়াটাই গণতন্ত্রের আবশ্যিক উপাদান। সিআরপিপি এই উপাদানকে শক্তিশালী করার পক্ষে।

১৫। নির্বাচন পরবর্তী ৫ বছরে এমন কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয় উঠে আসতে পারে যা গোটা সমাজকে আন্দোলিত করতে পারে, নাড়া দিতে পারে, যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ছিল না। সেক্ষেত্রে গণভোটের মাধ্যমে মতামত দেওয়া পরিণত গণতন্ত্রের আরেকটি শর্ত বলে মনে করে সিআরপিপি। এই নীতি গ্রহণ করুক সব রাজনৈতিক দল—সিআরপিপি এই দাবি করছে।

১৬। অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত, জনবিরোধী কার্যকলাপেযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার দাবিটি বহু পুরাতন দাবি, যা আজও (পুরসভার ক্ষেত্রে কিছু রাজ্যে ব্যতিক্রম বাদে) অধরা। সিআরপিপি এই দাবিটির আইনি স্বীকৃতির সপক্ষে।

১৭। নানাস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাদ্রাসা) স্বাধিকার বজায় রাখতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ও পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

১৮। মৃত্যুদণ্ড বিলোপের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আদর্শ মেনে বিধানসভায় মৃত্যুদণ্ড বাতিলের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির কাছে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দির মৃত্যুদণ্ড রদের আবেদনের উপর সরকারের মতামত সদর্থক হতে হবে।

১৯। পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা (১২৪-ক), ইউএপিএ, নিয়া সহ সমস্ত কালাকানুন প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। এই সমস্ত আইনে ধৃত বন্দিদের উপর থেকে সমস্ত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

২০। আন্তর্জাতিক অত্যাচার বিরোধী সনদ (১৯৮৪) মোতাবেক কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে সিআরপিপি সহ অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যদের দেখা করতে দিতে হবে।

২১। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ সহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বাহিনীর লাগাতার হত্যা, তল্লাশীর নামে হয়রানি, নির্যাতন ও যৌন হেনস্থা বন্ধের জন্য এবং রাজ্যের নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৎপর হতে হবে।

নাগরিক-ভোটারদের কাছে আবেদন ঃ—

উপরিউক্ত মানবাধিকার তথা গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে সকল দলের প্রার্থীদের কাছে প্রশ্ন করুন, তাদের অবস্থান জেনে নিন ও সেইমত সিদ্ধান্ত নিন।

—সিআরপিপি, পঃ বাঃ চ্যাপ্টার
৩০.০৩.২০১৬

দলিত স্কলার রোহিত ভেমুলার মৃত্যু, জে.এন.ইউ.এস.ইউ. সভাপতি কানাইহা কুমারের গ্রেফতার প্রভৃতি একের পর এক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশের সাতটি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 'ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইণ্ডিয়া' গঠন করে দিল্লী অভিযান সংগঠিত করলেন।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কর্পোরেটোক্রেসি বনাম জন-প্রতিরোধ

'ফোরাম এগেনস্ট মোনোপলিষ্টিক এগ্রেশন (ফামা)' তৃতীয় অভি দত্ত মজুমদার বক্তৃতার আয়োজন করলেন ২৬ জুলাই কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে। অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মু, জ্যোতির্ময় মাইতি ও ঈশিতা কুণ্ডুর আহ্বায়িত এই বক্তৃতামালায় স্বাগত ও ধন্যবাদসূচক ভাষণ দেন যথাক্রমে বিজ্ঞানী রবীন মজুমদার ও বিজ্ঞানী তুষার চক্রবর্তী। প্রথমে বক্তৃতা রাখেন বিজ্ঞান সংগঠক **অভ্র চক্রবর্তী** যিনি 'রেজারেকশান' সংগঠন গড়ে বর্দ্ধমানের আউষগ্রামে জৈব কৃষি চর্চা শুরু করেছেন। তিনি সুচারুভাবে সবুজ বিপ্লবের আগে ভারতে চাষ হত এক লক্ষ প্রজাতির বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন গুণে ভরা স্বাদু ও পুষ্টিকর ধানের বীজকে কিভাবে ধ্বংস করে বিদেশী নির্ভর ব্যয়বহুল ও ক্ষতিকর চাষগুলি করাতে কর্পোরেট আমাদের বাধ্য করছে; বিটি বেগুন, বিটি তুলো, জিএমও সর্ষে চাষের অন্তর্নিহিত কারণ ও ফলাফল ইত্যাদি বর্ণনা করেন। আমাদের দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের জিন বৈচিত্র্য কিভাবে ডাকাতি হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে এবং তা কিভাবে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে বিশদে বলেন। একসময় দক্ষিণ বাস্তারের গৃহযুদ্ধের কেন্দ্রে কর্মরত সাংবাদিক **শুভজিৎ বাগচী** বর্ণনা করেন কিভাবে কর্পোরেট সংবাদজগতের দখল নিয়ে একমাত্রিক খবর তৈরী করে ভারতীয় জনতাকে একদিকে যেমন অন্ধকারে রাখছে, অন্যদিকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করছে, তার সাথে চলছে এক অসহিষ্ণু জনবিরোধী জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের নির্মাণ। তাদের হাত ধরে আমাদের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ঘন ঘন পা ফেলছে মার্কিন যুদ্ধবাজ যুদ্ধব্যবসায়ীরা। সবশেষে বলেন বক্তৃতামালার মূল আকর্ষণ দক্ষিণ বাস্তারের অসম সাহসী প্রাক্তন শিক্ষিকা বর্তমান মানবাধিকার কর্মী **সোনি সোরি**। নকশাল দমনের নাম করে দক্ষিণ বাস্তারের খনিজ সম্পদ সম্পন্ন জঙ্গল ও গ্রামগুলি কর্পোরেটদের তুলে দিতে কেন্দ্র ও ছত্তিশগড় সরকার সেখানকার আদিবাসী ও তাদের গ্রামগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে। অকথ্য অত্যাচার, দমন-পীড়ন, লুঠ, অগ্নি সংযোগ, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার, জেল, মিথ্যা সঙ্ঘর্ষ সাজিয়ে ঠান্ডা মাথায় নিরীহ আদিবাসীদের খুন, কথায় কথায় আদিবাসী রমণীদের শ্লীলতাহানী, যৌন নিগ্রহ ও ধর্ষণ, পরিবারগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া, গ্রাম থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ নিরন্তর চলছে। বিশাল আধাসামরিক বাহিনী, কোবরা-কমান্ডো, পুলিশ-সালওয়া জুলুম বাহিনী রেখে তৈরী করা হচ্ছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। যে পরিস্থিতিতে অনেকের মত সোনিজীর স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছাত্ররা হারিয়ে যায়। সোনিজীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আড়াইবছর জেলে ফেলে রেখে অকথ্য মানসিক, শারীরিক ও যৌন নিগ্রহ চালানো হয়। সহবন্দিনী যুবতীদের যৌন অত্যাচার, ইলেকট্রিক শকের পাশাপাশি স্তন কেটে ফেলা হয়। এভাবেই কর্পোরেট-রাষ্ট্র-সামরিক বাহিনীর এক জল্লাদের উল্লাসক্ষেত্র তৈরী হয়েছে দক্ষিণ বাস্তারের পাহাড়, জঙ্গল, উপত্যকা, সমতলে। এর বিরুদ্ধে সোনিজি রুখে দাঁড়িয়েছেন গণতান্ত্রিকভাবে। তাই তাকে আটকাতে কেমিকেল নিয়ে আক্রমণ। এত ক্ষয়ক্ষতি অত্যাচারের মধ্যেও সেখানে চলছে জনপ্রতিরোধ।

ভারতের হিরোশিমা জাদুগোডার পাশে দাঁড়ান, পোষ্ট কার্ড সংগ্রহ করুন

আদিবাসীরা ভাবতেন ভূতের প্রভাব। কারু হাতে ৭-টা আঙুল। কারু বয়স ৪০ হলেও তাকে দেখতে ৫ বছরের শিশুর মতো। কারুর পায়ের আঙুলগুলো হাঁসের পায়ের মতো জোড়া। আস্তে আস্তে সব মা বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছেন, দেখা দিচ্ছে ক্যান্সার। এক একটা গ্রামে ২০টার বেশী বিকলাঙ্গ বাচ্চা। অনেক দিন পর সরল গ্রামবাসীরা বুঝতে পারেন এটা ইউরেনিয়াম খনির ফল।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য তারা ঝুড়ি করে মাথায় নিয়ে ফেলে আসেন ডাম্পারে, যে পোশাকে খনিতে কাজ করেন সেই পোশাকেই বিবি বাচ্চা কে আদর করেন, নদীতে চুইয়ে পরে তেজস্ক্রিয় তরল। তারা হিরোশিমা নাগাসাকি দেখেননি। তাই ভূতের দোহাই দিতেন। গ্রামের পর গ্রামে মানুষের রোগ। ঝাড়খণ্ডের তিনটি সুন্দর পাহাড় ঘেরা গ্রাম ছিল জাদুগোডা, সেই তিনটি পাহাড়ের পাশে আরও একটা ইটের দেওয়াল তুলে হা মুখ তৈরি করা হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে সেখানেই ডাম্প করা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় তরল। তার পাশেই খেলে বেড়াচ্ছে বাচ্চারা। বেশিরভাগই মারা যাচ্ছে। যারা বাঁচছে তাদের চরম দুর্ভোগ। মহিলারা ভুগছেন গর্ভপাত জনিত সমস্যায়। পেটেই বাচ্চা নষ্ট হচ্ছে।

দারিদ্রের কারণে এনারা সঠিক চিকিৎসা পান না। অর্থকষ্টের জন্য কলকাতা বা কটকে যেতে পারছেন না চিকিৎসা করাতে।

একটা পোষ্ট কার্ড করা হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে গোটা বিষয়টা জানিয়ে।

এছাড়াও জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত দফায় দফায় আলোচনা, লিফলেট, তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা জাদুগোডার বিষয় নিয়ে ক্যাম্পেন চালাচ্ছি। 'ইউ সি আই এল' এখন মোট চারটি খনি চালায় ঝাড়খণ্ডে। ইউরেনিয়াম খনি চালাতে গেলে সারাবিশ্বে যে ধরনের নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে, সে সবের কিছু ধার ধারা হয় না। তাই দীর্ঘ দিন থেকেই পরিবেশ বিপন্ন। জল জঙ্গল জমি দূষিত। হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে মারণ রোগ। এরপর এরাই হাত বাড়াচ্ছে মেঘালয় এবং অরুনাচলের দিকে। শোনা যাচ্ছে ওখানেও এই ধরনের খনি তৈরি হবে। এর বিরুদ্ধে প্রচার জোরদার না হলে, সারাদেশ জুড়ে আওয়াজ না উঠলে আবারও বিকলাঙ্গ বাচ্চাদের আঁতুড় তৈরি হবে মেঘালয় এবং অন্ধ্রপ্রদেশে।

—**'জল-জঙ্গল-জমিন'**

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

অসমের বন্যা পরিস্থিতি

পরিস্থিতি রিপোর্ট

সরকার থেকে এই রিপোর্ট পাঠানো অবধি জানা যাচ্ছে ১৭,৯৪,৫৫৪ জন মানুষ বন্যা কবলিত। সরকারি রিপোর্টে ২৭টি জেলায় ৪৯ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত হন, মারা যান ৪১ জন। মোট ২২টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ধেমাজি, বরপেটা ও কোকরাঝাড় জেলায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হল জোরহাট (২,০০,৬৮৪ জন), দারাং (১,৮৫,৮৭৭ জন), বনগাইগাঁও (১,৭৭,০১২ জন), ধেমাজি (১,৭১,৫৮৬ জন), গোলঘাট (১,৫০,৩২৬ জন), গোয়ালপাড়া (১,৪৪,৯১৩ জন), লখিমপুর (১,০০,৬১৭ জন), সোনিতপুর (১,০০,১৯৯ জন)। প্রতিটি জেলাতেই লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা কর্তৃপক্ষ ৫১৭টি শিবির ও ১৮৬টি রিলিফ বিতরণ কেন্দ্র খুলেছে যেখানে ২,২৯,৫৪৪ জন থাকছেন। এন ডি আর এফ, এস ডি আর এফ ও ভারতীয় সেনা জেলা প্রশাসনকে সাহায্য করছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের।

মায়াং রেভিনিউ সার্কেলের পোকোরিয়া, মায়াং, মানাহা, যাগুয়া মৌজার ১৩৪টি জেলার প্রায় ২,০৯,৩৩২ জন মানুষ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মরিগাঁও জেলার বন্যার জলের তোড়ে। নওগাঁও জেলার কোলিয়াবর রেভিনিউ সারকেলস (সাশগুরিতে ১৩টি, কোলিয়াবর-এ ২১টি) ৩৪টি গ্রামের ৩০,০০০ জন মানুষ এবং ঠিতিং রেভিনিউ সারকেলসের আটটি গ্রামের ও রূপহি রেভিনিউ সার্কেলের পাঁচটি গ্রামের মোট ১০,০০০ জন মানুষ ব্রহ্মপুত্র নদীর জলস্ফীতিতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত।
সূত্র ঃ আসাম ট্রিবিউন ২৯ জুলাই ২০১৬

ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	মৃত মানুষের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম
ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা	ত্রাণ শিবির ও বিতরণ কেন্দ্র	ত্রাণ শিবিরের মানুষ
২২	০৫	৩,৩৭৪
১৭,৯৪,৫৫৪	৫১৭ ও ১৮৬	২,২৯,৫৪৪

পরিস্থিতির গুরুত্ব

ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	লখিমপুর, গোলাঘাট, বনগাইগাঁও, জোরহাট, ধেমাজি, বরপেটা, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি, দারাং, মরিগাঁও, শোনিতপুর, নলবারি, শিবসাগর, কোকড়াঝাড়, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, বিশ্বনাথ, কামরূপ (এম), চিরাগ, নওগাঁও, কামরূপ, দক্ষিণ কামরূপ।
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল	ডিব্রুগড়ে ব্রহ্মপুত্র (ডিব্রুগড়), নেমাটিঘাট (যোরহাট), তেজপুর, (সোনিতপুর), গুয়াহাটি (কামরূপ), গোয়ালপাড়া (গোয়ালপাড়া), ধুবড়ি (ধুবড়ি), বুরহিডেহিং ঘোয়াং-এর (ডিব্রুগড়), সুবনসিরি বাদাটিঘাট-এর (লখিমপুর), নাংলামুরাঘাট, দেশাং (শিবসাগর), নুমলিগড়-এর ধানসিড়ি, এন টি. রোড ক্রশিং (শোনিতপুর), পুথিমারি এন এইচ রোড ক্রশিং-এর (কামরূপ), রোড ব্রিজ-এ বেকি বরপেটা ও গোলোকগঞ্জে সংকোশ (ধুবড়ি)।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যে সমস্ত জেলায়

যোরহাট	২,০০,৬৮৪
দারাং	১,৮৫,৮৭৭
বনগাইগাঁও	১,৭৭,০১২
ধেমাজি	১,৭১,৫৮৬
গোলাঘাট	১,৫০,৩২৬
গোয়ালপাড়া	১,৪৪,৯১৩
লখিমপুর	১,০০,৬১৭
শোনিতপুর	১,০০,১৯৯
নগাঁও	৯৬,০৯৩
বিশ্বনাথ	৮৮,১৭৫
দক্ষিণ কামরূপ	৬৯,৮৯৩
ডিব্রুগড়	৬৩,৬৩০
শিবসাগর	৫৯,৫৬০
কোকরাঝাড়	৫০,৪২৭

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

জেলা	ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা
ধুবড়ি	৪৭৮
বরপেটা	৪০৪
ধেমাজি	৩৫৫
মরিগাঁও	২৭৭
যোরহাট	২৫৯
গোয়ালপাড়া	২১৯
বনগাইগাঁও	১৭৫
লখিমপুর	১৩৯
দারাং	১২৮
ডিব্রুগড়	১২৪
শোনিতপুর	১১৯
গোলাঘাট	১১৪
দক্ষিণ কামরূপ	১০৬
বিশ্বনাথ	৯৮
নগাঁও	৬৭
নলবাড়ি	৫৬
কামরূপ (এম)	৪৬
কোকরাঝাড়	৪৩
কামরূপ	২৩
চিরাং	২০
তিনসুকিয়া	০১
মোট	৩,৩৭৪

ত্রাণ শিবিরের নাম	সংখ্যা	ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র
গোলাঘাট	৩০	৫৬
যোরহাট	১৮	১০
শিবসাগর	০৭	২০
শোনিতপুর	৩৫	৩৬
কোকরাঝাড়	০৬	০৬
বনগাইগাঁও	১৩	৫৪
বিশ্বনাথ	০৪	০৪
দারাং	০৬	
বরপেটা	০১	
ধেমাজি	২৪	
ডিব্রুগড়	৬০	
তিনসুকিয়া	০১	
ধুবড়ি	৮৭	
মরিগাঁও	১৩৪	
নলবাড়ি	২৬	
গোয়ালপাড়া	৩৫	
নগাঁও	২৩	
কামরূপ	০৪	
দক্ষিণ কামরূপ	০৩	
মোট ত্রাণ শিবির	৫১৭	মোট ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র ১৮৬

ত্রাণ শিবিরের জনসংখ্যা

গোলাঘাট	৭,৯৯৩
যোরহাট	৩,৫৩০
শিবসাগর	২৬২
বরপেটা	১৭০
কোকরাঝাড়	৩,১৮৪
ধেমাজি	১৭,৬৭৫
বনগাইগাঁও	১২,৬০৪
দারাং	৩,৭৩৫
বিশ্বনাথ	৭,১২২
ডিব্রুগড়	১০,৬৭৮
তিনসুকিয়া	২৭৯
ধুবড়ি	১১,৮২৭
মরিগাঁও	৬,৮৩১
শোনিতপুর	৫১,৬৬২
নলবাড়ি	৩৮,৪০০
চিরাংগ	১২,৬৯৬
গোয়ালপাড়া	১,৩৭৮
নগাঁও	৫,৫৪৫
কামরূপ	৮৯৩
দক্ষিণ কামরূপ	২,৯৯৬
মোট	২,২৯,৫৪৪

যে সংখ্যায় প্রাণনাশ ঘটেছে

ধেমাজি	০১ (গোগামুখ)
বরপেটা	০৩ (বরপেটা-০১, সরুপেটা-০১, বরনগর-০১)
কোকরাঝাড়	০১ (দোতমা)
মোট	০৫

বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

বরপেটা	১৫ (পুরোপুরি)
চিরাং	২৭২ (পুরোপুরি)
	২১৩ (অংশত)
গোয়ালপাড়া	১৪৪ (পুরোপুরি)

শহরের বন্যা

কামরূপ (এম)	দিসপুর : ২নং খারখুলি, যন্দা, গুয়াহাটি, পানবাজারের কাছে ধস
ডিব্রুগড়	ডিব্রুগড় পূর্ব : পাঁচ মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড ক্ষতিগ্রস্ত

জরুরি প্রয়োজন

* বিশুদ্ধ জল/অ্যাকোয়া ট্যাব, জীবাণুনাশক (ব্লিচিং পাউডার, এইচ পি-র ক্লোরিন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ে পৌঁছানো) * ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য স্যানিটেশনের সুযোগ * মহিলাদের জন্য হাইজিন (স্বাস্থ্যসম্মত বিধি)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

/ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি ও প্রয়োজন সম্প্রদায়ের জন্য * অস্থায়ী শিবিরে ত্রিপলের যোগান * জরুরি ভিত্তিতে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য খাবার সরবরাহ বিশেষ করে যে সমস্ত মানুষ অস্থায়ী ছাউনি ও ত্রাণ শিবিরে আছেন তাদের জন্য * জনসাধারণের জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প অবিলম্বে প্রয়োজন * পোকা মারা ওষুধ ও মশারি প্রয়োজন * সালি ধান পুনস্থাপন কেননা এটিই কৃষির প্রধান শস্য মানুষের বিশেষত প্লাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বেঁচে থাকার।

[কৃতজ্ঞতা ঃ **আই এ জি — আসাম, 'ডক্টরস ফর ইউ', 'এ এস ডি এন এ', অক্সফ্যাম**]

ডাঃ শৈবাল জানার মুক্তি চাই

প্রতি
মাননীয় প্রধান বিচারপতি
হাইকোর্ট, ছত্তিশগড়
মহাশয়,

আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীরা ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ইস্যুগুলিতে, যেগুলি চালু আছে তাতে গভীর উদ্বিগ্ন, এর সঙ্গেই উদ্বিগ্ন ছত্তিশগড়ের দল্লি রাজহারার শহীদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ শৈবাল জানার গ্রেপ্তারেও।

পঁচিশ বছর আগেকার এক কেস-এ ডাঃ জানাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। এই কেস ট্রায়াল কোর্টে পাঠানোও হয়নি মাঝের এই ২৫ বছরে। আমরা আরও গভীরভাবে ব্যথিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় এই জেনে যে ডাঃ জানাকে হাতকড়ি পরিয়ে জনসমক্ষে প্যারেড করিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। আমরা মনে করি এই ঘটনা সমস্ত নাগরিক বিধিসমূহ ভঙ্গ করেছে।

ডাঃ শৈবাল জানা কলকাতা থেকে ডাক্তারিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর থেকেই একজন উৎসর্গীকৃত স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে শহীদ হাসপাতালে কাজ করে গিয়েছেন। তিনি অবিরাম কাজ করে গিয়েছেন বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যপরিষেবার র‍্যাডিক্যাল প্রাকটিশকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী যেমন আর এন টি সি পি, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, এম সি এইচ ইত্যাদি প্রয়োগে নিয়ে গিয়েছেন। ডাঃ জানার এই সমস্ত এলাকায় কাজগুলি খুবই উপযোগী এমনকি দল্লি-রাজহারা জনজাতির মধ্যে সরকারি কর্মসূচী রূপায়ণে ''দৃষ্টান্তকারী'' হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

উপরের প্রেক্ষিতে ডাঃ জানার দল্লি-রাজহারার গরিব জনজাতিদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ভাল কাজ সত্ত্বেও তাঁর উপর অযাজিত আক্রমণে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত। তাঁর মত এমন গুণী ডাক্তার যিনি জন-স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে কর্মরত সেখানে তাঁকে প্রায়ই অভিযুক্ত করা হচ্ছে অজুহাত দিয়ে যে তিনি এটা সেটা ''আইন'' ভঙ্গকারী।

আমরা মনে করি যে সরকার যখন ২৫ বছর ধরে কেসটি চালু করার চেষ্টা করেনি, এটি শেষমেষ বলা যায় যে সরকারও মনে করে না কেসের কোন মেরিট আছে।

উপরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আমরা ৮ মে ২০১৬ কলকাতায় সিনেট হলে সমবেত হয়েছি ''জন উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিষেবা''-র উদ্যোগ গ্রহণে, এবং সর্বসম্মতভাবে দাবি জানাচ্ছি ডাঃ জানার বিরুদ্ধে সেসন কোর্টে যে মামলা ঝুলছে তার অবলুপ্তি ঘটানোর জন্য। যাতে করে ডাঃ জানা জনগণের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত তা বাধাহীনভাবেই করতে পারেন।

— ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, ফনিগোপাল ভট্টাচার্য্য, নব দত্ত, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, জয়া মিত্র, সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার, শুভেন্দু দাসগুপ্ত, দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ কুনাল দত্ত, সীতাংশু ভাদুড়ি, ডাঃ শোভন পাণ্ডা, নিত্যানন্দ ঘোষ, ডাঃ আশীষ কুমার কুণ্ডু প্রমুখ।

ডাঃ শৈবাল জানা

এআইপিএফ তথ্য অনুসন্ধানকারী টীমের বস্তার পরিদর্শন
ভুয়ো সংঘর্ষ, ধর্ষণ, অবাধ গ্রেপ্তারী, ভুয়ো আত্মসমর্পণের বহু ঘটনার সত্য উদঘাটন

রায়পুর ১২ জুন ২০১৬ ঃ **অল ইন্ডিয়া পিপলস ফোরামের** তথ্য অনুসন্ধানকারী আট জনের একটি টীম ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় ৮-১১ জুন ২০১৬ পরিদর্শন করেন। তাঁদের অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে খ্রীস্টান সংখ্যালঘুদের ওপর কয়েকটি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা এবং বহু ভুয়ো সংঘর্ষ, ধর্ষণ, ভুয়ো মামলা, অবাধ গ্রেপ্তারী ও ভুয়ো আত্মসমর্পণের ঘটনা। এআইপিএফ টীমে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের সমাজবাদী সমাগমের প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ সুনিলম, সিপিআই (এমএল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন বিধায়ক বিনোদ সিং, অল ইন্ডিয়া প্রগতিশীল মহিলা সমিতির সম্পাদিকা কবিতা কৃষ্ণাণ, এআইসিসিটিইউ-র ব্রিজেন্দ্র তেওয়ারী, পিইউসিএল-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অম্লান ভট্টাচার্য, ছিন্দওয়ারার আইনজীবী আরাধনা ভার্গব, কলকাতার আইনজীবী অজয় দত্ত এবং সাংবাদিক অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী।

খ্রীস্টান সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রদায়িক হিংসা ঃ

১। করমারি, বড়ে থেগলি, সিরিসগুড়া এবং বেলার বস্তার জেলার এই কয়েকটি গ্রামের গ্রাম সভা, 'ছত্তিশগড় গ্রাম পঞ্চায়েত আইনে'র ১২৯(জি) ধারার ভুল ব্যাখ্যা এবং আইন লঙঘন করে অ-হিন্দুবাসীদের বসবাস, উপাসনাগৃহ নির্মাণ বন্ধ করার প্রস্তাব চাপিয়ে দেয়। যদিও করমারি ও সিরিসগুড়া গ্রাম সভার এই প্রস্তাব হাইকোর্ট নাকচ করে দেন।

২। বস্তার জেলার ভাদিমগাঁও (টোকাপাল পঞ্চায়েত)-এর যাজক পিলারাম কাওড়েকে তাঁর নিজের জমিতে উপাসনাগৃহ নির্মাণের অনুমতি নাকচ করে তাঁকে লিখিত নোটিশ দেওয়া হয়। ঐ নোটিশে বলা হয়

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ছত্তিশগড় গ্রাম পঞ্চায়েত আইন ১৯৯৩-এর ধারা ৫৫(১) এবং (২) মোতাবেক তিনি কোন উপাসনাগৃহ নির্মাণ করতে পারবেন না এবং আরও বলা হয় যে ''কারণ ঐ গ্রামে বড় বড় জাতের ও ধর্মের লোক বসবাস করেন এবং প্রত্যেক দশেরার সময় উৎসবে স্বয়ং রূপশীলা দেবী মা যোগ দেন সেখানে।''

৩। খ্রীষ্টানদের কবরস্থান ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া চলছে। ঐ ভাদিসগাঁওয়ে এক খ্রীষ্টান বৃদ্ধা সারদি বাঈ ২৫-মে ২০১৬ মারা যান। কিন্তু বজরং দলের প্ররোচনায় হিন্দু গ্রামবাসীরা তাঁকে কবর দিতে বাধা প্রদান করেন। শেষে পুলিশের মধ্যস্থতায় মৃতাকে ক্রুশ ছাড়াই বাক্সে করে কবর দেওয়া হয়। অবশ্য ঐ হিন্দু গ্রামবাসীরা খ্রীষ্টানদের সতর্ক করে যায় যে, আর কোনো খ্রীষ্টানকে কবর দেওয়া যাবে না। অতঃপর ঐ গ্রামের ২০০ খ্রীষ্টান পরিবার এসডিএম তহশিলদার, পুলিশ ও সরপঞ্চকে আবেদন করেন খ্রীষ্টানদের জন্য পৃথক কবরস্থানের ব্যবস্থা করার, কারণ তাঁরা সাধারণ গোরস্থান ব্যবহার করতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

৪। ৬ জুন ২০১৬ সারদি বাঈ-এর স্বামী সুখদেব নেতম মারা গেলেন এবং হিন্দু গ্রামবাসীরা খ্রীষ্টান গ্রামবাসীদের তাঁর শেষকৃত্য পালন ও কবর দেওয়ায় বাধা দিলেন ও হুমকি দিয়ে বললেন যে, যদি তাঁরা কবর দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে তাঁদের হত্যা করা হবে। এরপর আবার পুলিশের মাধ্যমে কবর দেওয়া হয় এবং সরপঞ্চ ও গ্রামবাসীরা হুমকি দেয় ভবিষ্যতে তারা বজরং দলকে ডাকবে যদি খ্রীষ্টানরা কবরস্থান ব্যবহার করার চেষ্টা করেন।

৫। অম্বিকাপুর জেলায় জেপুর থানার বারিয়ো চৌকির আরা গ্রামে ৫ জুন ২০১৬ রবিবার বজরং দলের ২৫ জনের বাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিল ছোটু জয়সোয়াল, সোনু গুপ্তা, বিপিন গুপ্তা, ছোটু গুপ্তা ও অন্যান্যরা, একটি গীর্জায় প্রার্থনার সময় হামলা চালায়। তারা গীর্জায় ভাঙচুর করে, যাজককে ও তাঁর স্ত্রী সহ অন্যান্য তিনজনকে মারধোর করে। তারা এই ঘটনার ভিডিও ছবি তোলে ও সেটি ছড়িয়ে পড়ে নানাদিকে। টীমের কাছে তার কপিও আছে। যাজক ও তাঁর স্ত্রী সহ অন্যান্য তিনজনকে বারিয়ো চৌকিতে টেনে নিয়ে আসে এবং রাত পর্যন্ত আটকে রাখে। কোনো এফ আই আর দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে হয়নি। উল্টে ঐ যাজকের বিরুদ্ধে ২৯৫এ ধারায় মামলা দায়ের হয় এবং তিনি এখনও পর্যন্ত কোনো জামিন পাননি।

৬। সিরিসগুড়া গ্রামে খ্রীষ্টানদের রেশন বন্ধ করা হয়েছে, খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের ও খ্রীষ্টানদের পেটানো হয়েছে, গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে দেওয়া হয়নি, আহত খ্রীষ্টানদের জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা বন্ধ করা হয়েছে। বহু চেষ্টার পর একটি মামলা রুজু করা হয়েছে কিন্তু আহতদের জবানবন্দি আদালতে এখনও পাঠানো হয়নি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের বাধায় খ্রীষ্টানদের গ্রামে পাম্পের জলের সুবিধা বন্ধ করা হয়েছে। জেলাশাসকের আহুত একটি মিটিংয়ে ভিএইচপি, বজরং দল বলে যে, খ্রীষ্টানরা যদি 'ঘর ওয়াপসি' (ধর্মান্তকরণ)-তে সম্মত না হয় তাহলে তাদের পঞ্চায়েত আইনের ১২৯(জি) ধারা লাগু করে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

রাওঘাট মাইনসের অরণ্যের অধিকারকে লঙঘন করার জন্য প্রতিরোধী গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার ও ভীতি প্রদর্শন ঃ

১। কাঁকের জেলার আন্তাহগড় থানার কোহচি গ্রামের রাজকুমার দাররো বললেন, রাওঘাট মাইনসের জন্য ২৫ হেক্টর জমি, গ্রামবাসীদের, গ্রাম পঞ্চায়েতের, বা গ্রাম সভাকে কোনো কিছু না জানিয়ে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। (সরকারিভাবে রাওঘাট মাইনস ও তৎসংলগ্ন বাঁধ এবং রেলওয়ে লাইন ভিলাই ইস্পাত কারখানার। কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানির একটি গোষ্ঠী এই মাইনিং প্রকল্পের সাথে যুক্ত হবে)। যথেচ্ছ গাছ কাটা হচ্ছে, ৫০ বছর ধরে আদিবাসীদের ভোগ করে আসা বনাঞ্চলের দখল নেওয়া হচ্ছে, আদিবাসীদের উপাসনার বহু জায়গা ধ্বংস করা হচ্ছে, এমনকি তাদের কবর দেওয়ার নির্দিষ্ট জায়গাগুলোও কোম্পানিরা দখল করছে। ঐ এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে সি আর পি এফ ক্যাম্প তৈরি হয়েছে। মে মাসে অন্য একটি তথ্য অনুসন্ধানী দলের কাছে মুখ খোলার জন্য রামকুমার ভারো নামক জনৈক ব্যক্তিকে একজন এসডিপিও মাওবাদী অভিযোগে জেলে বন্দি করার হুমকি দিয়েছেন।

২। দুকরা সিং-এর কন্যাকে একজন এসপিও ধর্ষণ করে ফলে কন্যাটির একটি সন্তানও হয়। কোনো মামলাই দায়ের করা যায়নি। ঐ এসপিও ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেব বলে মাত্র ২৫ হাজার টাকা দিয়েছে।

ভুয়ো সংঘর্ষ ঃ

১। নাগলগুড়া, থানা গড়িরাস, তেহসিল কুয়াকোন্ডা জেলা দান্তেওয়াড়া— চারজন মহিলা— রামে, পান্ডি, সুন্নো এবং মাসে ২১ নভেম্বর ২০১৫ ভুয়ো সংঘর্ষে নিহত হন। বদ্রু নামে একজন প্রাক্তন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করার পর 'প্রধান আরক্ষক' হয় ও ঐ হত্যাকারী বাহিনীর দলে যোগ দেয় এবং মাসেকে হত্যা করার আগে ধর্ষণ করে। ২২ জন ডি আর জি জওয়ানকে এই সংঘর্ষের জন্য পদোন্নতি করা হয় এবং পুরস্কার প্রদান করা হয়। অথচ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সংঘর্ষের জন্য পুরস্কার দেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ, এবং সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশকেও তা লঙঘন করে।

২। সুকমা জেলার দোরনাপাল তেহশিল, গ্রাম আরলামপল্লি— গ্রামবাসীরা তদন্তকারী টীমকে বললেন, ৩ নভেম্বর ২০১৫ তিনটি যুবককে— দুধি ভীমা (২৩ বছর), সোধি মুয়া (২১ বছর) এবং ভেট্টি লাকছু (১৯ বছর) পুলিশ হত্যা করে। দুটি সাইকেল করে তারা ভোরবেলায় তাড়ি আনতে যায়। এরপর তারা পেলামপল্লি বাজারে যায় যেখানে ভীমার মা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গ্রামের কাছেই 'নালা'-তে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে ভেট্টি লাকছু এবং অন্য দুজন এগিয়ে যায়। নিরাপত্তা কর্মীরা কাছেই চিরুণি তল্লাশি চালাচ্ছিলেন এবং ঐ দুই যুবককে মারধর করে। ভেট্টি লাকছু তাই দেখে দৌড়ে পালাতে যায় এবং পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। সঙ্গী দু'জন যুবক ভেট্টির লাশ পেলামপল্লি থানায় বয়ে নিয়ে আসার পথে পুলিশ তাদেরও গুলি করে হত্যা করে। কোনো এফ আই আর এক্ষেত্রে নথিভুক্ত করা হয়নি।

৩। পালামাগড়ু, তেহশিল দোরনাপাল, জেলা সুকমাঃ পুলিশের বয়ান অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ প্রায় একঘন্টার গুলি বিনিময়ের পর দু'জন মহিলা মাওবাদী নিহত হন। স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত পুলিশের বয়ান অনুযায়ী ঐ দু'জন নকশালপন্থী মহিলা শাড়ি পড়ে ছিলেন বলে দৌড়ে পালাতে পারেননি এবং তার জন্য তাঁরা একটি গর্তে পড়ে যান ও নিহত হন। অনুসন্ধানী টীম জানতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে দু'জন বালিকাকে পুলিশ ঠান্ডামাথায় হত্যা করেছে। সিরিয়াম পুঞ্জে (১৪ বছর)-র মা বলেন

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

যে তাঁর কন্যা মানজম শান্তি (১৩ বছর) সঙ্গে মুরগিদের চরাতে নিয়ে গিয়েছিল এবং নদীতে স্নান করতে যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের গুলি করে হত্যা করে। মানজম শান্তির বাবা বলেন, ওরা দু'জনেই গ্রামে বাস করত এবং মাওবাদীদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

৪। বিজাপুর জেলার কাদেনার গ্রাম— পুলিশের বয়ান অনুযায়ী ২১ মে ২০১৬, ৩০-৩৫ জন সশস্ত্র মাওবাদীর সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং এক দম্পতি— মনোজ হাপকা ও তাঁর স্ত্রী পান্দী হাপকা তাঁতি নিহত হন। ঐ গ্রামে পান্দী হাপকার মা এবং ভাই টীমকে বলেন, রাত্রি ৮টার সময় যখন রাতের খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল সেই সময় পুলিশ বাড়িতে আসে। তারা মনোজ এবং পান্দীকে তাদের জামা কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ১৩ হাজার টাকা— যেটা তারা অন্ধ্রে লঙ্কা চাষ করে রোজগার করেছিল— সব নিয়ে যায়। মনোজ ও পান্দী একবছরের জন্য মাওবাদী ছিল কিন্তু তা পাঁচ বছর আগে, বর্তমানে তারা মাওবাদী দল ছেড়ে গ্রামে ফিরে চাষবাস করছিল। পান্দী যক্ষা রোগে ৫ বছর ধরে আক্রান্ত এবং খুব অসুস্থ ছিল।

ভুয়ো মামলা এবং যথেচ্ছ গ্রেপ্তার ঃ

সুকমা জেলার গড়িরাস থানা, পান্ডিয়া গ্রামে ২১ মে ২০১৬ সকাল ৯টার সময় ২০০-৩০০ জনের পুলিশ বাহিনী এসে গ্রামের একটা জলাভূমিতে কর্মরত গ্রামবাসীদের গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে পুলিশ বলে— তারা নাকি এসারের পাইপ লাইন ১৯ মে ২০১৬-তে ভেঙ্গে ফেলেছে। ১১ জন আদিবাসীর মধ্যে ২ জনকে ছেড়ে দিয়ে ৯ জনকে জেলে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রতিবেদকদের টীম পৌঁছানোর আগের রাত্রে পুলিশ ঐ গ্রামের সরপঞ্চ মাদকম হাদমাকে পুলিশের উর্দি পরিয়ে তাদের সাথে নিয়ে ঐ গ্রাম থেকে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। এইভাবে ঐ সরপঞ্চকে পুলিশের এজেন্ট সাজিয়ে তাঁকে মাওবাদীদের আক্রমণের টার্গেট করে তোলে।

ঐ একই গ্রামে ১২ বছরের ছেলে যোগাকে ১২ মে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। টীম পরে জানতে পারে যে যোগার বাবা ও ভাইদেরও পুলিশ থানায় সাতদিন ধরে আটকে রেখেছে এবং তাদের দিয়ে থানার বাসন ধোয়া ও অন্যান্য সাফাইয়ের কাজ করানো হচ্ছে। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। টীম পৌঁছানোর আগের রাত্রে যোগার বাবাকে এবং অন্য তিনজনকে থানার হেফাজতে নেওয়া হয়। গড়িরাম থানার এসএইচও বললেন, যোগার বোন একজন মাওবাদী 'মহিলা কমান্ডার' তাই বারংবার গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ওদের। কিন্তু প্রায় ১৫০ জন গ্রামবাসী বলেন যে এটা সত্যি নয় এবং ওর বোন গ্রামেই বাস করে। টীম যোগার বোনের নিরাপত্তার জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে তাকেও হয়ত মাওবাদী নাম দিয়ে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করা হবে। সরপঞ্চও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন যে তাকেও হয়ত হত্যা করা হবে।

নাবালিকাকে সিআরপিএফের ধর্ষণ ঃ

দান্তেওয়াড়া থানার পোদুম গ্রামে ১৪ বছরের বালিকাকে ৮ জুন ২০১৬ তাঁর দোকান বন্ধ করার সময় একজন সিআরপিএফ জওয়ান ধরে এবং ঐ দোকানের মধ্যে সারারাত ধরে ধর্ষণ করে। সে তার জামাইবাবুকে ঘটনাটি জানায় এবং তিনি থানায় অভিযোগ নথিবদ্ধ করেন। পরে বালিকাটির ডাক্তারি পরীক্ষা হয় ১১ জুন ২০১৬। এটি সম্ভব হয় সোনি সোরি ও প্রতিবেদক টীমের হস্তক্ষেপের ফলে। সি আর পি এফ জওয়ানটি তার নাম জানায় আর আর নেতম— তার সার্ভিস নম্বরও জানায়— কিন্তু পরে দেখা যায় ঐ নাম ও নম্বর ভুয়ো।

ভুয়ো আত্মসমর্পণ ঃ

টীম চিন্তলনার গ্রামে পরিদর্শনে জানতে পারেন ৫০টি আত্মসমর্পণের ঘটনা। একজন ছোট ব্যবসায়ী বলেন তাকে পোলামপল্লি থানায় একজন এসপিও ডেকে পাঠায় এবং জানায় যে তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। সেখানে গেলে তাকে ও অন্যান্য ২৫ জনকে বলা হয় যে তারা আত্মসমর্পণ করুক নতুবা তাদের নামে ২ বছর আগে নিহত এসপিও নাগেশের হত্যার মামলায় অভিযুক্ত করা হবে। ঐ ব্যবসায়ীর বয়স ৫৫ বছর এবং তিনি বলেন অন্যান্য ২৫টি আত্মসমর্পণের ঘটনাও সত্যি নয়। তাদের প্রত্যেককে ঘটনাস্থলেই দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। অন্যান্য অনেকেই ভুয়ো আত্মসমর্পণের কথা বলেন। তারা প্রত্যেকেই মাওবাদীদের প্রত্যাঘাতের আশঙ্কাও করছেন।

গ্রামের পরিস্থিতি ঃ

এআইপিএফের দুটি টীম ১৬৫০ কিলোমিটার পরিদর্শন করেন। তাঁদের ৬০টির বেশি পুলিশ এবং সিআরপিএফ ক্যাম্পের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যে ২৫টি গ্রামে তাঁরা গিয়েছেন সেখানে নজরে পড়েছে যে, সেখানের গ্রামবাসীরা নিরাপত্তাহীনতা ও একে অন্যের প্রতি সন্দেহপ্রবণতায় ভুগছেন। এই চারটি জেলায় রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠন প্রায় নিষ্ক্রিয় এবং তারা বলেছেন এখানে গণতন্ত্রের সুযোগ সঙ্কুচিত। বেশিরভাগ গ্রামেই বিদ্যুৎ ও রাস্তা নেই, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ নেই। কেতুলনার গ্রামে অঙ্গ নওয়াড়ির দেওয়া দুধ খেয়ে দুটি শিশুকন্যা মারা যায়। টীমের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ঐ গ্রামে ৮ জন মিতানিন রয়েছে যাদের কাছে পেটের রোগের ও বমির চিকিৎসার কোনো ওষুধ নেই। হাসপাতাল ১০ কিলোমিটার দূরে এবং এই কারণে ঐ শিশুকন্যা দুটি মারা যায়। এই ঘটনার পর ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু ঐ দুধ যোগানদারের বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় নরহত্যার মামলা এখনও রুজু করা হয়নি।

মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী মহিলারা করে দেখালেন—

নর্মদা অববাহিকায় মধ্যপ্রদেশের দেয়াশ এলাকায় 'সমাজ প্রগতি সহযোগে'র সহায়তা দরিদ্র প্রান্তিক আদিবাসী মহিলা কৃষকদের নিয়ে ২০১১ সালে তৈরী হল 'রাম রহিম প্রগতি প্রোডিউসার কোম্পানী লিমিটেড (আর পি সি এল)। শুরু হল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে আধুনিক পদ্ধতিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার মুক্ত জৈব চাষ। সাফল্যের পর ২০১৪-তে সরকারি গ্রান্ট পাওয়া গেল এবং সরাসরি ভাল দামে এন.সি.ডি.ই. এলের মাধ্যমে বিক্রি সুযোগ এল। ৩৫২টি গ্রামের ২,৬০০-র বেশী মহিলা যুক্ত হলেন। ২০১৫-এ উৎপন্ন হল ৪০,০০০ কুইন্টাল সোয়া, ভুট্টা, তুলো, ছোলার ডাল, গম, মুসুর ডাল, জোয়ার, লঙ্কা প্রভৃতি।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

খবরাখবর

● গুজরাটে প্যাটেলদের সংরক্ষণ আন্দোলনের পর হরিয়ানার জাঠদের সংরক্ষণ নিয়ে জঙ্গী আন্দোলন সামলাতে বিজেপি শাসিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বেসামাল। সর্বদল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। অগ্নি সংযোগ, লুঠপাট, ভাঙচুর, রেল রোকো, রাস্তা রোকো, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস প্রভৃতি সামাল দিতে সরকারকে সেনা নামাতে ও দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিতে হয়। বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের মৌখিক আশ্বাসকে গুরুত্ব না দিয়ে 'অল ইণ্ডিয়া জাঠ আরক্ষণ সংঘর্ষ সমিতি'-র আহ্বায়ক যশপাল মালিক এই আন্দোলন পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের জাঠ বলয়ে ছড়িয়ে দিতে চান। হরিয়ানার জিন্দ, হিসার, হানসি, সোনিপত, রোহতাক, ঝর্ঝর, গোহনা প্রভৃতি এলাকায় বিক্ষোভ ব্যাপকতা লাভ করে। পাঞ্জাবী সম্প্রদায় আক্রান্ত হয়ে জাতিদাঙ্গার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বেশকিছু সম্প্রদায় জাঠদের অতিরিক্ত সংরক্ষণ প্রদানের বিরোধিতা করেন। হরিয়ানার জনসংখ্যার ২৭% জাঠ এবং রাজ্যের ১০ জন মুখ্যমন্ত্রীর সাতজন জাঠ। মূলত কৃষিজীবী হলেও সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীতে তারা প্রচুর পরিমাণে রয়েছেন। এখন তারা সরকারি চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে ওবিসির আওতায় সংরক্ষণের অংশীদার হতে চান। ১৯৯১-তে গুরনাম কমিশন, ২০০৪-এ হুডা সরকার এবং ২০১২-তে কে.সি. গুপ্ত কমিশন সুপারিশ করলেও এবং হুডা সরকার ১০% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেও তা সুপ্রীম কোর্টে খারিজ হয়ে যায়। এবারও কোর্ট খারিজ করলে জাঠরা পুনরায় আন্দোলন শুরু করেছেন।

● ফেব্রুয়ারী'১৬-এ জাঠদের সংরক্ষণের দাবীতে সমগ্র হরিয়ানা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত, তখন নতুন করে পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবীতে 'গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ এসোসিয়েশন (GCPA)'-র লাগাতার রেল রোকো উত্তরপূর্ব ভারতকে দেশের বাকি অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যাত্রীদের প্রবল দুর্ভোগ ঘটে, তিনজন মারা যান। অবশেষে তিনদিন বাদে পুলিশ অবরোধ তোলে। আন্দোলনকারীরা পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাদের দাবীকে তুলে ধরতে চান। ১৯৯৮ সালে GCPA-র প্রতিষ্ঠা। কোচবিহারের ভারতভুক্তি চুক্তি অনুসারে কোচবিহারকে 'গ' শ্রেণীর রাজ্যে পরিণত করার দাবীতে আন্দোলন। এই আন্দোলনের অন্তস্থলে ছিল কোচবিহার এবং সেখানকার রাজবংশী প্রভৃতি জনজাতির ব্যাপক পশ্চাদপদতা, দারিদ্র, বেরোজগারী, কৃষিতে সঙ্কট এবং ন্যূনতম পরিকাঠামো ও নাগরিক সংস্থানের অভাব। এর সাথে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবহেলা এবং কামতাপুর আন্দোলনের ব্যর্থতা। ২০০৫ সালে কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে অনশন, ধরনার চকচকা ও খাগরাবাড় এলাকায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে দুই আন্দোলনকারী ও তিন পুলিশের মৃত্যু এবং ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে আসা GCPA-র সম্পাদক বংশীবদন বর্মনসহ ৪৩ জনের গ্রেফতার ও ২০১৫ অবধি কারাবরণ।

● ব্রাহ্মণ্যবাদ, মনুবাদ ও পুরুষতন্ত্র ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এখনও প্রবলভাবে প্রকট। কেরলের সবরিমালা থেকে মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরের শনি সিংনাপুর মন্দির প্রতিটির ক্ষেত্রে এখনও মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। অতীতের বহু সমাজসংস্কারক থেকে সদ্য হিন্দুত্ববাদীদের হাতে খুন হওয়া ডাঃ নরেন্দ্র দাভালকার পর্যন্ত অনেকেই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন গোঁড়া ধর্মরক্ষকদের কাছে। সম্প্রতি শনি সিংনাপুর মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ ও মহিলা পুরোহিত নিয়োগের দাবীতে আন্দোলন করে গ্রেফতার হলেন ত্রুপতি দেশাই এবং 'ভূমাতা রংরাগিনী ব্রিগেডের' কর্মীরা। অন্যদিকে মুম্বাইয়ের 'হাজি আলি দরগায়' মহিলাদের প্রবেশের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেছে 'ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন'।

● বাংলাদেশে জেএমবি—জামাত—আইএস মৌলবাদী চক্রের হত্যালীলা ক্রমশ বাড়ছে। রংপুর ও রাজশাহীতে দুই জাপানী ও ইতালী নাগরিককে হত্যা, বগুড়া ও ঢাকায় শিয়া মসজিদে আক্রমণ ও হত্যা, চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়ে হিন্দু মন্দির আক্রমণ ও হত্যা একের পর এক ঘটনা পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘটে চলেছে। এর প্রতিবাদে 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ' প্রমুখ সংগঠন আন্দোলন শুরু করেছেন।

● সাঁওতালি ভাষায় শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' (সাঁওতালিতে 'বাপলানিজ') অনুবাদ করে অনুবাদ সাহিত্যে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার ২০১৬ পেলেন ঝাড়খণ্ডের জামসেদপুরের টাটা মেন হাসপাতালের নার্সিং কর্মী তালা টুডু। তার পরবর্তী প্রকল্প 'বড়দিদি', 'দত্তা', 'চরিত্রহীন', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি অনুবাদ করা।

● ১৮তম মার্সার কোয়ালিটি অফ লাইফ স্টাডি যা বিশ্বের ২৩০টি বৃহৎ শহরের আর্থ-সামাজিক বাসযোগ্যতা বিশ্লেষণ করে সেরা ঘোষণা করেছেন ১৮ লক্ষ জনসংখ্যার অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাকে। এরপরে রয়েছে জুরিখ (সুইজারল্যাণ্ড), অকল্যাণ্ড (নিউজিল্যাণ্ড), মিউনিখ (জার্মানী), ভ্যাঙ্কুবার (কানাডা), ডুসেলডর্ফ (জার্মানী) ও ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানী)। ভারতের কোন শহর প্রথম একশোয় আসেনি। ভারতের প্রধান শহরগুলির স্থান ঃ হায়দ্রাবাদ (১৩৯), পুণে (১৪৪), ব্যাঙ্গালুরু (১৪৫), চেন্নাই (১৫০), মুম্বাই (১৫২), কলকাতা (১৬০) ও দিল্লী (১৬১)।

● টাটার একলাখি ন্যানো প্রকল্প প্রথম থেকেই বিঘ্নসঙ্কুল। তীব্র গণআন্দোলনের ফলে টাটাকে পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর থেকে হাত গুটিয়ে গুজরাটের সানন্দে চলে যেতে হয়। সময়মত গাড়ি বের করা যায়নি, গাড়ির মডেল পাল্টাতে হয়, দাম বাড়াতে হয়, সবচেয়ে বড় কথা টাটার ন্যানো গাড়িটি সেভাবে বাণিজ্য সফলতা পায় না। সম্প্রতি সানন্দে সাসপেণ্ড হওয়া ২০ জন সহকর্মীকে কাজে ফেরাতে ৩০০ জন কারখানা কর্মী ধর্মঘট করায় কারখানা অচল হয়ে পড়ে।

● মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন আই.জি. অফ পুলিশ এস. এম. মুশারিফ 'হু কিলড্ হেমন্ত কারকারে?' লিখে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু করে দিয়েছেন। তার মতে আই.বি. ও আর.এস.এস.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

যোগসাজশে ২০০৩ থেকে ২০০৮ অবধি ভারতের বহু জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তার দাবী মালিগাঁও কাণ্ডে কারকারে এই চক্রান্ত ধরে ফেলেন এবং বেশকিছু অভিযুক্ত আর.এস.এস. নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেন। এর প্রতিশোধ নিতে তারা ২৬/১১ হামলায় ষড়যন্ত্র করে কারকারেকে হত্যা করে। ব্যালাস্টিক রিপোর্ট বলছে, যে বুলেটে কারকারের মৃত্যু হয়, তা কাসভের বন্দুকের নয়।

● ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫০ প্রশিক্ষিত উদ্ধারকারী দল সিয়াচেন হিমবাহে ১৯৫০০ ফুট উচ্চতায় – ৫৫° সেলসিয়াস ঠাণ্ডায় ৫০ ফুটের বেশী পুরু কনক্রিটের চাইতে শক্তিশালী নীল বরফের চাদর খুঁড়ে তুষারধ্বসে চাপা পড়ে থাকা ভারতীয় সেনাজওয়ানদের নটি মৃতদেহ এবং মৃতপ্রায় ল্যান্সনায়েক হনুমান থাপ্পা কোবাড়ের দেহ উদ্ধার করলেন পাঁচ দিনের প্রচেষ্টায় গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬-এ। সম্ভবত কোন এয়ারপকেটে পড়ে হনুমান থাপ্পা বেঁচে ছিলেন। পরে হাসপাতালে মারা যান।

● সাচার কমিটির রিপোর্ট যেমন কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছিল, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবীর বিপরীতে 'প্রতীচী', 'অ্যাসোসিয়েশন স্ন্যাপ' ও 'গাইডেন্স গিল্ড'-র রিপোর্টের ভিত্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন জানালেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা বঞ্চিত ও দরিদ্র।

● ২০১৫-এর কেরালা লিটারেটার ফেষ্ট ও কলকাতা লিটারেটার ফেষ্টে অসহিষ্ণুতার বিষয়টি বারেবারে উঠে এসেছিল। দাদরিকাণ্ড থেকে রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার ঘটনা, অধ্যাপক কালবুর্গির মৃত্যু বারবার ছায়া ফেলছিল বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে। কলকাতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশোক বাজপেয়ী, অমল পালেকর, অমিতাভ ঘোষ, ত্রিদির সুহৃদ প্রমুখ। কোঝিকোডের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গীতা হরিহরণ, প্রতিভা রায়, বাসুদেবন নায়ার, অনিতা নায়ার, জয়শ্রী মিশ্র, মীনা কুণ্ডাস্বামী, লীনা মানিমেকালাই, অশোক বাজপেয়ী প্রমুখ।

● ২৯ ফেব্রুয়ারী'১৬ ইম্ফলের একটি আদালত তাঁকে আত্মহত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু তার দুদিনের মাথায় ইরম শর্মিলা চানুকে ফের গ্রেফতার করা হয়। সেনাবাহিনীর হাতে থাকা বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা) রদের দাবী জানিয়ে ২০০০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত লাগাতার অনশন করেছেন চানু।

● গত ১ মার্চ'১৬ তাদের বিভিন্ন দাবী ও বকেয়া নিয়ে 'আশা', 'আই.সি.ডি.এস.' ও 'মিড ডে মিল' কর্মীরা দিল্লীর বুকে জোরালো মিছিল করলেন। একইদিনে তাদের প্রতি দীর্ঘ বঞ্চনা ও বেশকিছু দাবী নিয়ে কলকাতার রাজপথে মিছিল করলেন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

● পর্যাপ্ত পানীয় জলের দাবীতে কৃষকদের ব্যাঙ্গালুরু অভিযানে পুলিশ কর্তৃক যথেচ্ছ লাঠিচার্জের প্রতিবাদে কর্নাটক জুড়ে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে। ৪ মার্চ'১৬ কোলার ও চিকবল্লারপুর জেলায় সর্বাত্মক বন্ধ সংগঠিত হয় এবং জাতীয় সড়কগুলি অবরোধ করা হয়। 'শাশ্বত নিরাভরী হোরাতা সমিতি', 'কর্নাটক রাজ্য রায়তা সংঘ' এবং 'হাসিরু সেনে'সহ বিভিন্ন সংগঠন এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

● তামাক চাষ, যা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি দ্রব্য ও যার থেকে বছরে ৬০০০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা আয় হয়, তার প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও কঠোর বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে 'অল ইণ্ডিয়া ফারমারস্ এসোসিয়েশন (এফ.এ.আই.এফ.এ.) '-র নেতৃত্বে তামাক চাষীরা দিল্লীর যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ দেখালেন।

● ২০১৩-তে মুজঃফরনগরে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয় এবং যাতে ৬০ জনের মৃত্যু হয় ও ৬০ হাজার মানুষ গৃহহীন হন, তার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি বিষ্ণু সাহাইকে নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের এতদিন পরে বেরোনো রিপোর্টে উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির সরকারকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, শাস্তির কোনো উল্লেখ নেই ইউটিউবে বিকৃত ভিডিও ছড়ানো বিজেপি সাংসদ সঙ্গীত সোমের এবং উত্তেজনা ছড়ানো বক্তব্যের জন্য বিএসপি সাংসদের। সব দোষ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সরকারি আধিকারিকদের ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে ব্যর্থতার জন্য এবং প্রিন্ট মিডিয়াকে গুজব ছড়ানোর জন্য।

● মোদি সরকারের তথাকথিত জনমুখী বাজেটে এমনিতেই যৎসামান্য বরাদ্দ থাকা স্বাস্থ্য বাজেটের ২০% আরও হ্রাস করায় এবং 'রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবারকিউলোসিস কনট্রোল প্রোগ্রাম (আর.এন.টি.সি.পি)'-র বরাদ্দ হ্রাস পাওয়ায় দেশজুড়ে ব্যাপক সংখ্যক গরিব যক্ষ্মা রোগীদের বিশেষ করে এম.ডি.আর. ও এক্স.ডি.আর. যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা সংকটের মুখে পড়েছে। একই অবস্থা দুঃস্থ এইডস্ ও অন্যান্য সংক্রামক ও জটিল রোগে ভোগা নাগরিকদের।

● সুন্দরলাল বহুগুণার ভাষায় বর্তমান গঙ্গা যদি হয় কলুষিত অশ্রুনদী তাহলে যমুনার অবস্থা আরও করুণ। খোদ রাজধানীর বুকে তিরতির করে বইয়ে যমুনার আবর্জনা ও বর্জ্যবাহিত কালো জল। আর সমগ্র নদীগর্ভে, যার বেশীটাই এখন শুখা, অবৈধ নির্মাণসহ চলছে হরেক প্রকৃতি ও পরিবেশ বিরোধী কাণ্ডকারখানা। কংগ্রেস সরকারের আমলে এখানে গড়ে উঠেছে বিশাল এলাকা নিয়ে অক্ষরধাম মন্দির কিংবা কমনওয়েলথ গেমস্ ভিলেজ। আর বিজেপি সরকারের বদান্যতায় হয়েছে ধর্মগুরু রবিশঙ্করের 'দ্য আর্ট অফ লিভিং' সংস্থার 'ওয়ার্ল্ড কালচারাল ফেষ্টিভাল'। মোদীজী এতেই থামেননি, তিনি এই কাজে সামরিক বাহিনী নামিয়ে দুটি আপৎকালীন পন্টুন ব্রীজ বানিয়েছেন। রাষ্ট্রের প্ররোচনায় উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধানা নদী যমুনা হত্যা চলছেই। এর জন্য 'স্বরাজ অভিযান' নেতা প্রশান্তভূষণ কেন্দ্র ও দিল্লী সরকারের সমালোচনা করেছেন।

● দক্ষিণ গুজরাটে অবস্থিত কাকরাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি রিএক্টর থেকে লিক শুরু হওয়ায় ১১ মার্চ'১৬ থেকে কাকরাপুর কেন্দ্র বন্ধ রাখা হয়। কর্মীদের উপর এবং পরিবেশে

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

এর প্রভাব এখনও জানা যায়নি।

● জলের জন্য আজকের দুনিয়ায় নিরন্তর হাহাকার ও সংঘর্ষ। একদা পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাবে পশ্চিম দুনিয়ার বহুজাতিক সংস্থাদের মুনাফাদারীর 'সবুজ বিপ্লব' নামক খোদার উপর খোদকারী করা কর্মকাণ্ডের ফল হিসাবে পাঞ্জাব এখন জলশূন্য। তাই শতদ্রু-যমুনা সংযোগকারী খালের (SYL) দখলকারী নিয়ে পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের সাথে হরিয়ানা রাজ্য সরকারের নিরন্তর কলহ শুরু হয়েছে।

● ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণায় আদানি গোষ্ঠীর ১,৬০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ বাংলাদেশে বিক্রির বিষয়ে চুক্তিপত্র প্রকাশ করার দাবীতে ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় বিরোধীরা সরব হয়েছেন।

● মেক্সিকো ভারতের রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছে। তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লডিয়া রুইজ মাসিউ বলেন যে আরেকজন ভেটো দেওয়ার সদস্য বৃদ্ধি মানে রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যকলাপকে আরও পঙ্গু করে দেওয়া। বরং ভারত দীর্ঘকালীন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার উদ্যোগ নিক।

● এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৈরিকিকরণ কর্মসূচী যখন ক্রমশ আগুয়ান, উপাচার্য থেকে ছাত্রদল সর্বত্র যখন সংঘ পরিবারের নির্দেশ পালিত হচ্ছে, সেই সময় স্বাধীনতার পর প্রথম ছাত্র সংসদের মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়ে এবং কর্তৃপক্ষ ও 'এ.বি.ভি.পি.'-র মৌলবাদী ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আক্রান্ত হয়েও প্রতিরোধ গড়ে তুলে রিচা সিংহ তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

● সীমান্ত থেকে ১,৫০০ কি.মি. পর্যন্ত সঠিক সময় ও স্থান নির্ণয়ের জন্য শ্রীহরিকোটার 'ধাওয়ান স্পেস সেন্টার' থেকে 'পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (পি.এস.এল.ভি.সি.-৩২)'-র মাধ্যমে ভারতের ষষ্ঠ 'ইণ্ডিপেন্ডেট রিজিওনাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম (আই. আর. এন. এস. এস.-ওয়ান এফ.)' সফলভাবে উৎক্ষিপ্ত হল।

● কেরলের মুন্নারের চা বাগিচায় সাড়া ফেলে দেওয়া মহিলাদের ট্রেড ইউনিয়ন 'পেঙ্গাল ওট্টুমাই থোট্টাম থোঝিলালি' ডেভিকুলাম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে চলেছে। নেতৃত্বের তরফ থেকে লিসি সানি ও রাজেশ্বরী জানিয়েছেন।

● গুগুল নির্মিত 'ইউটিউটিভ আরটিফিসিয়াল ইনট্যালিজেন্স' নির্ভর সুপারকম্পিউটার দক্ষিণ কোরিয়ার গো খেলার চ্যাম্পিয়ন গ্রাণ্ডমাস্টার লি সিডলকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পাঁচ গেমের সিরিজে হারিয়ে দিল।

● ২০০৭ পর্যন্ত তার এ বিষয়ে তেমন ধারণা ছিল না। এরপরই পাচার হওয়া একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন এবং সাহসের সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তারপর ইতিহাস। তিনি ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলা পুলিশের 'অ্যান্টিট্রাফিকিং ইউনিট'-এর ইন্সপেক্টর আরাধনা সিংহ। এরপর তিনি অসংখ্য মেয়েকে উদ্ধার করেন, ঐ অঞ্চলের নারী ও শিশু পাচারকারী চক্রগুলি ভেঙ্গে দেন এবং পান্নালাল, লতা লাকড়া প্রমুখ পাচারকারী চাঁইদের গ্রেফতার করেন।

● ৫৭টি দেশের ১১০০০ প্রতিযোগীকে হারিয়ে চীন দেশের গণনা পদ্ধতি অ্যাবাকাসে বিশ্বসেরা হলেন কলকাতার বাঘাযতীনের বাসিন্দা এবং বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনের ছাত্রী মৌবনী সরকার।

● 'আমেরিকান ফিজিওলজিকাল সোসাইটি সিলেক্ট' জার্নালে বিজ্ঞানী অনুরাগ আগরওয়াল জানিয়েছেন যে দেহে ইনসুলিন বৃদ্ধির সাথে ফুসফুসের কোষের ধ্বংসের সম্পর্ক আছে। ফলে ডায়াবেটিস হলে ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে।

● বলপূর্বক তিব্বতকে চীনের দখলদারীর অভিযোগের প্রতিবাদে আরেকটি তাজা প্রাণ চলে গেল। দেরাদুনে নিজেকে আগুনে জ্বালিয়ে আত্মাহুতি দিলেন প্রতিবাদী তিব্বতী ১৬ বছরের তরুণ দোরজি শেরিং। অন্যদিকে তালিবানসহ অন্যান্য মৌলবাদী শক্তিদের আফগানিস্থান দখলের প্রাক্কালে ভারতে পালিয়ে আসা আফগান উদ্বাস্তুরা বিক্ষোভ দেখালেন রাষ্ট্রপুঞ্জের অবহেলার অভিযোগে।

● ক্রমাগত অরণ্য-পাহাড় ধ্বংসের ফলে খাদ্য ও আশ্রয়স্থলের অভাবে বিপন্ন, লাজুক ও বিরল দর্শন মেঘলা চিতাকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অসমের কামরূপ, গোলাঘাট, যোরহাট, লখিমপুর প্রভৃতি জেলার লোকালয়ে। মানুষের গণপিটুনিতে এদের অনেকের মৃত্যুও হয়েছে।

● জঙ্গল নির্ভর জনসমষ্টির জঙ্গলের অধিকার অর্জনে, 'ফরেষ্ট রাইটস্ অ্যাক্ট' প্রবর্তন করার দাবীতে এবং বনরক্ষী ও আধিকারিক কর্তৃক জঙ্গল নির্ভর জনসমষ্টির উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে 'এন.এ.পি.এ.', 'জন শ্রমজীবী সংঘ', 'নাগরিক মঞ্চ', 'দিল্লী ফোরাম' এবং 'অল ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন অফ ফরেষ্ট ওয়ার্কিং পিপল্' আন্দোলন শুরু করেছেন।

● দক্ষিণ চীন সাগরের পারাসেল দ্বীপপুঞ্জের উডি আইল্যাণ্ড, যার দাবীদার চীন, তাইওয়ান ও ভিয়েতনাম, চীন গত ৪০ বছর ধরে যার কর্তৃত্ব এবং সমগ্র দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে, সেখানে শক্তিশালী মিসাইল ইউনিট চালু করল। অন্যদিকে উঃ কোরিয়ার সামরিক-পারমাণবিক ও উপগ্রহ কর্মসূচীর প্রতিরোধে আমেরিকা দঃ কোরিয়ার ওসান বিমানঘাঁটিকে শক্তিশালী করছে এবং সীমান্তে 'থার্মাল হাই অলটিটিউড এরিয়া ডিফেন্স (থাড)' স্থাপন করেছে যার আওতা ১০০০ কি.মি.।

● চীন যখন নিকটস্থ মায়নমারের কোকোদ্বীপসহ বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে একের পর এক নৌঘাঁটি তৈরী করছে তখন ভারতীয় নৌসেনার দুই দশক আগেকার প্রকল্পও কার্যকরী হয়নি। ৭৫০ কি.মি. বিস্তৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলি ঃ ১ ও ২) ডিগলিপুর-শিবপুর ও ক্যাম্বেল বে এয়ারফিল্ডের সম্প্রসারণ, ৩) আই.এন.এস. জারোয়ার ভাসমান ডক, ৪) পোর্টব্লেয়ারে যৌথবাহিনীর কমাণ্ড, ৫) কার নিকোবরে বায়ুসেনা ঘাঁটি নির্মাণ এবং ৬) আই.এন.এস. কারদীপ নৌঘাঁটি নির্মাণ।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

● উষ্ণায়নের কারণে ২০১০ সালে কুমেরুর কেপ ডেনিসনের কাছে এক বিরাট হিমশৈল এসে আটকে যায়। জায়গাটা 'অ্যাডলি পেঙ্গুইন'-এর অভয়ারণ্য ছিল। ফলে গত ছয় বছরে দেড় লক্ষ পেঙ্গুইনের মৃত্যু হয়েছে।

● জীবনদায়ী ওষুধের উপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি শুল্ক ছাড় প্রত্যাহার করায় সমস্ত জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা গেছে।

● 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে স্তন ক্যানসার স্ক্রিনিং-এর ক্ষেত্রে ৫০ বছরের নীচে মহিলাদের 'ম্যামোগ্রাফি' পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। অল্পবয়সী ও ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের ক্ষেত্রে 'ম্যামোগ্রাফি' ফলস পজিটিভ, ওভার ডায়োগনসিস ও র‍্যাডিয়েশন ইনডিউসড ক্যানসারের জন্ম দিতে পারে।

● বিশিষ্ট প্যাথোলজিস্ট ডাঃ এরিক সুবা, যিনি ভিয়েতনামে প্যাপসমেয়ার কর্মসূচীর উদ্যোক্তা ছিলেন, মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল ও কে.ই.এম. হাসপাতালের কর্মশালায় তার বক্তব্যে জানান যে ভারতে অনুষ্ঠিত প্যাপসমেয়ার কর্মসূচী ত্রুটিপূর্ণ ছিল যার ফলে ২৫৪ জন নন-স্ক্রিনিং গ্রুপের কন্ট্রোল মহিলা মারা যান। বছরে ৭০ হাজার সারভাইকাল ক্যানসারে মৃত্যুর দেশ ভারতে ভিনিগার দিয়ে VIA স্ক্রিনিং পরীক্ষা বেশী কার্যকরী হতে পারে।

● নেপাল ও ভূটান সীমান্তে নিরাপত্তাদায়ী আধাসামরিক বাহিনী 'রাষ্ট্র সীমা বল (এস.এস.বি.)'-র প্রথম মহিলা ডিরেক্টর জেনারেল হলেন ১৯৮০ ব্যাচের আই.পি.এস. অর্চনা রামসুন্দরম্। এর আগে তিনি 'ন্যাশনাল ক্রাইমস্ রেকর্ড ব্যুরো'র ডিরেক্টর ছিলেন।

● গত দশ বছরে এম.জি.এন.আর.জি.এ. প্রকল্পের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের হার ঃ

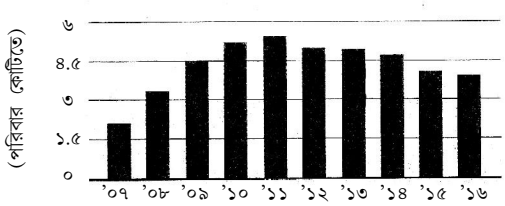

● 'সেন্টার ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট' সংস্থার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে কেরলের উপকূলাঞ্চলে সর্বগ্রাসী মানুষের ক্ষুধায় আর রাষ্ট্রের আগ্রাসী উন্নয়নের থাবায় ১৭টি ম্যানগ্রোভ অরণ্যভূমি সঙ্কটের পথে।

● সেই কবে কপিল ভট্টাচার্যের মত নদী বিশেষজ্ঞরা ধুলিয়ানে ভাগীরথীর উৎসমুখের আগে ফারাক্কায় ঐ জায়গায় ব্যারেজের বিরোধিতা করেছিলেন। এতে না হল ভাঙ্গন রোধ, না হল চর পড়া আটকানো ও জলের সুরাহা। একেই গঙ্গার নাব্যতা ও জলপ্রবাহ কমে গেছে, তার উপর বাংলাদেশকে দৈনিক ৩৫,০০০ কিউসেক জল দিতে গিয়ে শুখা মরশুমের শুরুতে ভাগীরথী-হুগলী মৃত্যুপথযাত্রী, কলকাতা-হলদিয়া বন্দর একেবারে মৃত্যুশয্যায়, জলের অভাবে ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

● কেন্দ্রীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষে ঃ

নারী ও শিশু পাচারে শীর্ষে (বছরে ১০৯৫টি মামলা)।

ধর্ষণের চেষ্টায় প্রথম (২০১৪তে ১৬৫৬টি মামলা)।

নারী নির্যাতনে দেশে দ্বিতীয় (২০১৪তে ৩৮,২৯৯টি মামলা)।

ধর্ষণে সাজা দেওয়ায় রাজ্য ২৮ নম্বরে (সাজার হার ১০.৩%)।

অপরাধীদের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে ২৮ নম্বরে (সাজার হার ১১%)।

● এবছরের শুখা মরশুমের শুরুতেই দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়া, জলস্তর নীচে নেমে যাওয়া এবং জলাধারগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া ও বিদর্ভ অঞ্চলের জেলাগুলিতে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

● অপারেশন ওয়েস্টএণ্ড বা তেহেলকা কাণ্ডে বঙ্গারুলক্ষ্মণসহ বিজেপি নেতৃত্বকে কুপোকাত করার প্রায় ১৫ বছর পর সাংবাদিক ম্যাথিউ স্যামুয়েল তার নারদ নিউজের মাধ্যমে স্টিং অপারেশন চালিয়ে ১৩ জন তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীর ঘুষ খাওয়ার দৃশ্য তুলে ধরে সাড়া ফেলে দিয়েছেন।

● বিহারের নীতিশকুমার সরকার ১ এপ্রিল'১৬ থেকে বিহারকে সম্পূর্ণ মদহীন রাজ্য ঘোষণাকে কার্যকর করলেন। গুজরাট, নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরামের পর বিহার চতুর্থ রাজ্য যেখানে মদ তৈরী, মদ বিক্রি ও মদ্যপান নিষিদ্ধ হল।

● দেশের অগ্রণী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবী যে মহিলাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের অন্যতম (৬০%) কারণ হল 'পলিসিস্টিক ওভেরিয়ান সিনড্রোম (পি.সি.ও.এস.)'।

● কেন্দ্রের মানব সম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনস্ র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এন.আই.আর.এফ.)' যে ক্রমতালিকা সম্প্রতি প্রকাশ করেছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রুপের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে নির্দিষ্টভাবে কানাইহাকুমার ও লোকান্তরিত রোহিত ভামূলাকে নিয়ে শিরোনামে থাকা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লী (জে.এন.ইউ.) ও হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। অন্য গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম দুটি—'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আই.আই.এস.) ব্যাঙ্গালুরু' ও 'ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল টেকনোলজি, মুম্বাই'। সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্বাচিত হল—আই.আই.টি., মাদ্রাজ আর সেরা ম্যানেজমেন্ট কলেজ নির্বাচিত হল 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজনেন্ট, ব্যাঙ্গালুরু'।

● জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন 'পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি'-র নেত্রী ডাঃ মেহবুবা মুফতি।

● ১৯১৫ সালে রেওয়ার মহারাজ গুলাব সিংহ জঙ্গলে প্রথম সাদা বাঘ দেখে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। ১৯২০ সালে ঐ সাদা বাঘটির মৃত্যু হয়। এরপর ১৯৫১ সালে গুলাব সিংহের পুত্র মার্তণ্ড সিংহ আরেকটি সাদা বাঘ জঙ্গলে পেয়ে তাকে ধরে গোবিন্দগড়ে নিয়ে আসেন। নাম দেন মোহন। বিজ্ঞানী ও পশু বিশেষজ্ঞরা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

গবেষণা করে দেখেন বিন্ধ্যাচলের এই সাদা বাঘ রয়াল বেঙ্গল টাইগারেরই একটি জিন পরিবর্তিত প্রতিরূপ। বন্ধ জায়গায় প্রজননের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় মোহনের বংশধররা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫-র পর মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল থেকে সাদা বাঘ হারিয়ে যায়। সম্প্রতি সরকার 'মুকুন্দপুর হোয়াইট টাইগার সাফারি' নতুনবার শুরু করলেন।

● মহারাষ্ট্র জুড়ে উপর্যুপরি কয়েকবছর খরা চলছে। মানুষ পানীয় ও গৃহস্থালির জল পাচ্ছেন না। জলাধার ও নদীগুলি শুকিয়ে গেছে। ভূজলস্তর অনেক নীচে নেমে গেছে। চাষের জলের জন্য হাহাকার। এদিকে কেন্দ্র ও মহারাষ্ট্র সরকার দৃকপাত করছেন না। অথচ নেতা-মন্ত্রীদের পকেটভারি করা ললিত মোদী-বিজয় মাল্য কলঙ্কিত বহুজাতিক ও বেটিং চক্র চালিত আই.পি.এল. ধামাকার জন্য মহারাষ্ট্রের তিনটি ক্রিকেট মাঠের পিচে প্রতিদিন ৬৫ লক্ষ লিটার জল ঢালা হচ্ছিল। শেষমেষ আদালতের নির্দেশে আই.পি.এল. অন্যত্র সরে।

● ওড়িশার বিশিষ্ট জনজাতি কবি হলধর নাগ পদ্মশ্রী পেলেন। তিনি কোসলি ভাষায় ২০টি মহাকাব্য রচনা করেছেন। বরাগর জেলার একটি গ্রামে সাধারণ জীবনযাপন করা এই বিশিষ্ট কবির দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে, তার পদ্য নিয়ে পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার সাথে পদ্মশ্রী পেলেন মণিপুর কলাক্ষেত্রর প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্তা হেইমনাম কানহাইলাল।

● দীর্ঘ সামাজিক ও আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে চারশো বছরের প্রথা ভেঙ্গে ৮ এপ্রিল '১৬ মারাঠি নববর্ষের দিন আহমেদনগরের শনি শিংনাপুর মন্দিরের দরজা খুলে গেল মহিলাদের জন্য। ডাঃ নরেন্দ্র দাভালকার সমেত অনেকেই এর জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন। কোর্টের রায়ও পক্ষে গেছিল। এরপর তপ্তি দেশাইয়ের নেতৃত্বে ভূমাতা রণরঙ্গিনী ব্রিগেডের ক্রমাগত আন্দোলন এই বৈষম্যের অবসান ঘটাল। কিন্তু শঙ্করাচার্যকে সামনে রেখে হিন্দুত্ববাদী ও পুরুষতান্ত্রিকরা এটিকে কোনভাবে বানচালের চেষ্টায় রত। শবরীমালা ও অন্যান্য মন্দিরের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন প্রভাব ফেলবে। তৃপ্তি দেশাইরা এবার উদ্যোগ নিয়েছেন কোলাপুরের মহালক্ষী ও নাসিকের তম্বকেশ্বর মন্দিরে প্রবেশের।

● গত ১ এপ্রিল '১৬তে আক্ষরিক অর্থেই মাথায় নির্মীয়মান উড়ালপুল ভেঙ্গে কলকাতার পোস্তায় ২৭ জনের মৃত্যু ও শতাধিক মানুষ আহত হন।

● যেখানে সারাদেশে ক্ষতিকারক জি.এম.ও. সর্ষে চাষের বিরোধিতা শুরু হয়েছে, সেখানে নীতি আয়োগের সদস্য রমেশ চাঁদ ভারতে জি.এম.ও. চাষের সওয়াল করেছেন। তার যুক্তি যেসব ক্ষেত্রে আমরা কৃষিতে তেমনভাবে বিকাশ ঘটাতে পারিনি, যেমন ডাল চাষের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে জি.এম.ও. প্রযুক্তি গ্রহণ করা উচিত।

● রুপো ছাড়া অন্যান্য ধাতুর ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ১% কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে গয়না শিল্পে যে ধর্মঘট চলছিল ৪৩ দিন চলার পর 'অল ইণ্ডিয়া জেমস্ এণ্ড জুয়েলারি ট্রেড ফেডারেশন' ও কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা সাপেক্ষে ১২ এপ্রিল '১৬ তুলে নেওয়া হয়।

● উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্রাল অঞ্চলের খাইবার পাখতুনয়ালা প্রদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র কালাস জনগোষ্ঠী, যাদের নিজস্ব ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে, যে সমাজে নারীরা অনেক মুক্ত, ইসলামি মৌলবাদীদের আক্রমণে অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছেন।

● অবৈধভাবে প্রচুর বারুদ ও বাজি প্রতিযোগিতার জন্য মজুত রাখা কেরলের কোল্লামের পত্তিঙ্গাল দেবী মন্দিরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১০ জনের মৃত্যু হল।

● সুইডেন, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড ও ব্রিটেনের পর ফ্রান্স পঞ্চম রাষ্ট্র যেখানে যৌনতার জন্য অর্থদান দণ্ডনীয় অপরাধ (৩,৭৫০ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা) হিসাবে গৃহীত হল। সমাজতান্ত্রিক আইন রচয়িতা মঁ অলিভারের মতে যৌনকর্মীরা আইনভঙ্গকারী নন তারা আইনভঙ্গকারীদের শিকার। বহু যৌনকর্মী ফ্রেঞ্চ পার্লামেন্টের সামনে প্রতিবাদ করেন। এই আইনের ফলে ফ্রান্সের ৩০,০০০-র বেশী যৌনকর্মীর, যাদের প্রতি পাঁচজনের চারজন পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, চিন, গ্রীস, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আগত, রুজি রোজগারের সমস্যা হবে, পুলিশি দমন পীড়ন বাড়বে।

● পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া নিয়ে লক্ষাধিক লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের বাস। এই ভূমিহীন, দরিদ্রতম, অত্যন্ত পশ্চাদপদ ও প্রান্তিক জনজাতি হিন্দু সমাজে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে এবং ব্রিটিশ শাসকরা এদের অপরাধী জাতি আখ্যা দিয়ে একটি গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। এদের উন্নতির জন্য অনেকে কাজ করতে শুরু করেন। মহাশ্বেতা দেবী ১৯৫৮তে তৈরী করেন 'ক্ষেরিয়া শবর কল্যাণ সমিতি'। শবরদের উন্নতির জন্য কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়। কিন্তু বামশাসনের শেষদিক থেকে এই কাজে ভাটা পড়ে। তৃণমূল শাসনে তা উপেক্ষিতই রয়ে যায়।

● ২০১৬তে ভারতে অনুষ্ঠিত টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপে সবাইকে তাক লাগিয়ে আণ্ডারডগ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পুরুষ ও মহিলা দল চ্যাম্পিয়ন হল।

● কর্ণাটকের হাসানের সিগরানাহাল্লিতে বাসবেশ্বর মন্দিরে প্রবেশের দাবীতে স্থানীয় দলিতরা আন্দোলন শুরু করেছেন।

● বিহারের নীতিশ সরকার ঐতিহাসিক মদ বন্ধের সিদ্ধান্তের পর নেশা ছাড়ানোর কর্মসূচী নিয়েছেন। এই ব্যাপারে তারা ব্যাঙ্গালুরুর 'নীমহ্যানস্' ও নিউদিল্লীর 'এইমসের' সহায়তা নিচ্ছেন।

● কেনিয়ার সাহিত্যিক গুগি ওয়া থিয়ঙ্গের লেখা একটি বই 'দি আপরাইট রেভেলিউশন ঃ অর হোয়াই হিউম্যানস্ ওয়াক আপরাইট' ৩০টির বেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

● ড্যানিশ মেটেরিওলজিকাল ইনস্টিটিউট জানাচ্ছে তাদের গ্রীণল্যাণ্ডে অবস্থিত জলবায়ু কেন্দ্র যে খবর পাঠাচ্ছে তাতে দেখা গেছে ২০১৫-র এপ্রিলে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩.১° সেলসিয়াস বেড়ে গিয়ে বরফের চাদরের ব্যাপক গলন শুরু হয়েছে।

● ক্যাম্পাসে হিন্দুত্ববাদীদের বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার আত্মহত্যাকারী দলিত ছাত্র রোহিত ভামুলার শোকাতুর মাতা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

রাধিকা এবং নির্যাতিত ভ্রাতা নাগ চৈতন্য ভামুলা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।

● ভারতীয় রাজনীতিতে বিরোধী রাজনীতির সংসদসর্বস্বতা, লোক দেখানো প্রতিবাদ ও দিনগত পাপক্ষয়ের মরাগাঙে বান ডেকেছে ছাত্ররা। এর যোগ্য নেতৃত্ব দেন দিল্লীর জে.এন.ইউ.-র লড়াকু ছাত্ররা; তাদের সংগঠনগুলি অর্থাৎ এ.আই.এস.এ., এস.এফ.আই., এ.আই.এস.এফ., বি.এ.পি.এস.এ. (বীরসা আম্বেদকর ফুলে স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন) এবং তাদের জোট; জোটের নেতা অসাধারণ বাগ্মী কানহাইয়াকুমার, শেলা রশিদ প্রমুখ। তারা জে.এন.ইউ. ঘটনায় রাষ্ট্র, সরকার ও হিন্দুত্ববাদী শক্তিদের সাথে তীব্র লড়াই চালিয়ে জয়ী হয়। ইউজিসি-র অবিচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে; হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও পুণের ফিল্ম ইনস্টিটিউট এবং নাগপুর, পুণে, আলিগড়, বেনারস, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্য অত্যাচার ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে পাশে দাঁড়ায়, গড়ে তোলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংসদগুলির যৌথ মঞ্চ।

● বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে সূর্য থেকে এমন সব জ্বলন্ত অগ্নিগোলক (সুপারফ্লেয়ারস্) নির্গত হচ্ছে যা রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা সৃষ্টি করছে।

● কেরলের আত্তাপাদির মহিলারা শক্তিশালী আন্দোলন চালিয়ে আত্তাপাদিতে মদ তৈরী, আমদানি ও বিক্রি বন্ধ করে দেন। এবার তামিলনাড়ুর সীমান্তে আনাইকেটিতে মদব্যারনরা জাঁকিয়ে বসে। এর বিরুদ্ধেও আত্তাপাদির নারীরা আন্দোলন করেন। এবার তাদের সাথে যোগ দেন আনাইকেটির মহিলা সমবায় 'থায়কুলা সংঘম'। অবশেষে প্রশাসন আনাইকেটিতেও মদ বিক্রি বন্ধ করে দেবেন।

● একদিকে বহুজাতিক, ক্রনি ও ফাটকা পুঁজির সুবিধা করে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজেদের আখের গোছানো, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কষ্টসাধ্য জমানো অর্থ তছরূপ মোদী সরকারের এই নয়া নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্রমশ সরব হয়ে উঠছেন। ব্যাঙ্গালুরুর পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা জঙ্গী আন্দোলন করে মোদী সরকারের 'ই.পি.এফ.'-র উপর সংশোধনী আটকে দিলেন। গুরগাঁওসহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চলেও পোশাক, অটোমোবাইল প্রমুখ শিল্পের শ্রমিকরাও আন্দোলন শুরু করলেন। অবশেষে মোদী সরকার আরও পিছু হটে ইপিএফের সুদের হার হ্রাস করার সিদ্ধান্ত তুলে নিলেন।

● শনি সিংনাপুরে সাফল্যের পর বিনীতা গুট্টের নেতৃত্বে আন্দোলনরত মহিলারা নাসিকের মন্দিরের গর্ভগৃহে ৫০০ বছর পর প্রবেশের অধিকার পেলেন। ২০টির বেশী নাগরিক অধিকার সংগঠন মুম্বাইয়ে হাজি আলি দরগায় ২০১১-র পর নারীর প্রবেশের অধিকার রদ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবীতে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরু করেছেন। তাতে অংশ নিচ্ছেন প্রচুর মুসলমান নারী।

● ভারতের নিজস্ব জি.পি.এস. ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পূর্ণ করতে অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সপ্তম উপগ্রহ (আই.আর.এন.এস.এস.-ওয়ান জি) পিএসএলভিসি-৩৩ রকেটের মাধ্যমে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হল। এই উপগ্রহকে এমন এক বৃত্তে সাব-জিওসিনক্রনাস স্থানান্তর করা হল যেখানে তার ঘূর্ণনের পরিধি হবে পৃথিবী থেকে ২৮৪ এবং ২০,৬৫৩ কি.মি.-র মধ্যে।

● ভারতীয় রাজনীতিক ও ক্রীড়া সংগঠকরা ভারতের খেলাধুলাকে কি চোখে দেখেন আরেকবার প্রমাণিত হল সমস্ত দিকপাল ক্রীড়াব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে রিও ওলিম্পিকে ভারতীয় দলের শুভেচ্ছা দূত হিসাবে বিতর্কিত ও খুনের অভিযোগে বিচারাধীন বলিউড তারকাকে নির্বাচনের মাধ্যমে। ওদিকে জাতীয় অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় চলল চূড়ান্ত অব্যবস্থা।

● পতিদার প্যাটেলদের ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে নরেন্দ্র মোদী মনোনীত গুজরাটের আনন্দিবেন প্যাটেলের বিজেপি সরকার অবশেষে উঁচু বর্ণের যাদের বার্ষিক আয় ছয় লক্ষ টাকার কম তাদের জন্য ১০% সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করলেন। ফলে তফশিলী জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাদপর জাতির ৪৯% সংরক্ষণের সাথে ১০% যুক্ত হয়ে শিক্ষা ও কর্মস্থানে মোট সংরক্ষণ হয়ে দাঁড়াল ৫৯%।

● মুম্বাইয়ের অভিজাত কোলাবার সমুদ্র সান্নিধ্যে সামরিক বাহিনীর জমি গ্রাস করে রাজনীতিক-আমলা-সামরিক অফিসাররা যোগসাজশ করে যে ৩১ তলা বিলাসবহুল বহুতল 'আদর্শ হাউসিং সোসাইটি' বেআইনিভাবে নির্মাণ করেছিল, দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া চলার পর আদালত তা ভেঙ্গে দিতে বলল।

● ক্রমাগত যথেচ্ছ পরিবেশ দূষণের কারণে সৃষ্ট উষ্ণায়ন ও এল নিনোর প্রকটে সারাভারত জুড়ে ফেব্রুয়ারী-মে '১৬ চলল টানা তাপপ্রবাহ ও খরা। কালবৈশাখী ও বৃষ্টির দেখা নেই, তথাকথিত উন্নয়নের ফল মরা নদী, বিনষ্ট জলাভূমি, কোথাও কোন জল নেই। এর উপর অবৈজ্ঞানিকভাবে আখ প্রমুখ চাষ ও চিনিকল স্থাপনের কারণে জলস্তর আরও পাতালমুখী। গ্রাম-শহর সর্বত্র জলের জন্য হাহাকার। মারাঠাওয়াড়া, বিদর্ভ, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে সব জলাশয়-জলাধার শুকিয়ে খাঁক। টিটলাগড়ের তাপমাত্রা ৫০° ছুঁইছুঁই। খরাপীড়িত তেলেঙ্গানা, পশ্চিম ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ঘর-চাষের জমি ফেলে মানুষ ছুটছে মুম্বাই প্রভৃতি শিল্পনগরীতে কাজের আশায়। এর মধ্যে আশার কথা উত্তরপ্রদেশের সামলি জেলার মালাকপুর গ্রামের মানুষ বর্তমানে মৃত একদা ১৫০ কি.মি. বিস্তৃত কথানদীকে বাঁচিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। অন্যদিকে একদা জমজমাট ফলনশীল ঘোড়ামারা ও অনেকগুলি সুন্দরবনের দ্বীপ জলস্তর বৃদ্ধির ফলে ক্রমশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে চলেছে।

● মোদী সরকারের আতিথেয়তায় ভারতের ক্রনি ক্যাপিটাল ও সমান্তরাল রাষ্ট্রের দুই প্রধান কাণ্ডারী মুকেশ আম্বানি ও গৌতম আদানি আরও ফুলে ফেঁপে উঠছেন। এবার আমজনতার করের মূল খরচের জায়গা প্রতিরক্ষা দপ্তর তাদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তাদের ইতিমধ্যে ১৫০০ বিএমপি-২, ২৫০০ টি৭২,

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

চারটি তলোয়ার ক্লাস ফ্রিগেট, গ্যাস টারবাইন, সরঞ্জাম বহনকারী বিমানের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এদের এগুলি তৈরীর কোন পরিকাঠামো নেই, তাই চারটি ইউক্রেনীয় সংস্থার সাথে চুক্তি করে এগুলি আমদানি করে দালালির বিপুল টাকা আত্মসাতের পরিকল্পনা।

● বছরের পর বছর প্রতারিত একদা নর্মদা উপত্যকায় শান্তিপূর্ণভাবে বংশপরম্পরায় বসবাসকারী পরে সরদার সরোবর প্রভৃতি বাঁধ তৈরীর কারণে উৎপাটিত মানুষেরা 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন'-এর নেতৃত্বে ২৭ এপ্রিল ভোপালে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত করলেন।

● উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল সংলগ্ন জঙ্গলে মনুষ্যকৃত দাবানল গত দুবছর খরার শুষ্কতা, উষ্ণ তাপমাত্রা, আপেক্ষিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জোরালো হাওয়া, পাইন বৃক্ষের সংখ্যাধিক্য, আশপাশের জলাভূমি-হ্রদ প্রভৃতি নষ্ট করে ফেলা ইত্যাদি কারণে ভয়াবহ আকার নিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

● কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুতের ব্যয় সঙ্কোচনের লক্ষ্যে ২০১৯-র মধ্যে সমস্ত ক্যাণ্ডেসেন্ট বাল্ব পরিবর্তন করে এল.ই.ডি. বাল্ব লাগানোর 'উন্নত জ্যোতি বাই অ্যাফোরডেবল এল.ই.ডিস্. ফর অল (উজালা)' প্রকল্প ঘোষণা করলেন ৩০ এপ্রিল ২০১৬।

● দাবানলে পুড়ল কানাডাও। উত্তরপূর্ব কানাডার আলবার্টা জঙ্গলের দাবানল গ্রাস করল ফোর্ট ম্যাকমুর শহর এবং সংলগ্ন খনিজতেলের এলাকাগুলি। ৯০০ বর্গ কিলোমিটার এই লেলিহান আগুন প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করল। প্রায় এক লক্ষ মানুষকে স্থানান্তরিত করা হল।

● রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসাবে বিভিন্ন যুদ্ধ ও সংঘর্ষে ২০১৫তে ১,৬৭,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় মারা গেছেন ৮৩,০০০ মানুষ (সিরিয়া ৫৫%, ইরাক ১৬%, ইয়েমেন ৯%, বাদবাকী দেশগুলি মিলে ৯%); লাতিন আমেরিকায় ৩৪,০০০ (মধ্য আমেরিকার দেশগুলি মিলে ৫০%, মেক্সিকো ৪৯%, বাকীরা ১%); সাব-সাহারান আফ্রিকায় ২৪,০০০ (নাইজিরিয়া ৪৬%, সোমালিয়া ১৭%, দক্ষিণ সুদান ১৭%, সুদান-ডারফার ১৩%, অন্যত্র ৭%) এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯,০০০ (আফগানিস্তান ৭৯%, পাকিস্তান ১৬% ও অন্যান্য ৫%)।

● 'অল ইণ্ডিয়া কিষাণ মজদুর সভা (এ.আই.কে.এম.)' ২০১৬-র প্রথম পাঁচ মাসে দেশজুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ, অনাবৃষ্টি, ব্যাপক খরা ও জলাভাবের কারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে জলের জন্য জরুরি অবস্থা জারির এবং জল সংরক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার দাবী জানাল।

● ক্লডিও র‍্যানিয়েরির কোচিংএ ১৩২ বছরের মধ্যে প্রথম লেস্টার সিটি ফুটবল দল ম্যান ইউ, ম্যান সিটি, চেলসি, আর্সেনাল, টটেনহাম প্রভৃতি বড় দলগুলিকে টেক্কা দিয়ে সারা মরশুম ভাল খেলে ২০১৫-র ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ খেতাব ছিনিয়ে নিল।

● একটি পরিসংখ্যান জানাচ্ছে বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর একমাসের মধ্যে অপরাধ ২৭% এবং পথ দুর্ঘটনা ৩৩% কমে গেছে।

● কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা আগামী দশ বছরে ১,২০০ কোটি ডলার ব্যয়ে ৮০০টি হেলিকপ্টার কেনার জন্য বিদেশী সংস্থাগুলিকে বরাত দিয়েছে।

● লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে পুঁজিবাদোত্তর মার্কিন সমাজে অর্থনীতির নিষ্পেষণে ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির একাধিপত্য মুনাফার অত্যাচারে সমাজতান্ত্রিক দলগুলি রাষ্ট্রক্ষমতায় চলে আসে ব্যাপক জনসমর্থনে। ইকোয়েদর প্রমুখ দেশগুলি ভালভাবে চললেও ভেনেজুয়েলার মাদুরো, ব্রাজিলের দিলমা রুসেফ প্রমুখ দ্রুত গণসমর্থন ও পদ হারিয়ে ফেলেন।

● বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'গ্লোবাল আরবান অ্যামবিয়েন্ট এয়ার পলিউশন ডাটাবেস, ২০১৬' রিপোর্টে দেখানো হয়েছে বিশ্বের সবচাইতে দূষিত শহর ইরানের জাবোল। ১০৩টি দেশের ৩০০০ শহরের মধ্যে প্রথম ২০ দূষিততম শহরের মধ্যে ভারতের রয়েছে দিল্লী, কলকাতাসহ ১০টি শহর। দূষণের দিক থেকে তাদের স্থান ঃ গোয়ালিয়র (২), এলাহাবাদ (৩), পাটনা (৬), রায়পুর (৭), দিল্লী (১১)।

● দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হিন্দু কলেজে ছাত্রীদের প্রতি বৈষম্য, তুলনামূলক বর্দ্ধিত ফি প্রভৃতি অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছেন জাতীয় মহিলা কমিশন।

● আই.সি.এম.আর. এবং এইমস্ এইমসের ট্রমা সেন্টারে ২০১০ থেকে ২০১৪ অবধি ঠিকমত হাত ধোয়ার উপর একটি অনুশীলন কেন্দ্রিক অধ্যয়ন চালিয়ে দেখেছেন যে 'ভেন্টিলেশন এসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া' সংক্রমণের হার ৩৫.৯%, 'সেন্ট্রাল লাইন এসোসিয়েটেড ব্লাডস্ট্রীম ইনফেকশন' ২৫.২% এবং মূত্রনালীর সংক্রমণ ৩৪.৪% হ্রাস পেয়েছে।

● পুডিচেরীর সাড়ে বার লাখ জনসংখ্যার ১৫%-এর বেশী তফশিলী জাতিভুক্ত। ১০.২% প্রান্তিক শ্রমিকের ১৮.৯% এবং ১৫.৪% ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের ৩৯.১% তফশিলী জাতিভুক্ত। এই দলিত সম্প্রদায়কে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে দূরে রাখতে উচ্চবর্ণ নিয়ন্ত্রিত দলগুলি প্রশাসনকে দিয়ে ১৯৬৪-র পরে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে নিয়েছে।

● ভারত জুড়ে প্রবল তাপপ্রবাহ, বৃষ্টিহীনতা, জলাভাব, খরা, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি, অনাহার, মৃত্যু—বিষয়গুলিকে অবহেলা করা এবং প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে।

● সংযুক্ত জনতা দলের এক বাহুবলী বিধায়ক বিন্দি যাদবের সমাজবিরোধী পুত্র গয়ায় এক ছাত্রকে হত্যার পর সিওয়ানে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বাহুবলী বিধায়ক সাহাবুদ্দীনের খুনে বাহিনী একজন সিনিয়র সাংবাদিককে হত্যা করল। নীতিশ সরকারের সুশাসন মুখ থুবড়ে পড়ছে।

● ২০১৫-র চারটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত পুদিচেরীর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঃ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

অসম ঃ মোট আসন ঃ ১২৬, অভিষ্ট আসন ঃ ৬৪
বিজেপি জোট—৮৬
বিজেপি ঃ ৬০ (+ ৫৫) ২৯.৫%
এজেপি ঃ ১৪ (+ ৫) ৮.১%
বিওপিএফ ঃ ১২ (০) ৩.৯%
কংগ্রেস জোট—৩৯
আইএনসি ঃ ২৬ (– ৫৩) ৩১%
এআইইউডিএফ ঃ ১৩ (– ৫) ১১%
অন্যান্য— ১ (– ১)

কেরল ঃ মোট আসন ঃ ১৪০, অভিষ্ট আসন ঃ ৭১
এলডিএফ জোট—৯৫
সিপিআই(এম) ঃ ৫৮ (+ ১৩) ২৬.৫%
সিপিআই ঃ ১৯ (+ ৫) ৮.১%
আইইউএমএল ঃ ১৮ (– ২) ৭.৪%
ইউডিএফ জোট—২৮
আইএনসি ঃ ২২ (– ১৭) ২৩.৭%
কেরল কংগ্রেস (এম) ঃ ৬ (– ৩)
বিজেপি— ১ (+ ১) ১০.০৫%

তামিলনাড়ু ঃ মোট আসন ঃ ২৩৪, অভিষ্ট আসন ঃ ১১৮
এআইএডিএমকে জোট—১৩৪ ঃ (+ ১৬) ৪০.৮%
ডিএমকে জোট—৯৮
ডিএমকে ঃ ৮৯ (+ ৭৬) ৩১.৬%
আইএনসি ঃ ৮ (+ ৩) ৫.৪%
আইইউএমএল— ১ (+ ১)

পুদিচেরি ঃ মোট আসন ঃ ৩০, অভিষ্ট আসন ঃ ১৬
কংগ্রেস জোট—২৫
কংগ্রেস ঃ ১৫ (+ ৮) ৩০.৫%
এআইএনআর কং ঃ ৮ (– ৭) ২৮.১২%
ডিএমকে ঃ ২ (– ২) ৮.৮৫%
এআইডিএমকে—৪ ঃ (– ১) ১৫.৮২%

পশ্চিমবঙ্গ ঃ মোট আসন ঃ ২৯৪, অভিষ্ট আসন ঃ ১৪৮
তৃণমূল কংগ্রেস—২১১ ঃ (+ ২৭) ৪৪.৯%
সিপিএম-কংগ্রেস জোট—৭২
আইএনসি ঃ ৪৪ (+ ২) ১২.০৩%
সিপিআই(এম) ঃ ২৬ (– ১৪) ১৯.৭%
এআইএফবি ঃ ২ (– ১) ২.৮%
বিজেপি ঃ ৩ (+ ৩) ১০.২%

দিল্লী উপনির্বাচন
আসন সংখ্যা ঃ ১৩

বিজয়ী	আসন সংখ্যা	ভোটের হার (%)
এ.এ.পি.	৫	২৯.৯৩%
আই.এন.সি	৪	২৪.৮৭%
বি.জে.পি.	২	৩৪.১১%
নির্দল	২	৯.৫৩%

● পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র ৪০টিতে মহিলারা বিজয়ী হয়েছেন (১৩.৪২%)। পশ্চিমবঙ্গে এবার নোটার (নান অফ দি এবাফ) হার সর্বোচ্চ। ৮,৩১,৮৪৫। সামগ্রিক ভোটের ১.৫% ও ২০১৪-র লোকসভা ভোটের থেকে ০.৪% বেশী। ২৩টির বেশী আসনে জয়ী ও দ্বিতীয়র মধ্যে ব্যবধানের চাইতে নোটার সংখ্যা বেশী। এবার তৃণমূলের নয়জন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন যাদের মধ্যে সারদা-নারদা অভিযুক্ত কয়েকজন রয়েছেন। অজয় দে, বিপ্লব মিত্র প্রমুখ হেভিওয়েট নেতাও পরাজিত হয়েছেন। ১০৭ জন বিধায়কের (৩৯.৭৮%) বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম, শ্লীলতাহানি-ধর্ষণ, দুর্নীতি-লুঠ প্রভৃতি গুরুতর ফৌজদারী অভিযোগ রয়েছে।

● পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রীসভার ৪২জন সদস্যের মধ্যে ২৪জন (৫৭%) ক্রোড়পতি এবং মন্ত্রীদের গড় ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ ৩.৩৫ কোটি। নয়জনের (২১%) বিরুদ্ধে ফৌজদারী এবং সাতজনের (১৭%) বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

● ওড়িশার ব্যাঘ্র সংরক্ষণের কাজ অবহেলার কারণে নিম্নমুখী। গত কয়েক বছরে সরকারি হিসাবে ১৭টি বাঘের মৃত্যু হয়েছে। আগামীদিনে সিমলিপাল, সুনাবেদা, করঞ্জিয়া, কেওঞ্চর, সাতকোশিয়া, সুন্দরগড় ও খারিয়ারে যে অল্প কটি বাঘ রয়েছে বন সংরক্ষণের অভাব, খাদ্য ও জলাভাব এবং চোরাশিকারের কারণে শেষ হতে চলেছে।

● জাঠদের সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলনে হরিয়ানার বেশকিছু অঞ্চলে ব্যাপক গোলমাল এবং সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদন্ত কমিশন দেখেছেন সেইসময় প্রশাসন ও পুলিশের সর্বোচ্চ থেকে নীচ অবধি অফিসার ও কর্মীদের অনেকের কর্তব্যে যথেষ্ট অবহেলা ছিল, কারো কারো মদত ছিল, অনেকেই কাজের জায়গায় ছিলেন না, অনেক পুলিশ পালিয়ে যান। শেষমেশ সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামলায়। তার আগেই অন্য জাতের মানুষের উপর যথেচ্ছ আক্রমণ ও তাদের সম্পত্তি লুঠ, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

● ২০১৪তেই সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল যে এইচ.আই.ভি. আক্রান্তদের আর.এন.টি.সি.-র অধীনে যক্ষ্মার ফিক্সড ডোজড ড্রাগস্ দেওয়া হবে। ২০১৬-র মে-তেও চালু হল না। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সামনে এইচ.আই.ভি. আক্রান্তরা (পি.এল.এইচ.আই.ভি.) বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। আক্রান্তদের কয়েকজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

● ১৮ মে ২০১৫তে কানাডার সংসদে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুদো ১৯১৪তে তিনশোর বেশী ভারতীয় শিখযাত্রী নিয়ে জাপানী জাহাজ কোমাগাতা মারুকে কানাডায় ঢুকতে না দেওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন।

● চীন থেকে ফেরার পথে অ্যাপেল সংস্থার সি.ই.ও. টিম কুক ভারত সফর করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে ব্যাঙ্গালুরুতে একটি অ্যাপস্ ডিজাইন সেন্টার নির্মাণ করবেন।

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

● ভারত নিজেদের তৈরী ১০০০ কি.মি. ওজন নিতে সক্ষম পৃথ্বী-২ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণে সফল হল। সফল হল পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানীতে চলা মহাকাশযান (আর.এস.এল.ভি.-টি.ডি.)-র সফল উৎক্ষেপণে।

● আই.সি.এম.আরের ক্যানসার রেজিষ্ট্রি জানাচ্ছে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক ক্যানসার রোগীর সংখ্যা বেশী যথাক্রমে মিজোরাম ও অরুণাচলে।

● সরকার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার সাথে পাঁচটি লোকসানে চলা ব্যাঙ্কের মিশে যাওয়ার ঘোষণা করায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

● দিল্লীতে চালকবিহীন মেট্রো ট্রেন চলাচল উদ্বোধন হল।

● অসমের ডিমা হাসাও জেলায় ধস নামার ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়, ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়।

● খননের ফলে মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলার বৈকণ্ঠপুরমে ১০০ খ্রীঃ পূর্বের বৌদ্ধমঠের সন্ধান পাওয়া গেল।

● কার্গিলের দ্রাস সেক্টরে বহুদিন পর বিরল ধূসর ভালুকদের আনাগোনা লক্ষ্য করেছে জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যপ্রাণী দপ্তর।

● যোগেন্দ্র যাদবের নেতৃত্বাধীন 'স্বরাজ অভিযান' ত্রাণ সম্পর্কে শীর্ষ আদালতের ১৩ মে'১৫-র নির্দেশ ও কৃষকদের নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে খরাপীড়িত লাতুরের সোনায়াতি গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু করে মারাঠাওয়াড়া ও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল পরিক্রমা করল।

● মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ওঠার পর ভারত বাণিজ্যিক ও রণকৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইরানের পারস্য উপসাগরীয় ছাবাহার বন্দর উন্নত করার এবং সেখান থেকে জাহেরান পর্যন্ত ৫০০ কি.মি. রেলপথ বসানোর চুক্তিতে সই করল। এর ফলে ইরান ও আফগানিস্থানসহ মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানকে অগ্রাহ্য করে পণ্য সরবরাহ ও বাণিজ্য করা সহজ হবে জলপথে। অন্যদিকে চীন মায়নমারের কোকো দ্বীপ, শ্রীলঙ্কার হাম্বারটোটা ও পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দর থেকে ভারতকে যেমন ক্ষেপণাস্ত্রবাহী নৌবহর দিয়ে ঘিরেছে ভারতও ইরানের ছাবাহর বন্দর দিয়ে মাত্র ৭২ কি.মি. দূরে অবস্থিত গোয়াদরের চীনা অবস্থানকে ঘেরার কৌশল নিল। অন্যদিকে চীনকে দক্ষিণ চীন সমুদ্র ও প্রশান্ত মহাসাগরে রুখতে ভিয়েতনামের উপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র প্রস্তুতির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল।

● ২০১৫-র মে মাসে ব্যাপক ধস ও হড়পা বানে মণিপুর ও মিজোরামের অনেকগুলি জনপদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

● ২০১৫-র গ্রীষ্মের প্রবল খরা গুজরাটকেও গ্রাস করেছে। ১১১৫টি গ্রামে তীব্র জলকষ্ট। নর্মদা জেলার কাভেদিয়াতে তাই সরদার সরোবর বাঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছে।

● বাঘেদের নিরাপত্তা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার অভিযোগে পেঞ্চ ও বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানে বাঘের সাফারি আয়োজন বন্ধ করার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ (সি.জেড.এ.)।

● ২০১৫-র শুরু থেকে ২০১৬-র মে পর্যন্ত সময়ে রক্ত সঞ্চালনের জন্য (ব্লাড ট্রান্সফিউশন) ২,২৩৪ জন ব্যক্তির এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ হয়েছে যার মধ্যে ৩৫১ জন উত্তরপ্রদেশের, ২৯২ জন গুজরাটের, ২৭৬ জন মহারাষ্ট্রের, ২৬৪ জন দিল্লীর, ১৩৫ জন পশ্চিমবঙ্গের এবং ১২৭ জন কর্নাটকের।

● ভারতের সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে যুদ্ধের চাইতেও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, বাতিল হওয়া প্রযুক্তি, ত্রুটিপূর্ণ সংগ্রহ কিংবা অন্তর্ঘাতের কারণে অনেক বেশী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা সে একের পর এক মিগ যুদ্ধবিমানের ভেঙ্গে পড়া অথবা অতিমূল্যবান সাবমেরিনসহ যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংসই হোক অথবা অস্ত্রাগার ধ্বংসের মাধ্যমেই হোক। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধার পুলগাঁওতে সামরিক বাহিনীর সর্ববৃহৎ অস্ত্রাগার 'সেন্ট্রাল অ্যামুনিশন ডিপোটে' অগ্নিকাণ্ডে ১৩০ টন গোলাবারুদ ধ্বংস হয়েছে এবং একজন লেফটেনান্ট জেনারেলসহ ২১ জন সেনা অফিসার ও কর্মী মারা গেছেন।

● বিশ্ববিখ্যাত সুইস রেল বেসেল থেকে ইতালির মিলান অবধি (১৫২ কি.মি.) সম্প্রসারিত হচ্ছে। তার মধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সারাবছর আল্পস্ পর্বতমালার ৫৭ কি.মি. দীর্ঘ গোটহারড টানেল অতিক্রম করছে যা জাপানের ৫৪ কি.মি. দীর্ঘ সেইকান টানেলকে ছাড়িয়ে গেছে।

● উত্তর গোলার্ধ ও উত্তর ইউরোপের অন্যতম ধনী ও উন্নত দেশ নরওয়ের আইনসভা অরণ্য নিধন সম্পূর্ণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ও শপথ নিল। পরবর্তী পদক্ষেপ দেশজুড়ে পেট্রোলিয়ামে চলা গাড়ি বন্ধ।

● মোদী সরকার শিক্ষায় গৈরীকিকরণ ও বেসরকারিকরণের পাশাপাশি শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করে চলেছে। এর আগে ইউজিসি ছাত্রদের ফেলোশিপ ও ভাতা বন্ধ করে দেয়। এর প্রতিবাদে জোরালো ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান জেএনইউ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এবার ইউজিসি-র ফরমানে ৪,৫০০ শিক্ষক কাজ হারিয়েছেন, বাকীরাও আক্রমণের মুখে। এর বিরুদ্ধে শিক্ষকরা আন্দোলন শুরু করেছেন। শুরু হয়েছে 'খালি থালি ধরণা'। পাশে দাঁড়িয়েছে জেএনইউএসইউ, এনএসইউ, ছাত্রযুব সংঘর্ষ মোর্চা প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন।

● জঙ্গল কেটে কয়লা খনন শুরু করায় ছত্তিশগড়ের কোরবা জেলার হাসদেও-আরান্দ্ অঞ্চলের ৩৫-৪০টি গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৫ জুন'১৬ বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে 'ছত্তিশগড় বাঁচাও আন্দোলনে'র নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেছেন।

● বাংলাদেশে মৌলবাদী জেএমবি জঙ্গীদের দাপট ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ইসলাম রক্ষার নামে এতদিন মুক্তমনা, ব্লগার, বিদেশী এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, শিয়া, আহমদি প্রভৃতি ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় কোতল করা হচ্ছিল, এবার তাদের আক্রমণের শিকার সাধারণ মানুষ। নাটোরের শিয়া ইমাম, বান্দরবনের বৌদ্ধ ভিক্ষু, নাটোর ও ঝিনাইদহের খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী সুনীল গোমেজ ও সামির

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

আলি, চট্টগ্রামের গৃহবধূ মাহমুদা খানম, পঞ্চগড় ও ঝিনাইদহের হিন্দু পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর রায় ও আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় একের পর এক হত্যালীলা চলছে।

● ভারতের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির চিকিৎসক সঙ্কট ঃ

রাজ্য	পোস্ট	কতজন আছেন	ঘাটতি	ঘাটতি (%)
ঝাড়খণ্ড	৯৬৬	৩৩৭	৬৩৯	৬৬
দিল্লী	১৩	৫	৮	৬২
পশ্চিমবঙ্গ	২১৫৩	৯০৯	১২৪৪	৫৮
মধ্যপ্রদেশ	১৯৮৯	১১৭১	৮১৮	৪১
বিহার	৩০৯৯	১৮৮৩	১২১৬	৩৯
উত্তরপ্রদেশ	৫১৯৪	৩৪৯৭	১৬৯৭	৩৩
পাঞ্জাব	৫৭৮	৪২৭	১৫১	২৬
মহারাষ্ট্র	২২০১	১৮১১	৩৯০	১৮
ত্রিপুরা	১০৯	৯১	১৮	১৭
হরিয়ানা	৫৫০	৪৬১	৮৯	১৫

● প্রধান প্রধান ইউরেনিয়াম শক্তিসম্পন্ন দেশসমূহ

নাম	বার্ষিক উৎপাদন (টন)	বার্ষিক চাহিদা (টন)
কাজাখাস্তান	২৩,১২৭	
কানাডা	৯,১৩৪	
অস্ট্রেলিয়া	৫,০০১	
নাইজার	৪,০৫৭	
নামিবিয়া	৩,২৫৫	
রাশিয়া	২,৯৯০	
উজবেকিস্তান	২,৪০০	
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,৯১৯	
চীন	১,৫০০	
ইউক্রেন	৯৬২	
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫৭৩	
ভারত	৩৮৫	১,০৭৭

● প্রধান প্রধান পরমাণু শক্তি উৎপাদনকারী দেশসমূহ

নাম	সক্রিয় কেন্দ্র	বাতিল কেন্দ্র	প্রস্তাবিত কেন্দ্র
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৯৯	০০	১৮
ফ্রান্স	৫৮	১২	০০
জাপান	৪৩	১৭	০৯
রাশিয়া	৩৫	০৫	২৫
চীন	৩২	০০	৪২
দক্ষিণ কোরিয়া	২৫	০০	০৮
ভারত	২১	০০	২৪
কানাডা	১৯	০৬	০২
ইউ.কে.	১৫	৩০	০৪
ইউক্রেন	১৫	০৪	০২
জার্মানী	০৮	২৮	০০

● খাদ্যদ্রব্যের দাম ০৫.৭৬% বেড়ে গত মে'১৬তে দুবছরের মধ্যে সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পিডিএসে কেরোসিনের কোটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● 'অল ইণ্ডিয়া পিপলস্ ফোরামের (এ.আই.পি.এফ)'— একটি দল বাস্তারের ২৫টি গ্রাম ঘুরে এসে অসংখ্য সাজানো সংঘর্ষ, খুন, লুঠ ও অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন।

● উত্তরপ্রদেশের কেন নদী ও মধ্যপ্রদেশের বেতোয়া নদীর সংযোগকারী প্রস্তাবিত বাঁধ ও খাল নির্মাণের ফলে পান্না ব্যাঘ্রপ্রকল্পের ৪০০০ হেক্টর জমি ডুবে যাবে।

● পথ দুর্ঘটনা ঃ ২০১৫

	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ	কলকাতা
মোট দুর্ঘটনা	৫,০১,৪২৩	১৩,২০৮	৪,৩৪৭
মৃত	১,৪৬,১৩৩	৬,২৩৪	৪২২
আহত	৫,০০,২৭৯		

● বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ ভারতের ৩১ শতাংশ চিকিৎসক মাধ্যমিক অবধি পড়েছেন, ৪৩ শতাংশের কেবল চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন শংসাপত্র আছে এবং গ্রামাঞ্চলে মাত্র ১৮ শতাংশ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের সংশাপত্র আছে।

● বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর সিকিমের কাঞ্চনঝঙঘা জাতীয় উদ্যান এবং স্থপতি ল্য কর্বুসিয়র উদ্ভাবিত চণ্ডীগড়ের ক্যাপিটল কমপ্লেক্স ইউনেসকোর হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেল। সব মিলিয়ে ভারতের ৩৫টি কেন্দ্র ইউনেসকোর হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেল।

● মোদী সরকারের শাসনে কাশ্মীর আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। বুরহান ওয়ানি হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী পরিস্থিতির বেঠিক মোকাবিলা সাধারণ কাশ্মীরীদেরও জিহাদী করে তুলেছে। অন্যদিকে এই সরকারের মুসলমান ও দলিত বিরোধিতা যথাক্রমে দাদরি হত্যাকাণ্ড ও রোহিত ভামুলার মৃত্যুর পর অন্য মাত্রা পায়। সাম্প্রতিক গুজরাটের রাজকোটে উনাকাণ্ড ও বিএসপি নেত্রী মায়াবতী সম্পর্কে কুৎসা দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ তোলে।

● তেলেঙ্গানায় মাল্লানাসাগর জলাধার তৈরির জন্য বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকরা আন্দোলন শুরু করেছেন। একজন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। অন্যদিকে ১৯৮০-র কৃষক শহীদদের স্মরণে কর্ণাটকের বিভিন্ন এলাকায় 'কর্ণাটক রাজ্য রিথা সংগঠন', 'পক্ষতিতা হোরাতা সমিতি' প্রমুখ কৃষক সংগঠন জনসমাবেশের আয়োজন করে। কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করছেন 'ওড়িশা কৃষক সভা' সহ বিভিন্ন কৃষক সংগঠন।

● অসমের লখিমপুর, গোলাঘাট, মারিগাঁও, জোরহাট, ধেমাজি, কামরূপ, নওগাঁ প্রভৃতি ২০টি জেলা ব্যাপক বন্যার প্রকোপে। ৩৩০০-র বেশি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। ২০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জলমগ্ন। উত্তরপ্রদেশের সারদা, ঘঘরা, কেন, গণ্ডক এবং বিহারের কোশী বিপদসীমা ছাড়িয়ে আশপাশ প্লাবিত করে। বিহারে ১২টি জেলার ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, উত্তরখণ্ড প্রবল ধসে বিপর্যস্ত। বন্যাক্রান্ত ত্রিপুরা, ওড়িশা, পাঞ্জাব, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড। কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান জলের নীচে চলে গেছে।

● ল্যানসেট জার্নালের একটি নিবন্ধে জানানো হয়েছে যে আধুনিক অ্যান্টি রেটরোভাইরাল চিকিৎসায় এইডস্ রোগীর মৃত্যুর হার অনেক

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

কমানো গেলেও ও এইচ. আই. ভি. আক্রান্তদের আয়ুষ্কাল অনেক বাড়ানো গেলেও এখনও প্রতি বছর ২৫ লক্ষ মানুষ এইচ. আই. ভি. আক্রান্ত হন। ২০০৫ এ যেখানে এইডস্ রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ, ২০১৫ তে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১২ লক্ষে। এ আর টি ব্যবহারকারীর সংখ্যাও এই দশ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষ আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ৬.৪ থেকে ৩৮.৬ লক্ষে এবং নারী আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ৩.৩ থেকে ৪২.৪ লক্ষে। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গর্ভবতী আক্রান্তদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এ আর টি চিকিৎসা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আক্রান্তের হার কমিয়ে দিয়েছে।

● ২০০৯ সালে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের কেপলার মিশন তৈরি হয়। হাওয়াই দ্বীপের মৌনা কোয়া গিরিশৃঙ্গে চারটি ঢাউস কেপলার টেলিস্কোপ বসানো হয়। তারপর থেকে মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সৌরজগতে ২৩২৬টি গ্রহ, তারকা ও গ্রহাণুর সন্ধান পেয়েছেন।

● বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভারত সরকার সৌরশক্তি বিকাশের কাছে ১০০ কোটি ডলার অনুদান দিলেন।

● বিহারের রোহতাস জেলার অখ্যাত গ্রাম বড়াখান্নায় সদ্য বিবাহিতা ফুলকুমারীর পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে বিয়ের মঙ্গলসূত্র বন্ধক রেখে পাকা পায়খানা বানানোর চেষ্টাকে মর্যাদা দিল বিহার সরকার। জেলা প্রশাসন সমগ্র সানৌলি ব্লকে 'বেটি বহিন সম্মান সমারোহ্' পালন করে ফুলকুমারীর শ্বশুরালয়ে পাকা পায়খানা তৈরি শুরু করল।

● মাওবাদীদের বস্তার সাব জোনাল ব্যুরোর প্রধান গণেশউকে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন যে জানুয়ারি থেকে জুন '১৬-র মধ্যে বস্তারে মিথ্যা সঙঘর্ষে ৯০ জন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন, সরকারি বাহিনী ৫০ জন নারীর শ্লীলতাহানি করেছে এবং গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার বেড়ে চলেছে। আদিবাসী রমণী মাদকাম হিদকের ধর্ষণের প্রতিবাদে বস্তার বন্ধ্ করলেন 'সর্ব আদিবাসী সমাজ'। কন্ধমালে নিরপরাধ আদিবাসীদের গুলি করে মারার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলেছে।

● মেঘালয়ের রিভই জেলার প্রাচীন মেগালিথ ও অন্যান্য চিহ্ন থেকে দেখা গেছে খাসীরা সেখানে খ্রীঃ পূঃ ১২০০-তেও ছিল।

● ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নে (বিকেইউ)'র সভাপতি ভূপিন্দার সিং মান বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইণ্ডিয়া' একটি ভাঁওতা, ফাঁকা ও অর্থহীন বুলি। কেন প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের কাছ থেকে শস্য না কিনে বিদেশীদের সাথে চুক্তি করছেন। ভারতীয় কৃষকরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অভিজ্ঞ। ভারতের বাইরেও তারা আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার যেখানে যেখানে কৃষিকাজ শুরু করেছেন সেখানে সফল হয়েছেন। অথচ এখানে ভারতীয় কৃষকদের ধ্বংস করা হচ্ছে। বিদেশ থেকে ডাল ইত্যাদি আমদানী করা হচ্ছে কর্পোরেটের সাহায্যে।

● মণিপুর রাজ্যে দেখা যাচ্ছে মণিপুরী মহিলাদের মধ্যে যাদের সন্তানের সংখ্যা বেশী তাদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দামী পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করছেন। মণিপুরীদের ভীতি তারাও ত্রিপুরার অধিবাসী ত্রিপুরীদের মত সংখ্যালঘু হয়ে যাবেন। এখন মণিপুরে মণিপুরীর সংখ্যা ২৭ লক্ষ ও বহিরাগত ১১ লক্ষ। ইনার পারমিট লাইন তুলে দেওয়ায় মণিপুরীদের আশঙ্কা বেড়েছে।

● সাহিত্য আকাদেমীর সহযোগিতায় 'ভাষা রিসার্চ সেন্টার' ২০১০-'১৬ অবধি যে জনভাষা সমীক্ষা চালিয়েছেন ডঃ ডি. এন. দেবীর নেতৃত্বে তাতে দেখা গেছে ভারতে এখনও ৮০০টির মত ভাষা চালু রয়েছে যার মধ্যে ১৯৭টি বিপন্ন এবং ৪২টি ভীষণভাবে বিপন্ন যার মধ্যে আছে আর্য-পূর্ব মুণ্ডাপর্বের ভাষা নিহালি, প্রভৃতি। গভীর উদ্বেগের বিষয় ১৯৪৭-র পর থেকে ৩০০টি ভারতীয় ভাষা হারিয়ে গেছে।

● রাজস্থানের সিকার জেলার নিম কা খানা শহরের গরীব অধিবাসীদের ঘর ভেঙ্গে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে পি ইউ সি এল।

● সুপ্রীমকোর্ট জানিয়ে দিলেন 'স্বভাবগত' সমকামী (গে বা হোমোসেক্সুয়াল) ও উভকামীরা (বাইসেক্সুয়াল) 'প্রকৃতিগত বা শারীরবৃত্তীয়' বৃহন্নলা (ট্রান্সজেণ্ডার)দের মত তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে পড়েন না।

● ওড়িশার পশ্চাদপর জেলাগুলি থেকে একের পর এক অনাহার ও অপুষ্টিতে মৃত্যুর খবর প্রকাশ পাওয়ায় সরকারি প্রকল্পগুলির অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ্যে আসছে।

● ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম মহিলা ফাইটার পাইলট হিসাবে মোহনা সিং, অবাণী চতুর্বেদী ও ভাওয়ানা কান্ত্ নিযুক্ত হলেন।

● এন. এস. জি. গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মোদীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ভারত 'মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম (এম. টি. সি. আর)'-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল।

● 'ইণ্ডিয়ান বার্ডস্' পত্রিকার একটি নিবন্ধে প্রকাশ যে বিশ্বের ১০,১৩৫ প্রজাতির পাখির মধ্যে ১,২৬৩টি (১২ শতাংশ) প্রজাতির বাস ভারতে।

● ২৫ জুলাই '১৬-র এক ঐতিহাসিক রায়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এক ধর্ষিতার আবেদনে সাড়া দিয়ে এম টি পি অ্যাক্ট '৭১, যেখানে ২০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থার পর মায়ের স্বাস্থ্যের কারণে গর্ভপাত নিষিদ্ধ, তার বাইরে গিয়ে ঐ ২৪ সপ্তাহের গর্ভবতী ধর্ষিতার গর্ভপাতের অনুমতি দিয়েছেন।

● অবশেষে সৌরচালিত প্লেন 'সোলার ইম্পালস্ ২' তার ৪২০০০ কি.মি. বিশ্ব পরিক্রমা সম্পূর্ণ করল। ১৭ হাজার সৌরসেলের ব্যাটারি চালিত চার ইঞ্জিনের প্লেনটি চালিয়েছেন সুইস পাইলট বারট্রান্ড পিকার্ড ও তার সহযোগী আন্দ্রে বরস্বার্গ।

● গত ১৪.০৭.'১৬ তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দু'টি মারাত্মক সংক্রমণের, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের ধনুষ্টঙ্কার এবং ইয়াস, থেকে ভারত মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

● মহারাষ্ট্র সরকার ডেঙ্গুকে নোটিফায়েড ডিজিজ ঘোষণা করেছেন ফলে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লার্ভা পরীক্ষা করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সুবিধা হবে।

● ২০১৫-র প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে যে মহিলা সেনানী বায়ুসেনার উইং কমাণ্ডার পূজা ঠাকুরকে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে গার্ড অফ অনার দিয়ে মোদী সরকার ভারতে নারীশক্তির বিস্তার দেখাতে চেয়েছিল সেই পূজা ঠাকুর কিছুতেই চাকরিতে স্থায়ী কমিশন না পেয়ে বায়ুসেনার কর্তাদের বিরুদ্ধে 'আর্মড

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ফোর্সেস্ ট্রাইবুনালে' অভিযোগ দায়ের করলেন।

● চীনের সাথে ভারতের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। এন. এস. জি. নিয়ে একপ্রস্থ হল। দক্ষিণ চীন সাগর ও পাকিস্তানকে মদত, সীমান্ত সমস্যা, ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা, বারবার চীনা সেনার লাদাখ ও অরুণাচলে এল. ও. এ. সি. লঙ্ঘন করা এসব তো ছিলই, এর উপর যুক্ত হয়েছে অধিকৃত কাশ্মীরের এল. ও. এ. সি.-তে চীন-পাক বাহিনীর যৌথ টহল এবং উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় চীনা বাহিনীর সীমান্ত লঙ্ঘন। তার সাথে আরও যুক্ত হয়েছে ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান হস্তক্ষেপ এবং মোদী সরকারের প্রবল মার্কিন নির্ভরতা।

● ২০১১-র জনশুনানি অনুযায়ী ভারতীয় জনসংখ্যার ২০ কোটি ১৪ লক্ষ মানুষ (১৬.৬ শতাংশ) তফশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত। ৩১টি রাজ্যের ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১,২৪১টি জাতি তফশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত।

রাজ্যের নাম	সমগ্র দেশের কত শতাংশ তফশীলী জাতি রয়েছেন	সেই রাজ্যের কতসংখ্যক মানুষ তফশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত
উত্তরপ্রদেশ	২০.৫	২০.৭
পশ্চিমবঙ্গ	১০.৭	২৩.৬
বিহার	০৮.২	
তামিলনাড়ু	০৭.৫	
অন্ধ্র	০৬.৯	
মহারাষ্ট্র	০৫.৬	
রাজস্থান	০৬.১	
মধ্যপ্রদেশ	০৫.৬	
কর্ণাটক	০৫.৬	
পাঞ্জাব	০৪.৪	৩১.৯
হিমাচল প্রদেশ		২৫.২
হরিয়ানা		২০.২

● সারা বিশ্বে ৪০ কোটি মানুষ এবং ভারতে ০৪ কোটি মানুষ মারণঘাতী ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগে ভুগছে। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ হেপাটাইটিস-সি রোগের ক্ষেত্রে রোগীরা প্রাথমিকভাবে বুঝেই উঠতে পারে না যে তারা আক্রান্ত। যথাক্রমে ৩৩ শতাংশ ও ৪২ শতাংশ হেপাটাইটিস-'বি' ও 'সি'-র ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ সিরিঞ্জ ব্যবহার রোগের কারণ। ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে হেপাটাইটিস বি ও সি-র প্রকোপ বেশি। বিদেশে উগাণ্ডা ও ইজিপ্টে প্রচুর রোগী। ২০৩০-র মধ্যে ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ করতে ডব্লিউ এইচ ও 'গ্লোবাল সেফ ইনজেকশন্' প্রচার শুরু করেছেন যার পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়েছে পাঞ্জাবের রূপনগর জেলায়।

● তামিলনাড়ুর কুডানকুলামের পর অন্ধ্রে-র উপকূলবর্তী কোভাডাতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি বিরোধিতায় কোভাডা অঞ্চলের গ্রামবাসী ও মৎস্যজীবীরা আন্দোলন শুরু করেছেন।

● গুজরাটের উনায় সিংহের আক্রমণে চারটি গরু মারা যায়। তাদের শব সরানো ও চামড়া কাটার জন্য দলিত মুচি ও মুদ্দাফরাস সম্প্রদায়ের কয়েকজন তরুণকে আর. এস. এস.-বি. জে. পি. আশ্রিত গোরক্ষা কমিটির গুণ্ডারা বীভৎস মারধোর ও অপমান করে। ফলে দলিতদের একজন আত্মহত্যা করে এবং তিনজন গুরুতর আহত হয়। গুজরাটের অন্যত্র এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ও কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর হিন্দুত্ববাদী সরকার আসার পর দলিত, সংখ্যালঘু, ভিন্ন মতাবলম্বী, মুক্ত চিন্তকদের উপর হিন্দুত্ববাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আক্রমণ ও অত্যাচার বেড়েই যাচ্ছিল। গুজরাটের ঘটনার পর দলিতদের প্রতিবাদ বেড়ে চলে। মুম্বাই, আহমদাবাদ, রাজকোটে হয় বিশাল সমাবেশ। আহমদাবাদ থেকে মোটা সমাধিয়ালা পর্যন্ত চলে পদযাত্রা। দলিতরা দাবী করেন কৃষিযোগ্য জমি। তারা চাষ করতে চান। বংশানুক্রমিক ঘৃণ্য মলমূত্র আবর্জনা সাফাই আর মৃতদেহ সরানোর কাজ করতে চান না।

● ছত্তিশগড়ের দণ্ডকারণ্যে বিজেপি শাসিত রমন সিংহ সরকার কেন্দ্রের সাহায্যে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে 'অপারেশন গ্রীন হান্ট' চালাচ্ছে। এই সংঘর্ষে কোলল্যাটেরাজ ড্যামেজ হিসাবে প্রচুর নিরপরাধ আদিবাসী মারা যাচ্ছেন। অন্যদিকে আধা-সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও সালয়া জুলুমের গুণ্ডারা গরীব প্রান্তিক আদিবাসী গ্রামগুলিতে ব্যাপক অত্যাচার লুঠপাট চালাচ্ছে। কথায় কথায় আদিবাসী পুরুষদের মারছে, চাষ ও কাজ করতে এবং জঙ্গলে যেতে দিচ্ছে না। আদিবাসী নারীদের যথেচ্ছ নিগ্রহ ও ধর্ষণ করছে। আদিবাসী শিশুরাও তাদের অত্যাচার থেকে বাদ যাচ্ছে না। এর উপর কর্পোরেট, খনি মাফিয়া ও শিল্পপতিদের প্ররোচনায় চলছে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ। এই সংবাদ ছাপা হলে সাংবাদিকদেরও রেয়াত করা হচ্ছে না। যেরকম বাস্তারের দান্তেওয়াদা জেলায় দুই সাংবাদিক প্রভাত সিংহ ও দীপক জয়সওয়ালকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

● খবরে প্রকাশ মে থেকে জুলাই '১৬ তে ওড়িশার জাজপুর জেলায় নাগাদা পাহাড় এলাকায় ১৯টি আদিবাসী জুয়াও সম্প্রদায়ের শিশু অপুষ্টিতে মারা গেছে। ওড়িশায় শিশু মৃত্যুর হার এমনিতেই বেশি। হাজার শিশুতে ৫১ জন। তফশীলীদের মধ্যে ৭৯ জন।

● রাজনৈতিক দল গড়তে চলা বিতাড়িত আম আদমি নেতা যোগেন্দ্র যাদব, প্রশান্ত ভূষণদের 'স্বরাজ অভিযান', ক্ষরাপীড়িত বিদর্ভ, তেলেঙ্গানা ও বুন্দেলখণ্ডে পদযাত্রা চালিয়ে দেখেছেন সর্বত্র আদালতের নির্দেশে যে ক্ষরা পীড়িতদের আর্থিক ও অন্যান্য আপৎকালীন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা তা দেওয়া হচ্ছে না।

● কেরল সরকার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর অথচ খুবই জনপ্রিয় ফাষ্টফুড খাওয়া নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্র্যাণ্ডেড রেস্তোরাঁর বার্গার, পিৎজা, পাস্তার মত মেদ বৃদ্ধির খাবারের উপর ১৪.৫ শতাংশ বাড়তি কর চাপাল। এতে ১০ কোটি টাকার মত রাজস্ব আয়ও বাড়বে।

● এন এফ এইচ এস ২০১৫-'১৬-র সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের লাইফষ্টাইল ডিজিজের প্যাটার্ন ভীতিপ্রদ—

	পুরুষ (শতাংশ)	মহিলা (শতাংশ)
ওবেসিটি বা পৃথুলতা	২৪.২	২৮.১
ডায়াবেটিস বা মধুমেহ	১১.৪	০৭.৪
হাইপারটেনশন বা উচ্চরক্তচাপ	০৯.৯	০৭.৮

● কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি শুল্কে ছাড় তুলে দেওয়ায় এ বার ক্যানসার, হিমোফিলিয়া, এডস্, কিডনি ষ্টোন, হাড়ের অসুখ প্রভৃতি

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ক্ষেত্রে ওষুধের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং রোগীরা বিপাকে পড়ছেন। অন্যদিকে প্রতিমাসে তেল, কেরোসিন এবং রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে তাদের ভর্তুকি শূন্য করা হচ্ছে। সরকারি স্তরে যুক্তি যে এসবই স্বনির্ভর ভারত গড়ার এবং 'মেক ইন ইণ্ডিয়া'র স্বপ্নকে বাস্তব করার মোদীজীর প্রয়াস। মোদীজী জুলাই '১৬ পর্যন্ত তার দু'বছরের কিছু বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী থেকে ৩৩ বার বিদেশ সফরে গেছেন। এর প্রথম ১১টিতেই খরচ ৮৩ কোটি টাকা।

● জাতীয় গ্রীণ ট্রাইবুনাল সম্প্রতি রায় দিয়েছেন যে কেন্দ্রের মোদী সরকারের সহযোগিতায় আধুনিক যোগ গুরু শ্রীশ্রী রবিশংকরের 'আর্ট অপ লিভিং' সংস্থা কয়েকমাস আগে দিল্লীতে যমুনা নদীর বালুচর সমান করে তার মধ্যে নানারকম রাবিশ, কেমিক্যাল ইত্যাদি মিশিয়ে তার উপর কাঠামো তৈরি করে যে 'বিশ্ব সংস্কৃতি উৎসব'-র আয়োজন করেছিলেন তার ফলে ঐ জায়গা জুড়ে যমুনার বালুচর চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে জলের আর কোন অস্তিত্ব নেই এবং জন্মাচ্ছে না কোন জলজ বা স্থলজ উদ্ভিদ।

● কুডানকুলামে ক্ষতিকর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা করে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও গ্রামবাসীরা আন্দোলন করেছিলেন। তাতে যোগ দিয়েছিলেন বহু বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, সাংবাদিক। ২০১১-র সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এদের ৬০০০ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার ধারা দিয়ে কেস করা হয় আর আজও তাদের পুলিশ হয়রানি করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে গেলেন কুদানকুলাম আন্দোলনের নেতা ডঃ এস. পি. উদয়কুমার।

● যেমন কথা তেমনি কাজ। বলেছিলেন করবেন। করে দেখালেন। বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও আম আদমি পার্টির নেত্রী সোনি সোরি ১৫ আগষ্ট দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র সুকমার সুমপদ আদিবাসী গ্রামে জাতীয় পতাকা তুললেন। স্বাধীনতার পর প্রথম সেখানে জাতীয় পতাকা উঠল। দুর্ধর্ষ মাওবাদী নেতা হিদমার এই এলাকায় আধা-সামরিক বাহিনী ঢুকতেই ভয় পায়। সেখানে এতদিন মানুষ ১৫ আগষ্ট কালো পতাকা উত্তোলনই দেখে এসেছেন, সেখানে এবার জাতীয় পতাকা উঠল। অথচ সেখানে যাওয়া আসার পথে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী প্রতি পদে হেনস্থা করেছে। সোরির এই কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছিলেন অপর মানবাধিকার সংগঠক লিঙ্গারাম কোদোপি, সাংবাদিক প্রভাত সিংহ, পিউইসিএল-র লখন সিংহ প্রমুখ।

● নাসার গবেষণায় একটি তথ্য সামনে এসেছে যে উষ্ণজলের কারণে মঙ্গলগ্রহের ত্বকে ভাজ পড়েছিল। এর ফলে অন্যভাবেও জলের অস্তিত্ব সামনে আসছে।

● প্রতিনিয়ত আমাদের খাদ্যে নানারকম ভেজাল মেশানো হচ্ছে। যেরকম ময়দার তুলতুলে ভাব ও চাকচিক্য আনার জন্য মেশানো হচ্ছে ক্লোরিন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, ক্লোরিন, ক্যালসিয়াম পেরোক্সাইড, অজোডাইকার বোনামাইড, বেঞ্জইল পেরোক্সাইড, অ্যালোক্সান। অ্যালেক্সান দেখা গেছে ডায়াবেটিসের কারণ।

● কেন্দ্র সরকার 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ প্রোমোশন অফ উর্দু ল্যাঙ্গোয়েজ'-র মাধ্যমে উর্দু লেখকদের উদ্দেশ্যে ফরমান জারি করেছেন যে তাদের লিখিতভাবে জানাতে হবে যে তাদের লেখার মধ্যে এমন কিছু নেই যা ভারত সরকারের কর্মসূচীর বাইরে। এর বিরুদ্ধে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গিরিশ কারনাডের নেতৃত্বে লেখক-সাহিত্যিকরা বিক্ষোভ দেখালেন।

● 'ইউনিভার্সাল হেলথ এসিওরেন্স মিশন (ইউ এইচ এ এম) সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৩৪৮টি ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হবে, আর এস বি আই-র উর্ধ্বসীমা ৫০০০০ টাকা করা হবে, আয়ুশকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় কাজে লাগানো হবে তার জন্য ব্রীজকোর্স হবে, অসংক্রামক ব্যধির উপরও নজরদাড়ি রাখা হবে ইত্যাদি।

● ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের কারণ হিসাবে কলকাতার চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন এফ জি এফ প্রোটিন। গোড়ায় এটির পরিমাপ করে তাহলে শুরুতেই চিকিৎসা করা যাবে।

● পুণের সেরাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ার প্রস্তুত মেনিনজাইটিস-এ রোগ প্রতিরোধী তাপ সহনশীল টীকা 'মেন অ্যাফরি ভ্যাক' এখন আফ্রিকায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

● সমুদ্র বিজ্ঞানীরা পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরে এক ফুট লম্বা ১৯৪টি শিরদাঁড়ার হাড় সহ এক নতুন প্রজাতির ইল মাছের সন্ধান পেয়েছেন।

● প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার শর্তগুলি কৃষকদের স্বার্থবিরোধী এবং বীমা কোম্পানীগুলির সুবিধার্থে এই অভিযোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় লোকদল প্রভৃতি বিরোধী দলগুলি হরিয়ানার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে।

● নু টোনোমি সংস্থার হাত ধরে মিৎসুবিশি আই-এম-আই-ইভি সংস্থার তৈরি চালকহীন রোবট ট্যাক্সি ২০১৮ থেকে সিঙ্গাপুরে চালু হতে চলেছে। সুইডিশ সংস্থা এডি ভোলভো উবের সংস্থার মাধ্যমে তাদের চালকহীন ট্যাক্সি চালু করতে চলেছে। ইজরায়েলের মোবিলিয়ি এন ভি সংস্থাও ২০১৯ থেকে চালু করবে ডেলফি অটোমেটিভ। যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড সংস্থা চালু করবে ২০২১ থেকে।

● স্রষ্টা কি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে পারে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও দলিত দু'ধরনের জাত্যাভিমানীদের আক্রমণে তামিল সাহিত্যিক পেরুমল মুরুগন এতদিন লেখালেখি প্রকাশে বিরত ছিলেন। তার এই স্বেচ্ছাবকাশে কিন্তু মস্তিষ্ক-কণ্ঠ-লেখনি সৃষ্টি করে গেছে ২০০-র বেশি কবিতা। সম্প্রতি সেগুলি বই আকারে প্রকাশিত হল।

● অল ইণ্ডিয়া জাঠ আরক্ষণ সঙঘর্ষ সমিতি (এআইজেএএস) ভাইচারা সমাবেশের মধ্য দিয়ে জাঠদের জন্য আসন সংরক্ষণের আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করলেন।

● ২৮ আগষ্ট '১৬এ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে নতুন ক্র্যামজেট রকেট ইঞ্জিন সফলভাবে উৎক্ষেপণ করল ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। এই বিশেষ ইঞ্জিনটি পরিবেশ থেকে জ্বালানি অক্সিজেন গ্রহণ করতে সক্ষম। তাই খরচও অনেক কম।

● ১৯১৫-র আগষ্ট জ্ঞানতাপস অধ্যাপক এম. এম. কালবুর্গিকে হত্যা করেছিল ধর্মান্ধ উগ্রপন্থী ঘাতকেরা। অধ্যাপক কালবুর্গিকে স্মরণ করতে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে কর্ণাটকের ধারওয়ারে ১০,০০০ মানুষ সমবেত হলেন 'ড. কালবুর্গি-ডাঃ দাভোলকার-কমরেড পানশারে হত্যা বিরোধী হোরাতা

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

সমিতি'র আহ্বানে। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীমতী দাভোলকার, উমাতাই পানশারে এবং উমাদেবী কালবুর্গি।

● ন্যাশন্যাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিবি) জানাচ্ছে ২০১৪-২০১৫-তে এক বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা বেড়েছে ৩২৭ শতাংশ— যা মূলত রাজনৈতিক, জাতপাত, গ্রামীণ অর্থনীতি সংক্রান্ত গোষ্ঠী এবং ছাত্রদের সঙ্ঘর্ষ।

● মাইভিও ওবা, রোমিও মার প্রমুখের নেতৃত্বে 'মণিপুর ট্রাইবালস ফোরাম, ডেলহি (এম টি এফ ডি)'-র সদস্যরা দিল্লীর যন্তরমন্তরে ৩১ আগষ্ট, '১৬ আদিবাসী ঐক্য দিবসে বিক্ষোভ দেখান। তারা মণিপুর সরকারের বিরুদ্ধে তিনটি আদিবাসী বিরোধী বিল— (১) মণিপুর পিপলস্ বিল ২০১৫, (২) মণিপুর ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস্ (সেভেনথ্ অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ২০১৫ এবং (৩) মণিপুর শপস্ অ্যাণ্ড এসটাবলিশমেন্ট (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ২০১৫— প্রণয়ন, এই বিলগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত ন'জন বিক্ষোভকারী আদিবাসীকে হত্যা এবং 'মণিপুর রেগুলেশন অফ নন-লোকাল পিপল্ বিল ২০১৬' প্রণয়নের প্রচেষ্টার জন্য প্রতিবাদ জানালেন।

● চীনের 'বেল্ট অ্যাণ্ড রোড কানেকটিভিটির' উদ্যোগের মাধ্যমে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত এবং এশিয়া-ইউরোপ রেল ও সড়ক পথে সাফল্যের পর বর্দ্ধিত রেশমপথের প্রকল্প হিসাবে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ বৈঠকে আলাস্কার বেরিং সাগরে আণ্ডারপাশ সুড়ঙ্গ স্থাপনের পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর আমেরিকা ও সাইবেরিয়া যোগাযোগের কথা ভাবা হচ্ছে। এর ফলে সারা পৃথিবীই সড়কপথে যুক্ত হবে।

● পাঞ্জাবের শিরোমনি আকালী দল— বিজেপি সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, আত্মহত্যাকারী কৃষকদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ এবং কৃষিঋণ মকুবের দাবীতে কৃতি কিষাণ ইউনিয়ন, ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন (উগ্রাহানা), বিকেইউ (দাখাউন্দ), বিকেইউ (ক্রান্তিকারী), পাঞ্জাব কিষাণ সঙ্ঘর্ষ কমিটি (আজাদ) প্রমুখ সাতটি কৃষক সংগঠন ৫ সেপ্টেম্বর থেকে চণ্ডীগড়ে আন্দোলন শুরু করেছেন।

● ১৩ জন রাষ্ট্রপ্রধান, ৭৭ জন বিদেশমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ বহু ভিআইপি অতিথি এবং অগণিত পুণ্যার্থী ও দর্শকদের সামনে রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে রোমান ক্যথলিক চার্চের বর্তমান প্রধান আর্জিন্তেনিয় পোপ ফ্রান্সিস এক বর্ণাঢ্য, সুশৃঙ্খল ও দীর্ঘ অনুষ্ঠানে ৪ সেপ্টেম্বর '১৬ মাদার টেরেজাকে সন্ত হিসাবে বরণ করেন। মাদার টেরেজার মৃত্যুর পর রোমান ক্যথলিকদের এই জটিল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এদিন তার পরিসমাপ্তি হয়।

১৯১০ সালে আলবেনিয় অ্যাগনেশ গোনশা বোজালিউ ম্যাসিডোনিয়ার স্কোপজে শহরে জন্মান। ১৯২৮-এ মাত্র ১৮ বছর বয়সে সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করে আয়ারল্যাণ্ডের লোরেটো চার্চে যোগ দেন। পরের বছর ডাবলিন থেকে কলকাতায় জাহাজে এসে পৌঁছনোর পর দার্জিলিঙের মঠে শিক্ষানবিশ হিসাবে যোগ দেন। ১৯৩১ থেকে কলকাতার সেন্ট মেরি লোরোটো হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন ও পরে তার অধ্যক্ষ হন। ১৯৩৭-এ স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে প্রথমে মতিঝিল ও কামারডাঙ্গা বস্তিতে শিশুশিক্ষার কাজ শুরু করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর নিরন্ন, হতদরিদ্র, অনাথ, অসুস্থ ও আর্তদের সেবার কাজ। ১৯৫০-এ তৈরী করেন 'মিশন অফ চ্যারিটি' যারা এখন বিশ্বের ১৩৩টি দেশে কাজ করে। ১৯৭৯-তে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৯৭-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

● ৮ সেপ্টেম্বর '১৬ অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটা থেকে তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন জ্বালানীর ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন সমন্বিত জিএসএলভি-এফ ০৫ রকেট সফলভাবে আইএনএসএটি-৩ ডিআর উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করে এল। আইএনএসএটি-৩ ডি আর প্রতি ২৬ মিনিটে ভূতলের ও সমুদ্রতলের ছবি সেখানকার তাপমাত্রা, বাতাসের গতিপ্রকৃতি, বরফের আস্তরণ প্রভৃতির খোঁজখবর সহ ইসরোকে পাঠাতে থাকবে।

● উত্তর প্রদেশে আবার 'ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনে (এন.আর.এইচ.এম.) ঘোটালা ধরা পড়েছে। এবার দুর্নীতির মাত্রা ৯,০০০ কোটি টাকার বেশী।

● রানা প্লাজার পর আবার বাংলাদেশের টঙ্গিতে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে ৩০ জন শ্রমিক মারা গেছেন, অনেকেই গুরুতর আহত। বাংলাদেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যুনতম নিরাপত্তা নেই।

● রিও দি জেনেইরোর প্যারা ওলিম্পিকসের টি-৪২ ইভেন্ট হাই জাম্পে তামিলনাড়ুর মারিয়াপ্পান থালাভেলু এবং উত্তর প্রদেশের নয়ডার ভাটি বরুন সিং যথাক্রমে সোনা ও ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। শটপাটে মহিলা অ্যাথলিট দীপা মালিক পেলেন ব্রোঞ্জ। দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া জ্যভেলিন থ্রোতে সোনা।

● ওড়িশার গঞ্জাম জেলার গোপালপুরে টাটা স্টীলের ফেরোক্রোম প্ল্যান্টের অসংগঠিত শ্রমিকদের একাংশের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ২ আগস্ট '১৬ থেকে দীর্ঘ ধর্ণা আন্দোলন চলে।

● বিশিষ্ট ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী ডঃ এম.এস. শুভলক্ষ্মীর জন্মশতবার্ষিক সম্মাননা পেলেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী গিরিজা দেবী, কিশোরী আমনকার, অরুণা সাইরাম, বিশাখা হরি, নৃত্যশিল্পী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, বৈজন্তীমালা বালি এবং পাণ্ডবাণী শিল্পী তেজনবাঈ।

● ওষুধ, কীটনাশক, রাসায়নিকের বৃহৎ জার্মান সংস্থা বেয়ার শস্যবীজ ও কীটনাশকের বৃহৎ মার্কিন সংস্থা মনসানটোকে ৬,৬০০ কোটি ডলারে কিনে নিল।

● দিল্লীর নবজাতক মৃত্যুর উপর 'এ.ই.এম.এস.'-র একটি সমীক্ষা দেখাচ্ছে 'সুপারবাগস্' জীবাণু অর্থাৎ ক্লেবসিলা, অ্যাসিনেটোব্যকটর ও ই. কলির সংক্রমণে গত তিনবছরে ৮৮,৬৩৬টি মৃত্যু হয়েছে। প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকে এরা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। ৮২% অ্যাসিনেটোব্যকটর, ৫৪% ক্লেবসিলা ও ৩৮% ই. কোলি এখন রেজিস্ট্যান্ট হয়ে উঠেছে। দেশ জুড়ে যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিকের অপপ্রয়োগই এর কারণ। ফলে বছরে ৫৫,৫২৪ জন নবজাতকের মৃত্যু হচ্ছে।

কার্টুনের দুনিয়ায়

THE FIRST VICTIM OF WAR
TRUTH
CNN

HC
UTTARA KHAND

That foreign guy is kissing in public. What a shame!

"President Obama dropped 23,144 bombs on Iraq, Syria, Pakistan, Yemen and Somalia in 2015 alone."
BOMBS FEEL BETTER WHEN THEY'RE DROPPED BY A NOBEL PEACE PRIZE WINNER

HIROSHIMA 69TH ANNIVERSARY
WHICH TERRORIST GROUP DID THAT?

DON'T COMPLAIN THAT MODIJI DIDN'T VISIT YOU...

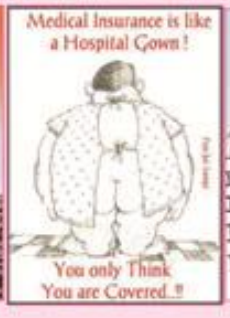
Medical Insurance is like a Hospital Gown !
You only Think You are Covered..!!

Mere paas Modiji hai!

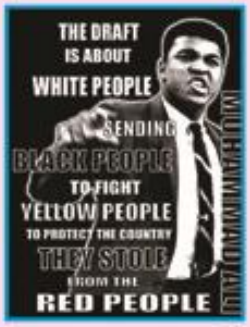

'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নে'র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অরণি সেন কর্তৃক ৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত
ও ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর, কলকাতা-৭০০১৩২, ফোন : ০৩৩-২৫১৮ ৮৮৮০, থেকে মুদ্রিত।
e-mail : ssunnayan@gmail.com || website : www.ssu2011.com

₹ ৩০